আত্মপরিচয়
বাঁকুড়া ব্লক ১

আত্মপরিচয়

বাঁকুড়া ব্লক ১

সম্পাদনা সুদীপ্ত পোড়েল সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বাঁকুড়া ১

আত্মপরিচয়
(প্রবন্ধ সংকলন)

প্রথম প্রকাশ ১৫ আগস্ট ২০০৭

প্রকাশনা বাঁকুড়া ১ পঞ্চায়েত সমিতি

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা শিল্পী সৌম্যকান্তি মুখোপাধ্যায়
শিল্প-শিক্ষক বাঁকুড়া জিলা স্কুল

মুদ্রক এ. টি. প্রেস বাঁকুড়া
দূরভাষ ২৫৩৩৯৫ ২৪১৩৮০

মূল্য পঞ্চাশ টাকা

সম্পাদনা সুদীপ্ত পোড়েল
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বাঁকুড়া ১

মুখবন্ধ

বাঁকুড়া-১ ব্লকের গ্রামীণ এলাকার পুরাণ, ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, রাজনীতি, উন্নয়নের অতীত, বর্তমান ও আগামীকে এক ক্যানভাসে ধরার প্রয়াসে, বাঁকুড়ার বিশিষ্ট গুণিজনদের মনন, অনুভাবনা ও এষণার সমৃদ্ধ ফসল এই গ্রন্থ। অতীতে ফেরা, বর্তমানের পথচলা, ভবিষ্যৎ স্বপ্নের ছোঁয়া আছে প্রত্যেক প্রবন্ধে। আর কাছে অনেক অজানা তথ্য-ঘটনা, অনাবিষ্কৃত পথের সন্ধান। খণ্ডিত গল্পকথা, মুখে বলা ইতিহাস, কানে শোনা ঘটনার গ্রন্থিত রূপ এই সংকলন, যা সামগ্রিকভাবে ব্লকের আত্মপরিচয়কে লিপিবদ্ধ করল।

আমার বিশ্বাস এই গ্রন্থ, ভাবীকালের কাছে অনন্য ও অমূল্য হয়ে বেঁচে থাকবে। আগামী উন্নয়ন ভাবনার ভিত্তিভূমি হবে এই সংকলন। যাঁদের নিরলস প্রয়াস ও প্রেরণায় এই গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হল, তাঁদের কাছে ব্লক প্রশাসনের ঋণ ও কৃতজ্ঞতা রইল।

নবতর ভাবনা, অচর্চিত বিষয়ের সংযোজনে সমৃদ্ধ এই সংকলন সকলের কাছে সমাদৃত হবে, এই আশা রাখি।

সুদীপ্ত পোড়েল
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, বাঁকুড়া-১
সংকলন - সম্পাদক

১৫ই আগস্ট ২০০৭
বাঁকুড়া

ফোন ঃ ২৫০০৮৩, ২৫১৩৩০

বাঁকুড়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতি কার্য্যালয়

পুয়াবাগান ● বাঁকুড়া

স্মারক সংখ্যা ঃ.. তারিখ..

সভাপতি
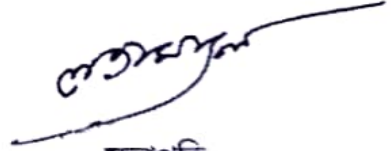
বাঁকুড়া-১ ব্লকের সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, কৃষি, শিল্প সহ বিভিন্ন বিষয়কে একই অ্যালবামে ধরার চেষ্টায় এই বই প্রকাশ করা হল।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় — পরিকল্পনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নতর সমাজ জীবন ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে। তার খণ্ডচিত্র যেমন ধরা পড়েছে এই গ্রন্থে, তেমনি সামগ্রিক ভাবনা ও পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে আগামী দিনের উন্নয়ন পরিকল্পনার সহায়ক হবে এই পুস্তক।

সকলের পরামর্শে ও প্রচেষ্টায় আগামী দিনেও আরো নতুন ভাবনা, নতুন তথ্য সমৃদ্ধ এ ধরণের সংকলন প্রকাশিত হবে এই আশা রাখি।

১৫ই আগস্ট ২০০৭
বাঁকুড়া

সভাপতি
বাঁকুড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতি

সূচীপত্র ও লেখক পরিচিতি

সামগ্রিক পরিচিতি ঃ বাঁকুড়া ১ ব্লক

মোঃ ইব্রাহিম

ভৌগোলিক অবস্থান

বাঁকুড়া জেলার সদর শহর বাঁকুড়ার উত্তর-পশ্চিম অংশে বাঁকুড়া ১নং ব্লক অবস্থিত। (২৩°১০/ ও ২৩°২০/ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬°৯৫/ ও ৮৭°০৫/ পশ্চিম্ পূর্ব অক্ষাংশ) বাঁকুড়া ১নং ব্লক তথা পঞ্চায়েত সমিতির মোট আয়তন ১৮১.৩ বর্গ কিলোমিটার। বাঁকুড়া-২ নং ব্লক, ছাত্না, ইন্দপুর এবং ওন্দা ব্লকগুলি বাঁকুড়া ১নং ব্লককে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে।

প্রশাসনিক পরিকাঠামো

বাঁকুড়া ১নং ব্লকের প্রশাসনিক ভবনটি তথা ব্লক/পঞ্চায়েত সমিতি কার্য্যালয় বাঁকুড়া শহর হতে ৫ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিম দূরত্বে পোয়াবাগানে অবস্থিত। এই ব্লকটি ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত। মোট ১৫০টি মৌজা আছে যার মধ্যে ১৩৬টি মৌজায় জনবসতি আছে এবং ১৪টি মৌজা জনবসতিহীন। ছটি গ্রাম পঞ্চায়েত (১) জগদল্লা-১ (২) জগদল্লা-২ (৩) আঁচুড়ি (৪) কেঞ্জাকুড়া (৫) কালপাথর (৬) আঁধারথোল।

জলবায়ু ও আবহাওয়া

বিভিন্ন তথ্য হতে নিম্নরূপ জলবায়ু ও আবহাওয়ার হিসাব পাওয়া যায় (উপক্রান্তীয় উপআর্দ্র)।

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	বৃষ্টিপাত	বাদল দিবস	তাপমাত্রা		আর্দ্রতা	
				সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
১	১৯৯৮	১৩২২		৯	৪৫		
২	১৯৯৯	১৫২৫		৯	৪৫		
৩	২০০০	১২৩৫	৯২	৮	৪১		
৪	২০০১	১৩২৩	৯৯	৭	৪৫	১৭.৫	৯৬
৫	২০০২	১৪৩৭	১০৩	৮	৪৪	২২.৫	৯৬
৬	২০০৩	১২৭২.৭	১০১	৬	৪৪.৫	১৭	৯৬
৭	২০০৪	১৩৭৬.১	১০৩	৭	৪৫	১৯	৯৬
৮	২০০৫	১৩৫০	৯৯	৯	৪৪.৫	১৭	৯৭

মৃত্তিকা

বাঁকুড়া-১ ব্লকে হাল্কা বেলে, হাল্কা বেলে দোঁয়াশ, মাঝারি দোঁয়াশ, মাঝারি বেলে এঁটেল দোঁয়াশ, ঘন এঁটেল দোঁয়াশ, ঘন এঁটেল মাটি দেখা যায়। বাঁকুড়া-১ ব্লকে ৭টি শৃঙ্খলীর মাটি হল (১) লোহামারা রঙ্গ (২) রং-তালডাংরা (৩) কেসেরামসাগর (৪) ভুলানপুর-তালডাংরা (৫) ফুলকুসমা-ভুলানপুর (৬) দেউলি দুলাডি (৭) কাটাবন-দয়ালপুর।

বিভিন্ন মৌজার মাটির অবস্থান

ক্রমিক সংখ্যা	স্থানের নাম	পি.এইচ	ই.সি.	নাইট্রোজেন	P_2O_5	K_2O
১.	খোবারগ্রাম	৫.১(A)	.০৫(N)	.৪৭(L)	২১(L)	২০৪(M)
২.	সেগুনসারা	৫.৬(A)	.১৯(N)	.৩১(L)	২০(VL)	১৭৬(L)
৩.	চেলেবাকরা	৬.২(A)	.৪৪(N)	.৮৪(H)	১৮(L)	৬০০(H)
৪.	পোড়ামৌলি	৫.৯(A)	.৪০(N)	.৪৩(L)	৭৭(M)	২৭৫(A)
৫.	চতুরদিহি	৬.৪(N)	.১৩(N)	.৩৭(L)	৪৮(ML)	৬০০(VH)
৬.	কাকরাডিহি	৬.৯(N)	.২১(N)	.৫৭(M)	৮৯(M)	৬০(L)
৭.	গোলামিতোরা	৬.৬(N)	.০৪(N)	.৪২(L)	২০(L)	২১০(M)
৮.	ভগবানপুর	৫.১(A)	.১১(N)	.৫১(L)	১১(L)	২২৪(M)
৯.	সুপুরডিহি	৫.৬(A)	.১৫(N)	.৫৪(N)	৪২(L)	৩২৮(M)
১০.	শিবোরামপুর	৫.৮(A)	.১৫(N)	.৮৫(H)	২৫(L)	২০২(M)
১১.	ভাতুড়ি	৬.১(A)	.১১(N)	.৫৪(M)	৪৫(L)	২২৮(M)
১২.	কৃষ্ণনগর	৬.২(A)	.৫২(N)	.৪৫(L)	৪০(L)	২৪৫(M)
১৩.	বায়িন্দকা	৬.৩(A)	.২২(N)	.২৯(L)	৪৬(M)	২৩৫(M)
১৪.	বনকাটি	৬.৮(N)	.৪২(N)	.৫৭(M)	২৭(L)	২৭৫(M)
১৫.	দুবরাজি	৭.৩(N)	.১৯(N)	.৬৪(M)	৫১(M)	২২৫(M)
১৬.	হেল্লনা	৫.২(A)	.২৭(N)	.৩৯(L)	৭০(M)	২০৫(M)
১৭.	শুশুনিয়া	৬.৫(N)	.৩৬(N)	.৩৪(L)	৭২(M)	১৯২(ML)
১৮.	আরালবাঁশি	৫.৫৭(A)	.১৭(N)	.৫৫(L)	৪৩.৪(L)	২৩০(M)
১৯.	নেকড়াগড়িয়া	৬.১৫(A)	.১১৫(N)	১.০৮(N)	৪৫(N)	২১৩(M)
২০.	খেকড়িয়াড়া	৫.৮(A)	.২৫(N)	.৫১(M)	২৩(L)	২৮৮(M)
২১.	কুশতোড়া	৬(A)	.০৬(N)	.৫১(M)	৫৬(M)	১৯৪(M)
২২.	চিংড়া	৫.৪২(A)	.২৪(N)	.৭০(M)	২৭(L)	১৭২(M)
২৩.	জামবনি	৬.২(A)	.৪৩(N)	.৭৪(H)	৫৪(L)	২৮৫(M)
২৪.	ছেন্দুয়া	৫.৯(A)	.২৭(N)	.৭১(M)	৩৪(L)	১৭৬(M)
২৫.	রামজীবনপুর	৫.১(A)	.৩৮(N)	.৫৮(M)	৩০(L)	৩০০(M)
২৬.	চিকচিকা	৭.৪(A1)	.০৯(N)	.৪৫(L)	৪২(L)	২৪০(M)
২৭.	কাশিবেদিয়া	৫.৬(A)	.১২(N)	.৭৮(H)	২৪(L)	১২০(L)
২৮.	সরাশোর	৫.৯(A)	.১১(N)	.৩৬(L)	৪৮(M)	১৬৫(M)
২৯.	বাসুলিতোড়া	৬.৪(A)	.১৪(N)	.৯৮(H)	৩০(L)	১৭২(M)

মানব সম্পদ ঃ ২০০১ আদমসুমারী

মোট জনসংখ্যা	—	৯৫,৮২৪ জন
পুরুষ	—	৪৮,৯৮৮ জন
মহিলা	—	৪৬,৮৩৬ জন
তপশিলী জাতি	—	৩৫,০২৯ জন
আদিবাসী	—	৬,৩৮৩ জন
সাক্ষরতার হার	—	৬৩.২%

গ্রাম পঞ্চায়েত ওয়ারি ০-৬ বৎসর বয়স্ক শিশুদের অবস্থান

ক্রমিক সংখ্যা	পঞ্চায়েতের নাম	মোট জনসংখ্যা	০-৬ বৎসর বয়স্ক শিশু	শতকরা হার (%)
১.	জগদল্লা-১	১৩২৩৯	১৬৮৪	১২.৭২
২.	জগদল্লা-২	১২১০৭	১৭২৭	১৪.২৬
৩.	আঁচুড়ি	১৯৭৬৪	২৭২০	১৩.২৬
৪.	কেঞ্জেকুড়া	২০০৬৪	২৯২৫	১৪.৫৭
৫.	কালপাথর	১২৬৩৫	১৮৯২	১৪.৯৪
৬.	আন্দারথোল	১৮০১৫	২৬৬১	১৪.৭৭
	মোট জনসংখ্যা	৯৫৮২৪	১৩৬০৯	১৪.২০

গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা - ২০০৬

ক্র. সংখ্যা	গ্রামপঞ্চায়েত	মোট পরিবার	দরিদ্র পরিবার	যোগ্য আবাস প্রাপক
১.	জগদল্লা-১	২৩৮২	৪৭৪	৪৪
২.	জগদল্লা-২	২২৫৬	৬৬৪	৩১
৩.	আঁচুড়ি	৪৬০২	১৪৮৩	১২২
৪.	কেঞ্জেকুড়া	৪৩৩৯	১১৭৩	১২০
৫.	কালপাথর	২৩১২	৮৭২	২৮
৬.	আন্দারথোল	৩৮৯৯	১৭৫৬	২৪৭
	মোট	১৯৭৯০	৬৪২২	৫৯২

বিভিন্ন গ্রুপের পুরুষ ও মহিলার আনুপাতিক হার

ক্রমিক সংখ্যা	পঞ্চায়েতের নাম	০-৬বৎসর বয়স্ক শিশু	৬ বৎসরের অধিক	মোট জনসংখ্যা	তপঃ জাতি	আদিবাসী	অন্যান্য
১.	জগদল্লা-১	১৬৮৪	১১৫৫৫	১৩২৩৯	৪৬৯০	৫	৮৫৪৪
২.	জগদল্লা-২	১৭২৭	১০৩৮০	১২১০৭	৬৩০০	৫২৮	৫২৭৯
৩.	আঁচুড়ি	২৭২০	১৭০৪৪	১৯৭৬৪	৪৬২৯	৪০০	১৪৭৩৫
৪.	কেঞ্জেকুড়া	২৯৯৫	১৭০৬৯	২০০৬৪	৫৪২৭	২২০৭	১২৪৩০
৫.	কালপাথর	১৮৯২	১০৭৪৩	১২৬৩৫	৬২০৬	২২৩৯	৪১৯০
৬.	আন্দারথোল	২৬৬১	১৫৩৫৪	১৮০১৫	৭৭৭৭	১০০৪	৯২৩৪
	মোট	১৩৬০৯	৮২২১৫	৯৫৮২৪	৩৫০২৯	৬৩৮৩	৫৪৪১২

তপশীলি জাতি ও আদিবাসী জনসংখ্যার একদশকের পরিবর্তন

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	১৯৯১	২০০১	পরিবর্তন
১.	মোট জনসংখ্যা	৮৪৪৩৭	৯৫৮২৪	১৩.৪৬%
২.	মোট তপঃ জাতি	৩১২৩০	৩৫০২৯	১২.১৬%
৩.	তপঃ জাতির শতকরা হার	৩৬.৯৮%	৩৬.৫৫%	
৪.	মোট আদিবাসী	৫১৮৯	৬৩৮৩	২৩%
৫.	আদিবাসীর শতকরা হার	৬.১৪%	৬.৬৫%	

গ্রাম পঞ্চায়েত ওয়ারি দারিদ্র সীমার নীচের পরিবার (২০০৭)

ক্রমিক সংখ্যা	পঞ্চায়েতের নাম	মোট জনসংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	দারিদ্র সীমার নীচের পরিবার	শতকরা হার (%)
১.	জগদল্লা-১	১৩২৩৯	২৫২৪	৪৭৪	১৮.৭৮
২.	জগদল্লা-২	১২১০৭	২২৩৬	৬৬৪	২৯.৭০
৩.	আঁচুড়ি	১৯৭৬৪	৩৫৫৭	১৪৮৩	৪১.৬৯
৪.	কেঞ্জেকুড়া	২০০৬৪	৩৬৬৩	১১৭৩	৩২.০২
৫.	কালপাথর	১২৬৩৫	২৩১৫	৮৭২	৩৭.৬৭
৬.	আন্দারথোল	১৮০১৫	৩৩৫৫	১১৫৮	৫২.৪০
	মোট	৯৫৮২৪	১৭৬৫০	৬৪২৪	৩৬.৪০

শ্রমবিভাজন ২০০১ এর আদমসুমারী অনুযায়ী

মোট প্রধান শ্রমজীবী — ২৬০৩৯

প্রান্তিক শ্রমজীবী — ১৩৬১১

অ-শ্রমজীবী — ৫৬১৭৪

প্রধান শ্রমজীবীর ভাগ

কৃষক — ৯৯১০

কৃষি শ্রমজীবী — ১৩০৯৫

পশুপালন ও মৎসচাষ — ৬৫৪

খনি ও পাথরখাদান — ৪৮০

ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প — ৮০৩২

ব্যবসাবাণিজ্য — ২৩৩৪

নির্মাণশিল্প — ৫৮৪

অন্যান্য — ৪৫৬১

কৃষি ও ভূমি ব্যবহার (হেক্টর)

মোট ভৌগোলিক এলাকা	—	১৮১৩১
বনাঞ্চল	—	১২৯৯
অ-কৃষিজমি	—	১০৬৬
অনুর্বর জমি	—	১১২২
স্থায়ী গোচারণভূমি	—	৪০৪
অন্যান্য শস্যের জমি	—	১২০
কৃষিযোগ্য জলাভূমি	—	৪০০
পতিত জমি	—	৪৮৫
মোট কৃষিযোগ্য জমি	—	১২১৬০

প্রধান শস্য

	আয়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (মেট্রিকটন)
আমন (উচ্চফলনশীল)	৪৫০০	৩.০
আমন (স্থানীয়)	৫৬৬৫	২.০
আউস (উচ্চফলনশীল)	১৫০	৩.০
আউস (স্থানীয়)	৪০	১.০
বোরোধান	১৫০	৫.০
গম	১৫০	৩.০
আলু	১১০	২৭.০
সরিষা	৩৩০	১.০

প্রাণীসম্পদ

গোবিন্দনগরে ব্লক প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র আঁচুড়ি ও শুনুকপাহাড়ী প্রাণী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রাণী স্বাস্থ্য সহায়ক আছে।

দেশী গবাদি	—	৩৬৯২৯
মিশ্র গবাদি	—	৬৫৫
মহিষ	—	৫০৯৬
ছাগল	—	২৪৭৫৩
ভেড়া	—	৫০০৭
শূকর	—	২৪০৪
মুরগী	—	৬১৭৩৫
হাঁস	—	২৭০১৬

মাছ চাষ

জলাশয় ৮২৫, ২০০০-২০০১ সালে ৯৩৫হেঃ সম্ভাব্য চাষ এলাকার ৭৮০হেঃ জলাশয়ে চাষ হয়। মোট মাছ উৎপাদন ১০৬১৯ কুঃ। মাছ - রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি।

বন সম্পদ

মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	আয়তন (একর)	বনের আয়তন (একর)
গৌরীপুর	৫৫	৬৫৩.৯৪	২৫৪.৩২
আঁচুড়ি	৫৬	১৪৬০.৯৩	২৮২.৩৪
ধোবারগ্রাম	৫৭	৯৯৫.৪৪	১৩.২৮
ধুলকুমারী	৬০	৩৮৬.৫২	১৪৩.৭৪
কাশিয়াডোবা	৬১	১৯৮.৮১	৩০.৬৩
নিদয়া	৬২	২৭৭.৫৩	৬২.৮৭
দেবীপুর	৬৪	৪০০.৮৭	১০৬.৬৬
বেহারাডিহি	৬৫	২৩৬.৪২	১৪৮.৬৪
পাপুরডিহি	৬৩	৪৪৬.২৭	৬২.৮৩
নাউডিহি	৬৬	৪৮৮.৪০	১৫৮.০৭
বলারডিহি	৬৭	১৮৬.১৬	১৪.০০
জলহরি	৭৪	২০২.২১	১০.৫৬
কাপিষ্টা	৭৬	১৮১.৮৬	১৭.৬৫
দামড়াগড়িয়া	৭৭	১৭৬.৬৩	৭০.১৮
মোরাডডিহি	৭৯	১৪৪.৬০	১৯.৫০
উরিয়ামা	৮০	৪২৯.৭০	১৫০.৯৯
পচিরডাঙ্গা	৮২	১৪৮.৯৬	৪.৬৪
পাথরাবাঈদ	৮৪	২১৭.৯৪	৪৫.৮৪
ভোলা	৯৫	৩১২.৬৭	২৪.৪৩
কাঁটাকুলি	৯৬	২৩৬.৪১	১১.০৬
ধুলিয়াডিহি	৯৭	৩৫১.০৩	৮.০১
কালপাথর	৯৯	৫৬৬.৬৬	৬৫.৫৩
রাঙ্গামেটে	১০০	৪৩৬.৩০	৯৫.৩৭
জামবেদিয়া	১০৩	১৮৩.৪৫	১৩.৯২
পরিয়াশোল	১০৪	৩৩৪.৩৩	২.৮৪
পাঠকডিহি	৮৩	১৮১.৯৩	৪১.৭৫
বড়োবাগান	১০৫	৩৩.৬৯	১৫২.৫৭
কাশিবেদিয়া	১০৬	৩৫৮.৬৪	০.৫০
বলারডিহি	১০৭	১৩২.৫৯	৩৩.২৫
চিংড়া	১০৮	৬৩৬.৪১	২৮০.৩২

বন সম্পদ

মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	আয়তন (একর)	বনের আয়তন (একর)
ভালুকবাসা	১০৯	২০৪.০৫	২.৫৭
হেতিয়াশোল	১১০	৪০৭.৩০	৩৭.০২
আনন্দপুর	১১১	২৫৪.৯৮	১৬২.৩৬
কুশতোড়া	১১২	৪৫৩.২৫	২১৯.৩৯
খেকড়িয়াড়া	১১৩	২১৬.৭৮	২৬.৭৭
নেকড়াগড়িয়া	১১৪	৩৬২.৪৪	২৭২.৫১
পাথরকাটা	১১৫	২০৬.৬৪	৩৮.৩৩
গাঙতোড়া	১১৬	৪৭৫.০৭	৬৮.২০
ধগড়িয়া	১১৭	২৫১.৩১	৪২.৮৪
বনচিংড়া	১১৮	১৭৬.১৫	২৫.২৬
নাঙলবেড়া	১১৯	৩৩৯.৮৫	২২১.৭৮
ছেন্দুয়া	১২০	৫৫৫.৬১	১৩৮.৮৩
দিনারগ্রাম	১২৪	১৫৫.৯৭	৪৫.৯৮
ডাবর	১৪০	২২৯.৪০	১১১.৯৫
চিকচিকা	১৪১	১৩১.৯১	৬৯.৮৩
পোড়ামৌলি	১৪২	৮৬৫.২২	৪৯৬.৪৪
ধোবারগ্রাম	১৪৩	১৯২.২২	৭৬.৯৬
চেলেমা	১৪৪	৫৭৭.৪৩	২৩.১৭
নয়াবাদি	১৪৬	১১১.১১	৪.৭১
সেগুনসাড়া	১৪৭	১৩৫.৬৯	২৩.৩৭
ভালুকগেজার	১৪৮	১৯১.২০	৩০.০২
চতুরডিহি	১৫৬	২১৫.৬০	২.৭১
সুপুরডিহি	১৫৭	২৫০.১৪	২৫.৩৫
তরিবতেরডিহি	১৫৯	২৫০.৩০	৯৮.৮৭
ভাতুড়ি	১৭৩	৩১৮.৯৯	২১.০০
ঝরিয়া	১৭৪	২০৪.৮৮	২৮.০৯
মাকড়কেন্দি	১৭৫	২৪৯.৩০	৭৯.০৫
আগয়া	১৮৬	২১১.৯০	২৮.০০
দধিমুখা	১৮৯	৫২২.৫৯	২৬.৬৫
চক জগদল্লা	১৯৫	৫১৯.৭৪	৪৪৬.০৫
জগদল্লা	১৯৬	৫১৩.২৫	৪১.৬৮

পিছিয়ে পড়া মৌজা

কালপাথর গ্রাম পঞ্চায়েত

১) রাঙ্গামেটিয়া ২) বাসুলিতোড়া ৩) বড়োবাগান ৪) কাশিবেদিয়া ৫) বড়োবেদিয়া ৬) আনন্দপুর ৭) কুশতোড়া ৮) দিনারগ্রাম।

আন্দারথোল গ্রাম পঞ্চায়েত

১) কালুডিহি ২) চামকাড়া ৩) পায়রা ৪) শুনুকপাহাড়ি ৫) সেগুনসাড়া ৬) চেলেবাখরা।

জগদল্লা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

১) রাজকুমারডাঙ্গা ২) শিবরামপুর ৩) মানজুরিয়া ৪) কৃষ্ণনগর।

আঁচুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

১) কেরানীপুর ২) জামরাডি।

কেঞ্জাকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

১) ধুলকুমারি ৩) মেটেকোলা ৩) নিদয়া। **(সর্বমোট - ২৩)**

আই টি ডি পি (আদিবাসী অধ্যুষিত) মৌজার নাম

কালপাথর গ্রাম পঞ্চায়েত

আনন্দপুর, রাঙ্গামেট্যা, কুস্তরা, দিনারগ্রাম, কমলাগোড়া, নেকড়াগ্যড়া, ধগড়িয়া।

কেঞ্জাকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

ধোবারগ্রাম, তাৎকানালী, হরেকৃষ্ণপুর, ধুলকুমারী, কেশাডোবা, নিদয়া।

আঁধারথোল গ্রাম পঞ্চায়েত

কুমিদ্যা, সেয়ারাবাদা, গোলামীতোড়া, কেন্দবোনা।

শিক্ষা মানচিত্র

● প্রাথমিক বিদ্যালয় - ১০৪ ● শিশুশিক্ষা কেন্দ্র - ১৮ ● উচ্চবিদ্যালয় - ১৫ ● মাদ্রাসা ১+১=২
● মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র - ২ ● গ্রন্থাগার - ৬ ● জনগ্রন্থাগার - ১ ● সাক্ষরতা কেন্দ্র - ৬৯
● প্রবাহমান কেন্দ্র - ১০ ● মহাবিদ্যালয় - ১ (ইঞ্জিনিয়ারিং) ● নবোদয় বিদ্যালয় - ১ (কালপাথর)
● ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয় - ২ (পোয়াবাগান বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন, মাঞ্জুরিয়া সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল)
● কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (পাতাকোলায়, প্রস্তাবিত) - ১ ● আইন মহাবিদ্যালয় (প্রস্তাবিত) - দঃ বনকাটি
● পশ্চিম রাঢ় কলেজ অব আর্টস অ্যাণ্ড ক্র্যাফটস্ (প্রস্তাবিত) - আইলাকুন্দি ● নিয়মিত পত্রিকা - ২ (শুনুকপাহাড়ী থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক সংবাদপত্র নবজাগরণ এবং মোলবনা থেকে ত্রৈমাসিক পত্রিকা মহুলবনে)।

স্বাস্থ্য মানচিত্র

আঁচুড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কেঞ্জাকুড়া ও হেলনাশুশুনিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র।

উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র — ১) বাঁশী ২) ধলডাঙ্গা ৩) চিংড়া ৪) বেলিয়া ৫) ধগড়িয়া ৬) কুমিদ্যা ৭) শুনুকপাহাড়ী ৮) কাঁকড়াডিহি ৯) চতুরডিহি ১০) দামাদরপুর ১১) হেলনাশুশুনিয়া ১২) আঁচুড়ি ১৩) সানাবাঁধ ১৪) কাপিষ্টা ১৫) মোলবোনা ১৬) ধগড়িয়া ১৭) তাৎকানালী ১৮) কেঞ্জাকুড়া।

অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র - ৮৭

জগদল্লা-১ ও আঁধারথোল গ্রাম পঞ্চায়েতে নিয়মিত হোমিওপ্যাথিক এবং কালপাথর গ্রামপঞ্চায়েতে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক বসছেন।

সেচব্যবস্থা

কংসাবতী ক্যানেলে ভাতুড়ি, শিবরামপুর, উপরশোল, আড়ালবাঁশী, দধিমুখা, ডাবরা প্রভৃতি মৌজায় ৬২৫ হেক্টর জমিতে চাষ হয়।

ব্লকের ৮২৫ জলাশয় থেকে ৪২৫ হেঃ কৃষি জমি সেচ হয়। ১) মোলবোনা ২) কাপিষ্টা ৩) বরুট ৪) কলাবতী ৫) নন্দীগ্রাম ৬) ছাতারডি RLI ও কয়েকটি মিনি আর.এল.আই দ্বারা ১৫০ হেঃ কৃষিজমি সেচ হয়। শেষোক্ত দুটি RLI গান্ধী বিচার পরিষদ পরিচালিত এবং বর্তমানে নিষ্ক্রিয়।

৬০৫টি নলকূপ থেকে ৬০৫হেঃ জমি সেচ সেবিত। মাঠকুয়ো সহ অন্যান্য উৎস থেকে সেচ হয় ১৭৯ হেঃ জমি। কালপাথরের ছাগলকুটা ক্যানেলে ৩০ হেঃ জমিতে চাষ হয়।

সমবায় সমিতি

কালপাথর মৎস্য সমবায় সমিতি, পুরান দামোদরপুর ও কেঞ্জাকুড়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি, একটি ল্যাম্পস সহ বাঁকুড়া-১ ব্লকে বেশ কিছু প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি আছে — যেমন ১) বাঁশী ২) জামবনী ৩) জগদল্লা ৪) ভাগাবাঁধ ৫) হেলনা-শুশুনি ৬) বাদুল্লাড়া ৭) কাপিষ্টা ৮) ফেঙ্গাবাসা ৯) কলাবতী ১০) নতুনগ্রাম ১১) আঁধারথোল ১২) মোলবোনা ১৩) কেঞ্জাকুড়া ১৪) মনোহরপুর ১৫) বেলিয়া ১৬) কাশিবেদিয়া ১৭) গাংতোড়া শেষ পাঁচটি সমিতি এখন নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে।

খনিজ

দামোদরপুর এলাকায় নুড়িপাথরের সম্ভার আছে। পোড়ামৌলি প্রভৃতি মৌজার মাটিতে অভ্র আছে, যদিও বাণিজ্যিক নিরিখে তা অপ্রতুল।

শিল্প

বাঁকুড়া-১ ব্লকে কোন বৃহৎ শিল্প নেই। কেঞ্জাকুড়া, হেলনা-শুশুনিয়ার কাঁসা-বাসন শিল্প, কেঞ্জাকুড়া-দামোদরপুরের বস্ত্রশিল্প, জগদল্লায় কাঠ শিল্প, কেঞ্জাকুড়ার বাঁশ শিল্প, জগদল্লা-ধলডাঙ্গার পাথর ক্রাশার ও চালকল, কিছু ইঁটভাটা-করাতকল ছাড়া বড় কোন শিল্প গড়ে ওঠেনি। PMRY, SESRU, KVIB ঋণের মাধ্যমে আরো শিল্প গড়ে উঠেছে ও স্বনির্ভরতা বাড়ছে। সম্প্রতি পোলট্রি শিল্পের প্রসার ঘটেছে।

নিকাশী ব্যবস্থা ঃ নদ নদী

মূল নদী ঃ দ্বারকেশ্বর নদ (১৬.২ কিমি)

জোড় - ১) মাতলা জোড় (১০কিমি) ২) যমুনাজোড় (৮.৩ কিমি) ৩) দামড়াগোড়া জোড় (২.৬ কিমি) ৪) আঙ্গারিয়া জোড় (৫.৮ কিমি) ৫) পাঁচামিসিনি (৩.৩ কিমি) ৬) জগদল্লা-পাতাকোলা জোড় (২ কিমি) ৭) উজানি জোড় (৮ কিমি) ৮) মাঝকানালী জোড় (৫.১ কিমি) ৯) গোঁসাইডি জোড় (২.৩ কিমি) ১০) ভালুকসুন্দা জোড় (৫.৪ কিমি) ১১) ছাগলকুটা জোড় (৩.৬ কিমি)

সব জোড় মূলত ব্লক সীমান্তে উৎপত্তি এবং দ্বারকেশ্বর নদে মিশেছে। দ্বারকেশ্বর নদ পুরুলিয়া জেলায় উৎপন্ন হয়ে ছাত্না হয়ে রামনগর ভোলাইডির কাছে বাঁকুড়া-১ এ প্রবেশ করেছে এবং পাতাকোলার কাছে বাঁকুড়া-২ ব্লকে প্রবেশ করেছে।

নির্বাচনী মানচিত্র

ব্লক এলাকা বাঁকুড়া লোকসভাভূক্ত। আঁধারথোল ও কালপাথর গ্রাম পঞ্চায়েত ইন্দপুর বিধানসভাভূক্ত।

জগদল্লা-১ ও জগদল্লা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত ওন্দা বিধানসভাভূক্ত। আঁচুড়ি ও কেঞ্জাকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত বাঁকুড়া বিধানসভাভূক্ত।

বিধানসভা ওয়ারী নির্বাচকের সংখ্যা

বিধানসভা	মোট	মহিলা	পুরুষ	নির্বাচন কেন্দ্র
ওন্দা	১৪,৪৯০	৭০৭৩	৭৪১৭	১৫
ইন্দপুর	১৯,৯১৪	৯৫৮৫	১০৩২৯	২০
বাঁকুড়া	২৫,৫২৮	১২৫১৭	১৩০১১	২৬
	৬০,৩৩২	২৯১৭৫	৩০৭৫৭	৬১

জেলা পরিষদ আসন - ১

গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি আসন ও সদস্য

গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	সংসদ সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	পঞ্চায়েত সমিতি আসন
জগদল্লা-১	১১	১১	০২
জগদল্লা-২	১০	১০	০২
আঁচুড়ি	১৬	১৭	০৩
কেঞ্জাকুড়া	১৫	১৮	০৩
কালপাথর	১২	১২	০২
আঁধারথোল	১৫	১৬	০৩
মোট	৭৯	৮৪	১৫

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প

	জগদল্লা-১	জগদল্লা-২	আঁচুড়ি	কেঞ্জাকুড়া	আঁধারথোল	কালপাথর
জাতীয় বার্ধক্যভাতা উপভোক্তা	১৪৬	১৩৭	২৪২	২০৩	২২৫	১৬৫
অন্নপূর্ণা উপভোক্তা	১৩	১৩	২০	১১	১৫	১০
অন্ত্যোদয় উপভোক্তা	৪৩৪	৪০১	৬৫১	৬৯৩	৭৭৮	৫১৭
মোট	৫৯৩	৫৫১	৯১৩	৯০৭	১০১৮	৬৯২

এছাড়া সমাজকল্যাণ দপ্তর পৌর-১১৮, পঞ্চায়েত ৭৭ মোট ১৯৫ জনকে বার্ধক্য ভাতা; পৌর-৫৯, পঞ্চায়েত ৩১ মোট ৯০ জনকে বিধবা ভাতা; পৌর-৫৪, পঞ্চায়েত-১৭ মোট ৫১ জনকে প্রতিবন্ধীভাতা দেয়। তাছাড়া শিল্প দপ্তর, কৃষি দপ্তর, মৎস্য দপ্তর কিছু বার্ধক্যভাতা দিয়ে থাকে। স্বাস্থ্য দপ্তরের জননীসুরক্ষা যোজনা, সমাজকল্যাণ দপ্তরের বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা, কিশোরী সশক্তি যোজনা অন্যান্য কল্যাণমুখী প্রকল্প যেগুলি রূপায়ণে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া দুর্বলতর শ্রেণীদের জন্য ধর্মগোলা তৈরী করা হয়েছে ২৫০টি।

ইন্দিরা আবাস যোজনা ছাড়াও পঞ্চায়েত দ্বাদশ অর্থকমিশন, ২য় অর্থ কমিশন, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদ তহবিল, বিধায়ক-সাংসদ তহবিল দিয়ে বিভিন্ন পরিকাঠামো প্রকল্প হাতে নিয়েছে। শ্রমদিবস সৃষ্টির বড় প্রকল্প কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পে। মজুরি প্রদানে স্বচ্ছতা ও শ্রমিকদের সঞ্চয়াভ্যাস তৈরীর জন্যে এই ব্লকের সমস্ত শ্রমিকের মজুরি সেভিংস একাউন্টে করা হচ্ছে।

পরিকাঠামো

জাতীয় সড়ক ৮ কিমি, জেলা সড়ক ২০ কিমি, প্রধানমন্ত্রী সড়ক ১৫ কিমি, অন্যান্য সড়ক ৫২ কিমি, বিদ্যুতায়িত মৌজা ঃ সব।

হাট - ১টি (শুনুকপাহাড়ী), বাজার ঃ পোয়াবাগান, আঁচুড়ি, বাদুল্লাড়া, ধলডাঙ্গা, কাশিবেদিয়া, কেঞ্জাকুড়া সার বিক্রয় কেন্দ্র - ৭০, বীজ বিক্রয় কেন্দ্র - ২৫, রেশন দোকান - ৫২, মোবাইল পরিষেবাভূক্ত এলাকা ঃ সমস্ত ব্লক। তথ্যমিত্র / ইন্টারনেট কেন্দ্র - ৭টি। ব্লকের ওয়েবসাইট www.bankura.gov.in / bankura 1/ bankura1.htm এ ব্লকের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যাবে।

পানীয় জলের উৎস হিসাবে ব্লকে নলকূপের সংখ্যা ৪৫০। তাছাড়া পোয়াবাগান, মধুবন, নাঙ্গলবেরা তিনটি স্বজলধারা এবং কেঞ্জাকুড়া, বাদুল্লাড়া, আঁধারথোল, আইলাকুন্দি, পাতাকোলাতে পাইপলাইন জলসরবরাহ ব্যবস্থা আছে।

পুরাতত্ব

মোলবোনায় পুরান প্রস্তর যুগের মেগালিথ আছে। ছেন্দুয়া ও দামোদরপুর, উপারশোলে পুরাতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাচীন যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

ধর্মীয় স্থান - দ্রষ্টব্য স্থান

মোলবোনার পুরান মৌলেশ্বরের মন্দির ও মেগালিথ প্রাচীন ধর্মীয়স্থান। শুনুকপাহাড়ী মৌজার পাহাড় সংলগ্ন ফুল-ফল গাছের বাগান দ্রষ্টব্য স্থানে পরিণত হচ্ছে।

পুরান যুগ থেকে বিবিধ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজকের বাঁকুড়া-১ এ উত্তরণ। বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণের মধ্য দিয়ে আগামী দিনে সমৃদ্ধ বাঁকুড়া-১ গড়া সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১) সেনসাস প্রতিবেদন ২০০১

২) বাঁকুড়া জেলা সংখ্যাতত্ত্ব পুস্তিকা ২০০৬

৩) সমষ্টি উন্নয়ন করণ ঃ বাঁকুড়া-১

৪) কৃষি উন্নয়ন করণ ঃ বাঁকুড়া-১

৫) সমষ্টি প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন করণ ঃ বাঁকুড়া-১

৬) পারিবারিক (আর্থসামাজিক) সমীক্ষা ২০০৬

ইতিহাসের আলোকে বাঁকুড়া

রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী

৯৫৮৪০ জন অধিবাসী অধ্যুষিত ও ১৬৭.৬৪ বর্গকিমি আয়তনের বাঁকুড়া ব্লক-১ হলো প্রধানতঃ মাকড়া পাথরে গঠিত বহুবিস্তৃত গণ্ডোয়ানা পুরাভূমির অবিচ্ছেদ্য অংশ ও সংকীর্ণতর অর্থে ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত। এ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে দ্বারকেশ্বর নদ পশ্চিম দিক থেকে পূর্ববাহিনী। সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই এ এলাকা গহণ অরণ্যাবৃত। এ ভূখণ্ডের মৌলবনা, কেন্দকুনি, বরাবাথান, বরুট, বনকাটা, আঁধারথোল ইত্যাদি অসংখ্য গ্রামনামের মধ্যে পুরাকাল থেকে অরণ্যসংকুলতার সাক্ষ্য মেলে। এমনকি, দেড় শতাধিক বছর আগে বর্ধমান জেলা থেকে এসে যখন কালপাথরের বাগপরিবারের প্রতিষ্ঠাপুরুষ পাকা বাড়ী তৈরী করে এখানে বসবাস শুরু করেন তখনও এ ভূখণ্ড ছিল সুগভীর বনাচ্ছাদিত।

প্রাগৈতিহাসিক পর্ব ঃ

বর্তমানে বাঁকুড়া ব্লক-১ নামে পরিচিত জনপদের ইতিহাসের মূল প্রাচীন প্রস্তর যুগ পর্যন্ত প্রসারিত। ১৯৫৯ সালে বাঁকুড়া শহরের চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে দ্বারকেশ্বর নদের দক্ষিণ অববাহিকায় অবস্থিত বর্তমানে জনবসতিশূন্য উপরশোল গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে পুরনো প্রস্তর যুগের মানুষের ব্যবহৃত পাথরের একটি কর্তরি (Chopper)[১]। এ অঞ্চলে প্রস্তর যুগ থেকেই মানুষের বসবাসের আরো পরিচয় মেলে মেগালিথিক সংস্কৃতির প্রত্নুনিদর্শনসমূহ থেকে। এ প্রত্ন-নিদর্শন মেনহির বা বীরস্তম্ভ নামে অভিহিত. মেনাহির হলো 'মেগালিথিক কালচার' অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগের ঐতিহ্যধারার সাক্ষ্যবহ। 'প্রাচীনতার নিদর্শন নয়, প্রতীক নিদর্শন। অর্থাৎ প্রস্তর যুগের নিদর্শন নয়, সেই সংস্কৃতির উত্তরসাধকদের পরবর্তীকালের নিদর্শন।'[২] মেনহির আবিষ্কৃত হয়েছে বাঁকুড়া থানার পশ্চিমাংশে দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর অববাহিকার মৌলবনা গ্রামে এবং বাঁকুড়া শহরের ভৈরবস্থানে। এ মেনহিরগুলি থেকে ইঙ্গিত মেলে যে, অতি প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে ছোটনাগপুরের হো-মুন্ডা ইত্যাদি নিষাদ জাতির লোকেদের বসবাস ছিল এবং তারা যোদ্ধা বা গোষ্ঠীপতিদের সমাধিক্ষেত্রে তাঁদের স্মৃতিরক্ষার জন্য স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করত।

প্রাচীন যুগ ঃ

বাঁকুড়া ব্লক-১ ভূখণ্ডের প্রাচীন যুগের ইতিহাসও খুব স্পষ্ট নয়। মৌলবনা গ্রামে মৌলেশ্বর শিবথানের কাছে ছড়ানো ভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান প্রস্তর-ফলকে খোদিত মূর্তিগুলিকে বিনয় ঘোষ জৈন-বৌদ্ধ-গণপতি মূর্তি বলে সনাক্ত করেছেন।[৩] তাঁর এ সনাক্তকরণ মেনে নিলে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীনকালে দ্বারকেশ্বর নদ তীরবর্তী এক্তেশ্বর-বহুলাড়া-ধরাপাটের মত মৌলবনাতেও বৌদ্ধ-জৈন্য ধর্মকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ অবলোকিতেশ্বর শব্দমূলে এক্তেশ্বর নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে অভিমত আছে। অর্থাৎ এক্তেশ্বর শিবমন্দির আদিতে ছিল একটি বৌদ্ধ মন্দির, পরবর্তীকালে শিবমন্দিরে রূপান্তরিত। অনুরূপভাবে মৌলেশ্বর শিবমন্দিরও বৌদ্ধ বা জৈন মন্দিরের পরিবর্তিত রূপ বলে অনুমান করা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, মহাযানী বৌদ্ধধর্মে গণেশ উপাসনা ও জৈনধর্মে লক্ষ্মী-কুবের-গণেশ উপাসনা অনুমোদিত।

অতএব মৌলবনায় বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তির পাশাপাশি গণেশ মূর্তির অবস্থান প্রমাণ করে যে, ইতিহাসের প্রাচীন পর্বে মৌলবনা অঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে যে মূর্তিগুলিকে বিনয় ঘোষ বৌদ্ধ-জৈন মূর্তি বলে চিহ্নিত করেছেন সেগুলি এতই অস্পষ্ট যে সেগুলির সনাক্তকরণ সম্পর্কে তাঁর অভিমত সন্দেহাতীত নয়। আর জৈন মন্দিরের শিবমন্দিরে রূপান্তর বহুলাড়া ও ধরাপাটে যত স্পষ্ট, মৌলবনা ও এক্তেশ্বরে তা মোটেই নয়।

মহারাজ চন্দ্রবর্মনের শুশুনিয়া লেখর নিরিখে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরবর্তী বাঁকুড়াভূমি দামোদর তীরবর্তী পুষ্করণ (বর্তমান পখন্না) রাজ্যের বর্মন নরপতিদের শাসনাধীন ছিল। হরিষেণ বিরচিত এলাহাবাদ প্রশস্তি অনুযায়ী চন্দ্রবর্মনের রাজ্য গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের শাসনাধীন হলে এ অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের বর্ধমানভুক্তির অংশে পরিণত হয়েছিল। পাল সম্রাট নরপালের ইর্দা লিপিতে উল্লিখিত 'ছগুিবন্না' যদি ছাতনা হয় তা হলে একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ অঞ্চলে নিঃসন্দেহে পাল আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল।

মধ্যযুগ ঃ

বাঁকুড়া ব্লক-১ এর অন্তর্গত ভূখণ্ডের ইতিহাস স্পষ্টতা পেয়েছে মধ্যযুগে। এ এলাকার এ সময়কার ইতিহাস ছাতনাকেন্দ্রিক সামন্তভূমের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ এ ব্লকের গ্রামীণ এলাকার প্রায় সবটাসহ বাঁকুড়া শহরের এক বৃহদংশ বা দক্ষিণ পশ্চিম অংশ ছিল সামন্তভূমরাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ছাতনার প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শঙ্খ রায়। ও'ম্যালির গেজেটিয়ারে তিনি সাঁওত বা সাঁওতাল ছিলেন বলে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।[৪] কিংবদন্তী মতে পঞ্চকোট রাজের প্ররোচনায় ভবানী বারাৎ নামে একজন ব্রাহ্মণ ছাতনার সাঁওত রাজবংশের পতন ঘটিয়ে সামন্তভূমের শাসনকর্তৃত্ব দখল করেন। তিনি দ্বারকেশ্বর নদ তীরবর্তী বর্তমান ভোলা নামক গ্রামে একটি সীমান্ত দূর্গ নির্মাণ করেছিলেন। বাঁকুড়া ব্লক-১ এর অন্তর্গত এ গ্রামটিতে ইঁট-পাথরে তৈরী পুরনো দূর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনো অবলুপ্ত হয়নি। এমনকি, জনশ্রুতি মতে, এখানকার নাচঘরের প্রত্নচিহ্নও চোখে পড়ে। ভোলার সামান্য দূরে মাঠের মধ্যে বর্তমানে জনবসতিশূন্য বারাতের গাঁ নামক একটি গ্রামের অস্তিত্ব বারাৎবংশীয় শাসনের সাক্ষ্য বহন করে।

ভবানী বারাৎ বা তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের শেষ রাজা বাসলীকে পার্বতীরূপে পূজা করতে অস্বীকার করায় অর্থাৎ রাজ্যে বাসলী উপাসনার পরিবর্তে বা সমান্তরাল পার্বতী উপাসনা প্রবর্তনে সচেষ্ট হওয়ায় সাঁওত বা সাঁওতালদের হাতে প্রাণ হারান। তিনি মৌলবনায় শিবের গাজন দেখতে গিয়ে গোপালপুর গ্রামের এক কুম্ভকারগৃহে ভক্ত্যাবেশে আত্মগোপনকারী বার জন (মতান্তরে তের জন) সাঁওতাল সর্দারের আকস্মিক আক্রমণে নিহত হন। আবার এ ধরণের জনশ্রুতিও আছে যে তাঁরা ডোমেদের ঢাকের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। যাহোক, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সাঁওতাল শাসনের বিরুদ্ধে অচিরেই গণবিদ্রোহ দেখা দিলে পুনরায় রাজ্যহারা ত্রয়োদশ বাকড়া বা সাঁওত সর্দার বন্য শূকরের অবাধ বিচরণক্ষেত্র বরাবাথানের গহণ অরণ্যে আশ্রয় নেন। কিংবদন্তী মতে তাঁরা এ জঙ্গলে অবস্থানকালে জনৈকা রমণীর পরামর্শ মত কেন্দ চারা সংগ্রহ করে ও বাসলীর আদেশমত কলাকৌশল গ্রহণ করে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। এভাবে স্থাপিত হয় সামন্তভূমরাজ্যের স্থায়িত্বের পালা। সামন্তভূমের এ রাজবংশ রাজপুত ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিদার এবং রাজন্যবর্গ ও তাঁদের উত্তরপুরুষগণ ও শাখা বংশের বংশধরগণ সাধারণভাবে 'রায়' পদবীধারী সামন্ত ক্ষত্রিয়রূপে বিবেচিত।

ত্রয়োদশ বাকড়ার একজন রাজা হলে অন্য বারজন সামন্তভূমরাজ্যের বারটি পরগণার মালিক হন। চারটি পরগণা ছিল বাঁকুড়া ব্লক-১ এলাকার অন্তর্গত। যথা, আচুড়ি পরগণা, জগদল্লা-২ অঞ্চলের দামোদরপুর পরগণা, কুমিদ্যা-কালপাথর অঞ্চলের সাতগাঁ পরগণা, শুনুকপাহাড়ী-আঁধারথোল অঞ্চলের পুরুণ্ডি পরগণা। বাকড়া শব্দের অর্থ বন্য দস্যু। এদিক থেকে তুঙ্গভূম-শিখরভূম-বরাহভূমের মত সামন্তভূমের লোকেদের পেশা ডাকাতি ও লুঠতরাজ বলে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে রচিত ভবিষ্য পুরাণের[৬] বক্তব্যের সঙ্গে এ এলাকার ঐতিহাসিক বাস্তব পরিস্থিতির মিল আছে। অতএব দেখা যায়, মধ্যযুগে বাঁকুড়া ব্লক-১ নামে অধুনা চিহ্নিত জনপদের পশ্চাদ্বর্তিতা-ব্যথিত সামাজিক সাংস্কৃতিক

বিকাশের মূল কারণ।

পরগণা সংবাদ ঃ

পঞ্চকোট দুর্গের দুয়ারবন্দি ও খড়িবাড়ি তোরণে ১৬০০ সালে উৎকীর্ণ একই লিপি[৭] থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিষ্ণুপুরের মল্ল নরপতি বীর হাম্বির (১৫৯১-১৬১৬) ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে পঞ্চকোট রাজ্য দখল করেছিলেন। স্বভাবতঃই এ দুই রাজ্যের মধ্যবর্তী সামন্তভূমও মল্ল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়েছিল। স্পষ্টতঃই এ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল আচুড়ি পরগণার উপর দিয়ে। তবে সামন্তভূমের উপর মল্লাধিকার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি বলে মনে করার যুক্তি আছে। কিন্তু স্বল্পকাল স্থায়ী মল্লাধিকারের ফলে সামন্তভূম যেমন বৈষ্ণব ধর্মসংস্কৃতি তথা ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও রীতিনীতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে তেমনি পরগণাগুলিতেও এ সাংস্কৃতিক রূপান্তরপ্রবাহ বাস্তব রূপ পায়।

পুরুন্ডি, সাতগাঁ, দামোদরপুর ও আচুড়ি পরগণার চারটির মধ্যে সাতগাঁ অন্তর্গত ছিল দামরাড়ি, কেলিপুর, টন্নি, ছাড়ারডিহি, নীলডিহি, কালুডিহি ও কাকড়াডিহি। টন্নি ছিল পরগনার মূল কেন্দ্র এবং বর্তমানে দামড়াড়ি ও কেলিপুর আচুড়ি অঞ্চলের অন্তর্গত। পুরুন্ডির মত টন্নিতে বৃক্ষতলে অধিষ্ঠিতা বাসলী ফুলদেবীরূপে পূজিতা; পুরোহিত কুমিদ্যা গ্রামের চক্রবর্তী পদবীধারী এক ব্রাহ্মণ পরিবার। দামোদরপুর পরগনা ছিল দামোদরপুর, কেন্দকুনিয়া, উপরোশল, আগয়া, বাশি, দক্ষিণ বনকাটা ও মানুষমুড়া মৌজা নিয়ে গঠিত। পুরুন্ডি ও সাতগাঁর মত দামোদরপুরেও 'রায়' পদবীধারী সামন্ত ক্ষত্রিয়দের অন্ততঃ চার'শ বছরের পুরুষানুক্রমিক বসবাস। কিন্তু কুলদেবতা রাধাদামোদর এবং জলদেবতার নাম থেকেই মনে হয় পরবর্তীকালে পরগনার দামোদরপুর নামকরণ। পুরোহিতের কাজ করেন রাজগ্রাম থেকে এনে বসানো এক চট্টোপাধ্যায় পরিবার। আচুড়ি পরগণার প্রথম বাকড়ার বসতি ছিল রামডি গ্রামে। তা এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত। পরবর্তীকালে এ পরিবারের দৌহিত্র বংশ আচুড়ির বাজাপাড়ায় বসতি পত্তন করে। এখানকার ছত্রীরা 'সিং' পদবীধারী। কুলদেবতা 'রাধামাধব' পুরোহিত আচুড়ি গ্রামের ঘটক পরিবার। লোকপুর-পার্বতীপুর, কেন্দুয়াডিহি, পাটপুর মৌজাসহ বাঁকুড়া শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ছিল আচুড়ি পরগণার শাসনাধীন। মনে হয়, এ মৌজাগুলি ছিল কানকাটা অঞ্চলে অবস্থিত মীনাপুর ঘাটের অন্তর্গত। নীলু রায় ও লক্ষ্মীনারায়ণ রায় নামে দুজন ঘাটোয়ালের নামও শোনা যায়। মনে হয় তাঁরা ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের মানুষ।

কয়েকটি গ্রামবসতি ও পরিবারের কথা ঃ

১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্‌নার সামন্ত রাজবংশ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের উত্তরকালে ১০৭০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজগ্রাম জনবসতির বিকাশ শুরু হয়েছিল। এখন থেকে ৩৪৩ বছর আগে পূর্ববঙ্গাগত শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় ছাতনারাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ১০৭০ বঙ্গাব্দে এক সনদবলে ছাতনার রাজা তাঁর সভাপণ্ডিতকে দ্বারকেশ্বর নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত নিজের খাসদখলী শ্রীরামপুর মৌজা নিষ্কর দান করেছিলেন। শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়ের নামানুসারে এ মৌজার শ্রীরামপুর নামকরণ হয়েছিল। সভাপণ্ডিতের কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পর শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলে যে নূতন গ্রামবসতি বিকাশ লাভ করে তা 'রাজগ্রাম' নামে পরিচিত হয়।[৮] শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরপুরুষগণ প্রজাবিলি ও বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রচুর জমি হস্তান্তর করায় রাজগ্রামের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল। রাজগ্রাম একটি বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। ফলে 'দত্ত' পদবীধারী তন্তুবায় ও 'কুণ্ডু' পদবীধারী তাম্বুলি ব্যবসায়ীগণ রাজগ্রামে বসবাস শুরু করেন। দ্বারকেশ্বর নদপথে নৌকায় খাটাল পর্যন্ত রাজগ্রামের আমদানী-রপ্তানি বাণিজ্য চলত। বিশ শতকের প্রথমার্ধে রাজগ্রামের কেদারনাথ কুণ্ডু ছিলেন হরিতকী, লাক্ষা ও ধানচালের একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। তাছাড়া তিনি ছিলেন একজন মহাজনী কারবারী। আরেকজন মহাজন ছিলেন বিপিনবিহারী দত্ত।

ব্যবসা-বাণিজ্য-মহাজনী কারবার সূত্রে রাজগ্রামের আর্থিক সমৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটে খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত মন্দির স্থাপত্যে। একটি হলো ছাতনার রাজপরিবার অথবা মতান্তরে স্থানীয় তন্তুবায় ব্যবসায়ী

চিন্তামণি দত্ত কর্তৃক পল্লীর হাটতলায় নির্মিত ইঁটের পূর্বমুখী নবরত্ন শ্রীধর (শালগ্রাম) মন্দির, অন্যটি শ্রীরামপুর পাড়ায় তাম্বুলিবর্ণীয় কুণ্ডু পরিবারের ইঁটের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন শালগ্রাম মন্দির।

রাজগ্রাম জনবসতির পূর্বদিকে দু-তিন মাইল দূরে সেকালের সংকীর্ণ ধারার দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে পাতাকলাও ছিল একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। যে কলাগাছে শুধু পাতা হয়, ফল হয়না, তাকে পাতাকলা বলে। স্পষ্টতঃই একদা এখানে এ ধরণের কলাগাছের প্রাচুর্যমূলে ঘটেছিল এ গ্রামের নামোৎপত্তি। অধিকাংশ গৃহস্থ পরিবার ছিল দ্বাদশ তিলি সম্প্রদায়ভুক্ত সম্পন্ন চাষী ও ব্যবসায়ী। এক সময়ে ব্রাহ্মণদেরও বাস ছিল। জগদল্লার ব্রাহ্মণ চৌধুরী পরিবারের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন এ গ্রামেরই বাসিন্দা। তাছাড়া কামার-কুমার-ছুতার-জেলে-মুচিদেরও বসবাস ছিল। পাতাকলা ছিল দক্ষিণ বাঁকুড়ায় যাতায়াতের দ্বারস্বরূপ। তাই খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যবস্থা ষাট বছর আগে পর্যাপ্তও অব্যাহত ছিল। পাতাকলার ঘাট পার হয়েই ইংরেজরা তালডাংরা পথ ধরে সিমলাপাল-রাইপুর-তুঙ্গভূমের রাজাদের আনুগত্য আদায় ও ১৭৯৮-৯৯ সালের চুয়াড় বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিল। একাধিকবার দারকেশ্বরের প্লাবনে এখানকার জনবসতি বিধ্বস্ত হয়েছে। ১৮৪৪-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালের মধ্যে কোন এক সময়ে দ্বারকেশ্বর নদের এক বিধ্বংসী জলপ্লাবনের প্রবল তোড়ে পাকা ঘরবাড়ীসহ জনবহুল পাতাকলা গ্রামের এক প্রকার অবলুপ্তি ঘটে।[৯]

রাজগ্রামের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের মত শানাবাঁধ গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন বিক্রমপুর থেকে আগত লম্বোদর বন্দ্যোপাধ্যায়। শানাবাঁধের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যগণ হলেন তাঁর তেইশতম পত্নীর গর্ভজাত পুত্রসন্তানের বংশধর। কৌলীন্য প্রথা ছিল এভাবে এ পরিবারের উদ্ভবের কারণ। এ গ্রামে চট্টোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় পদবীধারী ব্রাহ্মণদেরও বসবাস আছে। এ গ্রামের তুলসী নাম্নী গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কোন এক সময়ে তাঁর প্রয়াত স্বামীর চিতায় সহমৃতা হয়েছিলেন। সতীদাহের ঘটনা ঘটতে পারে এ ধরণের খবর পেয়ে তা প্রতিহত করার জন্য বাঁকুড়া থানার দারোগা ফৈজুল্লা খান সঙ্গে সিপাহী নিয়ে গ্রামে গিয়ে হাজির হন। কিন্তু তুলসী দেবী স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে সতী হতে চলেছেন এরকম প্রমাণ দিয়ে দারোগার উপস্থিতিতেই স্বামীর চিতায় আরোহণ করে সহমৃতা হন।[১০] শানবাঁধা গ্রামের যে পুকুরপাড়ে এ ঘটনা ঘটেছিল সে স্থানটি এখনো সতীস্থান নামে অভিহিত।

ব্রিটিশ আমলে সামন্ত সর্দার শাসিত পরগণা ব্যবস্থার পতন ও জমিদারি ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটলে কয়েকটি জমিদারিভিত্তিক ধনী পরিবারের উদ্ভব ঘটে। এগুলি হলো জগদল্লার চৌধুরী পরিবার,[১১] কালপাথরের বাগ পরিবার, শুনুকপাহাড়ীর দত্ত পরিবার, কালাবতীর চৌধুরী পরিবার। তাছাড়া আধারথোল অঞ্চলের নূতনগ্রাম পাহাড়পুর পল্লীর হারু মল্লিক নামে একজন মুসলমান জমিদার ছিলেন। তাঁর নামানুসারে একটি মৌজা 'হারু মল্লিকের বনকাটা' নামে পরিচিত।

বাঁকুড়া থানা পর্যন্ত কাশীপুর রাজের অধিকার কখনো সম্প্রসারিত হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ থাকলেও জগদল্লার চৌধুরী পরিবারের বংশধরদের দাবী অনুযায়ী তিন শতাধিক বছর আগে দ্বারকেশ্বর নদের জলোচ্ছ্বাসে পাতাকলা গ্রাম থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখোপাধ্যায় পদবীধারী জয় চৌধুরী কুলদেবতা রাধামাধব শালগ্রাম শিলার পুনর্বাসনের জন্য পঞ্চকোটরাজের কাছ থেকে দেবোত্তর সম্পত্তি হিসাবে জগদল্লা, বাঁশি, আড়ালবাঁশি, মানুষ মুড়া, পাতাকলা, শিবরামপুর, নন্দীগ্রাম ইত্যাদি মৌজার মালিকানা ও 'চৌধুরী' পদবী লাভ করে জগদল্লা গ্রামে নূতন বসতি স্থাপন করেন। সম্পত্তি দেবোত্তর হিসাবে পরিচালিত হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে কোন অর্পণনামা দলিল সম্পাদিত হয়নি। সম্পত্তি লাভের পর জয় চৌধুরী দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। তিনিই ছিলেন এ পরিবারের সমৃদ্ধির প্রকৃত রূপকার।

জয় চৌধুরীর মৃত্যুর পর নির্মিত হয়েছিল রাধামাধবের প্রতিষ্ঠাফলকবিহীন ইঁটের পঞ্চচূড় মন্দির ও অতিথিশালা। জগদল্লা হয়ে হরিরামপুর-গৌরবাজার যাওয়ার পথে সাধুসন্ন্যাসীরা ও পথিকগণ এখানে আতিথ্য গ্রহণের সুযোগ

পেতেন। পরবর্তীকালে দেবোত্তরের প্রধান পরিচারক প্রসন্নকুমার চৌধুরী ১৩১১ বঙ্গাব্দের ১১ই চৈত্র নির্মাণ করেছিলেন ইঁটের অষ্টচূড় রাসমঞ্চ। আরো পরে পরিচারক রূপনারায়ণ চৌধুরী কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল শিবমন্দির। প্রধান উৎসবগুলি ছিল জন্মাষ্টমী, রাসোৎসব, দোলযাত্রা। তাছাড়া 'লাছের' অর্থাৎ সম্মুখ দরজার পুকুরে অনুষ্ঠিত হতো কালীয় দমন উৎসব যা বাঁকুড়া জেলার অন্য কোথাও অনুষ্ঠিত হত না বা হয় না।

জয় চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র পতিতপাবন ছিলেন ভবঘুরে, কিন্তু দাবাখেলায় অত্যন্ত পারদর্শী। দাবাখেলার পারদর্শিতাগুণে কাশীপুররাজের মন জয় করে তিনি তাঁর কাছ থেকে কুমিদ্যা অঞ্চলে ভূসম্পত্তি লাভ করে সেখানে নিজের গৃহস্থালীর সূচনা ঘটান। তাঁর বংশধরগণ বাঁকুড়া আদালতে জগদল্লায় পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ ও রাধামাধবের সেবাপূজার অধিকার দাবি করে মামলা করলে আদালতের রায় অনুসারে রাধামাধব বছরে তিন মাস সেবাপূজার জন্য কুমিদ্যায় অবস্থান করেন। সেখানেও রাধামাধবের মন্দির ও রাসমঞ্চ আছে।

জগদল্লার চৌধুরী পরিবার আধুনিক শিক্ষার দিকে ঝুঁকেছিল বিশ শতকের গোড়ার দিকে। ১৯৪৬ সালে অকালে প্রয়াত গোবিন্দপ্রসাদ চৌধুরী ছিলেন একজন গ্র্যাজুয়েট। তিনি বিহার সরকারের সমবায় বিভাগের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হয়ে আধিকারিক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর অগ্রজ কালীকৃষ্ণ চৌধুরী ছিলেন এন্ট্রান্স পাশ। তাঁরা দুজনেই ছিলেন জয় চৌধুরীর অধস্তন একাদশ পুরুষ।

কালপাথর গ্রামের শুঁড়িবর্ণীয় বাগ পরিবারের[১২] আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলায়। সেখানেও এ পরিবারটি ছিল অবস্থাপন্ন। তা সত্ত্বেও সমাজে পতিত হয়ে সেখানকার বাসস্থান পরিত্যাগ করে দেড় শতাধিক বছর আগে সেকালে ঘন জঙ্গলাকীর্ণ কালপাথরে এসে বাগ পরিবারের প্রতিষ্ঠাপুরুষ পাকা বাড়ী তৈরী করে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পৌত্র ভজহরি বাগ ছিলেন একজন করিৎকর্মা পুরুষ। তিনিই হলেন কালপাথরে বাগ পরিবারের আর্থিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক প্রভাবপ্রতিপত্তির প্রকৃত রূপকার। তিনি কালপাথর, কমলাগড়্যা (নাম), ন্যাকড়াগড়্যা, পুরুণ্ডি, কালাবতী, কামিনবেদ্যা, গড়্যাশোল, বনচিংড়া, ছেন্দুয়া, গাংতোড়া, তেঘরি ইত্যাদি মৌজা ক্রয় করে প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক হন। অচিরেই এ পরিবার জমি-জমার উৎপন্নভোগাদি ও তেজারতির সুবাদে প্রচুর বিত্তবৈভব সঞ্চয় করে।

কিন্তু বাগ পরিবারের তিন পুরুষে কারোর লেখাপড়া শেখা হয়নি। অতএব ভজহরি বাগের ভ্রাতুষ্পুত্র উমাচরণ বাগ উচ্চ প্রাথমিক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে পরিবারের মানতরক্ষার তাগিদে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এজমাল সরস্বতী পূজা প্রচলিত হয়। কিন্তু ১৯১৫ সালে শরিকী গোলযোগের জেরে বাগপরিবারের লোকেরা নিজেদের মধ্যে ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে পড়েন। ফলে সরস্বতী পূজার পাকা মণ্ডপ দ্বিধাবিভক্ত হয় ও দুটি পৃথক প্রবেশপথের ব্যবস্থা হয়। এমতাবস্থায় বাগপরিবারের হিতাকাঙ্খী রাজগ্রামের কুণ্ডু পরিবারের মধ্যস্থতায় ফৌজদারি মামলায় জড়িত দুই প্রতিপক্ষ আপোষমীমাংসায় সম্মত হয়। আপোষের সূত্র অনুযায়ী কয়েকটি বৃহৎ পুকুরসহ সদর থানার গাংতোড়া মৌজা ও ছাত্না থানার তেঘরি মৌজার কিছু জমি সরস্বতীপূজার দেবোত্তর হিসাবে নির্দিষ্ট হয় ও শরিক পরিবারসমূহের প্রধানদের নিয়ে একটি পরিচারকমণ্ডলী গঠিত হয়। এভাবে বাগদের পারিবারিক সরস্বতীঠাকুরাণী দেবোত্তরের উদ্ভব ঘটে। দেবোত্তরের কোন বিবিধবদ্ধ অর্পণনামা দলিল সম্পাদিত হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। তবে ১৯৩৬ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখের একটি দলিল থেকে জানা যায় যে, সে সময়ে এ দেবোত্তরের পরিচারকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন রাসবিহারী বাগ, সতীশচন্দ্র বাগ, ফেলারাম বাগ, রামকিঙ্কর বাগ, সারদাপ্রসাদ বাগ দিগর।

দেবোত্তরের প্রভূত আয় থেকে মহাধুমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতো সরস্বতী পূজা। ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা ছিল। বেলিয়া, পুরুণ্ডি, কুমিদ্যা ইত্যাদি আশপাশ গ্রামের প্রায় এক হাজার ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হতেন। তাছাড়া আত্মীয়স্বজন নিয়ে তিন হাজার লোক খাওয়ানো হতো। তিন দিন যাত্রাভিলায় অনুষ্ঠিত হতো।

বাগপরিবারের খাস চাষ ছিল কালপাথর ও কমলাগড়্যা মৌজায় ১২০০ বিঘা। সাজাখাজনা আদায় ছিল ৯০০ বাঁকুড়ি মাপ অর্থাৎ ১৪০০ কুইন্টল ধান। মহাজনী ছিল ৯০০ মাপ। সুদ পাওয়া যেত অন্ততঃ ২৫০ মাপ।

চট্টোপাধ্যায় পদবীধারী এক ব্রাহ্মণ পরিবারকে কালপাথর গ্রামে বসানো হয়েছিল অতিথি সেবার জন্য। এ

পরিবারটিকে কালপাথর মৌজায় এক'শ বিঘা জমি দেওয়া হয়েছিল। এ পরিবারের লোকেরাই বাগদের জমিদারি সেরেস্তার গোমস্তার কাজ করত। ছেন্দুয়া গ্রামের বাউরিরা নগদ বেতনে করত লগদির কাজ।

মোটামুটি এক'শ পঁচিশ বছর আগে আঁধারথোল অঞ্চলের নূতনগ্রাম পাহাড়পুর পল্লীর হারু মল্লিক নামে জনৈক মুসলমান নূতনগ্রাম মৌজা ও বনকাটা মৌজা ক্রয় করে এক জমিদারি পত্তন করেছিলেন।[১৩] তাঁর বংশপরিচয় ও ভাগ্যোন্নতির উল্লম্ফন মঞ্চ কিভাবে প্রস্তুত হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায় না। শুধু নূতনগ্রাম পাহাড়পুর সংলগ্ন হারু মল্লিকের বনকাটা 'মৌজা' তাঁর জমিদারি আধিপত্যের সাক্ষ্য বহন করে। তিনি মাটির ঘরেই বাস করতেন এবং নূতনগ্রাম চৌকিতে উপরিস্থ কর্তৃপক্ষকে খাজনা আদায় দিতেন।

প্রায় দু'শ বছর আগে তালডাংরা থানার পাঁচমুড়া গ্রামের তন্তুবায় বর্ণজাতিভুক্ত গৌরমোহন দত্ত বাঁকুড়া শহরে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি প্রভূত ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন। তাঁর পুত্র কৃষ্ণকান্ত ছিলেন জমিজমার উৎপন্নভোগী। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র সারদাপ্রসাদ দত্ত ছিলেন বি.এ. পাশ ও সাব-জজ এবং মধ্যম পুত্র অন্নদাপ্রসাদ দত্ত লেখাপড়া শিখে রাঁচিতে সরকারি চাকুরি করতেন। তাছাড়া বাঁকুড়া শহরের রাণীগঞ্জের মোড়ে এ পরিবারের বৃহৎ বস্ত্রব্যবসাও ছিল। এভাবে চাষাবাদের আয় এবং চাকুরি ও ব্যবসার সূত্রে অর্জিত অর্থে সারদাপ্রসাদ দত্ত (১৮৭০-১৯৬১) অসংখ্য মৌজা ক্রয় করে এক বিশাল জমিদারি এস্টেট গড়ে তোলেন। এ জমিদারি এস্টেটের মূল সেরেস্তা অবস্থিত ছিল বাঁকুড়া শহরে। শানাবাঁধ গ্রামের ভূপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সেরেস্তদার।

সারদাপ্রসাদ বিবাহসূত্রে শুনুকপাহাড়ীতে প্রচুর জমিজমার মালিক হয়েছিলেন। পরে শুনুকপাহাড়ী, আঁধারথোল, বরুট, পুরুণ্ডি, ফেঙ্গাবাসা, ডুমরিয়া ইত্যাদি মৌজা ক্রয় করে সেগুলির দেখভালের জন্য শুনুকপাহাড়ীতে সেরেস্তার একটি শাখা স্থাপন করেন। বসতবাটী ও দুর্গামণ্ডপ নির্মাণ করে তিনি ১৯৩৩ সালে দুর্গাপূজা আনয়ন করেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র সপরিবারে এখানে বসবাস করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সারদাপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রনাথও এখানে সপরিবারে বসবাস করেছেন। ফলে এ পরিবারটি শুনুকপাহাড়ীর দত্ত পরিবাররূপে একটি অতিরিক্ত পরিচয় অর্জন করে।[১৪] এখন শুনুকপাহাড়ীতে দত্তদের বসবাস না থাকলেও দুর্গাপূজা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, শুনুকপাহাড়ীতে সেরেস্তার শাখাকেন্দ্রের অধীন মৌজাসমূহের সাজা খাজনা - আদায়ের বিষয়টির তদারকি করতেন পুরুণ্ডি গ্রামের ননীগোপাল মজুমদার। দত্তবাবুদের জমিদারিতে নিযুক্ত লগদিরা ছিল বেতনভুক পশ্চিমা (হিন্দুস্থানী)।

শুনুকপাহাড়ীর সঙ্গে দত্ত পরিবারের সম্পর্ক স্থায়ী হয়ে আছে সারদাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র আইনজীবি হরেন্দ্রনাথের পরিকল্পনা মাফিক ১৯৬৮ সালে গরু-মোষ-ছাগল-ভেড়া কেনাবেচার জন্য শুনুকপাহাড়ীর হাট পত্তনের সূত্রে। যে স্থানে হাট বসে তার আয়তন দশ বিঘার কিছু কম। আগে স্থানটি ছিল একটি মহুয়া বন, জমির মালিকানাস্বত্ব দত্ত পরিবারের হলেও পরিচালনা ক্ষমতা ও দায়িত্ব নূতনগ্রাম ও ভিকুরডিহির কয়েকটি মুসলমান পরিবারের উপর ন্যস্ত। পরিচালনার যাবতীয় ব্যয় বাদ দিয়ে প্রকৃত উদ্বৃত্ত বা লভ্যাংশের টাকা প্রতি ন আনা পরিচালকদের প্রাপ্য ও সাত আনা দত্ত পরিবারের প্রাপ্য। সপ্তাহের প্রতি সোমবার হাট বসে।

আঁধারথোল অঞ্চলের অন্তর্গত কালাবতী গ্রামের তাম্বুলি বর্ণীয় চৌধুরী পরিবার[১৪ক] প্রায় আড়াই'শ বছরের পুরনো। এ পরিবারের আদি পুরুষ পাহাড় শুশুনিয়া বা ঝাটিপাহাড়ীর নিকটবর্তী বেসড়া গ্রাম থেকে উঠে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শুশুনিয়া ও বেসড়া গ্রামের চৌধুরী পরিবার দুটির সঙ্গে এক সময়ে এ পরিবারটি 'ভায়াৎ' সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

আদি পুরুষের নাম জানা যায় না। তাঁর দ্বিতীয় অধঃস্তন পুরুষ পরমানন্দ চৌধুরী অন্যান্য সহোদরদের সহযোগিতায় ছিলেন পরিবারের ভাগ্যোন্নতির রূপকার। চাষাবাদ ও তেজারতির সুবাদে অর্থসঞ্চয় করে তিনি ছাত্না জমিদারির বর্তমান ছাত্না ব্লক-১ এর অন্তর্গত কালাবতী ও কেন্দবনা ও ছাত্না ব্লকের বাদরডিহি মৌজার ইজারা স্বত্ত্ব এবং বিষ্ণুপুর পরগণার ওন্দা থানার অন্তর্গত ঘোলপুর মৌজার পত্তনি ক্রয় করেছিলেন। জমিজমার উৎপন্নভোগ, মহাজনী কারবার ও সাজা-খাজনা আদায়ের মাধ্যমে প্রচুর বিত্তবৈভবের মালিক হয়ে কালাবতীতে তিনি প্রায় তিন বিঘা জমির

উপর খিলনাযুক্ত প্রবেশপথসহ দ্বিতল প্রাসাদোপম পাকা তট্টালিকা নির্মাণ করেন। সমৃদ্ধির যুগে এ পরিবারের খাসচাষ ছিল ২০০০ বিঘা; আর ১৭টি পুকুরের মালিকানা।

পরমানন্দের পুত্র হৃদয়নাথ ও পৌত্র গোবিন্দলাল, ভ্রাতুষ্পুত্র সূর্যনারায়ণ ও তাঁর পুত্র বরদাপ্রসাদ এবং অপর এক ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষেত্রনাথ ও তাঁর পুত্র কেশবচন্দ্র ছিলেন চাষাবাদ ও সাজা-খাজনার উপর নির্ভরশীল। ১৯৩০-এর দশকে গোবিন্দলালের চার পুত্র রামলাল, আশুতোষ, বিনোদবিহারী ও মহাদেবপ্রসাদ এবং কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র রামপদ ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। বরদাপ্রসাদের বংশধরগণ চাষাবাদ অবলম্বন করে গ্রামেই থেকে যান।

রামপদ চৌধুরী বাঁকুড়া শহরের দ্বিতীয় ফিডার রোডে চৌধুরী রাইস মিল নামে ধানকল স্থাপন করেন। তাঁর ধানকল চত্বরেই ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রামপদ ছিলেন বাঁকুড়া জেলার বিপ্লবী অনুশীলন দলের নেতা প্রফুল্ল কুণ্ডুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অনুশীলন দলের প্রতি গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন।[১৪খ]

গোবিন্দলালের পুত্রগণ ১৯৩০-এর দশকে কেঞ্জেকুড়ায় সেখানকার সৃষ্টিপদ মণ্ডলের সঙ্গে যৌথভাবে পিতল-কাসার বাসনপত্রের ব্যবসা শুরু করেন। তখন বিহারে পিতল-কাসার কাচামালের উপর কঠোর বিধিনিষেধ ছিল না। তাই কেঞ্জেকুড়া তৎকালীন বিহারের মানভূম (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া) জেলার সমীপবর্তী হওয়ায় এখান থেকে সস্তাদরে পিতলকাসার কাঁচামাল সংগ্রহ করার সুবিধা ছিল। এজন্য কেঞ্জেকুড়া পিতলকাসার জিনিসপত্রের উৎপাদন ও বিক্রির খুব লাভজনক ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হয়।

কেঞ্জেকুড়ায় ব্যবসারত থাকাকালীন চৌধুরী ভ্রাতাদের আট আনা ও সৃষ্টিপদ মণ্ডলের আট আনা অংশীদারিত্বে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ দামোদর রাজলক্ষ্মী নামে বাঁকুড়া-কেঞ্জেকুড়া বাস সার্ভিস চালু হয়েছিল। আর মহাদেবপ্রসাদ চৌধুরী নিজ অর্থে ঘোলগড্যা মৌজার ইজারা স্বত্ত্ব ক্রয় করেছিলেন। সাজা-খাজনা আদায়ের জন্য তাঁর গোমস্তার কাজ করতেন ডালমারি গ্রামের রবিলোচন পাল। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে চৌধুরী ভ্রাতাগণ কেঞ্জেকুড়ায় বাসনের কারবার পরিত্যাগ করে হাটমশলা-গোলদারী পণ্যের পাইকারী ব্যবসা খোলেন বাঁকুড়া শহরে।

চৌধুরী পরিবার পরিণত হয় মূলতঃ একটি ব্যবসায়ী পরিবারে। তাই উচ্চ শিক্ষার দিকে এ পরিবারের কোন আগ্রহ ছিল না। এ পরিবারের প্রথম গ্র্যাজুয়েট হলেন সুনীল চৌধুরী। তিনি বি.এ. পাশ করেন ১৯৬৮ সালে; কিন্তু পেশায় ব্যবসায়ী।

কালাবতীর চৌধুরীদের কোন কুলদেবতা ছিল না। গ্রামের বাসলীপুকুর পাড়ে অবস্থিত প্রাচীন বাসলী মন্দিরে পূজা দিতেন। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে রামলাল চৌধুরী (১৩০১-৮১ বঙ্গাব্দ) স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কালাবতীতে শারদীয়া দ্বীপান্বিতা তিথিতে অষ্টভূজা মহাসরস্বতী পূজা প্রবর্তন করেন। মহাসরস্বতী পূজার অঙ্গ হিসাবে পরের দিন অর্থাৎ প্রতিপদ তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় কুমারীপূজা। মহাধুমধামের সঙ্গে এখনো পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় অঞ্চলপ্রসিদ্ধ মহাসরস্বতী পূজা। বর্তমানে চৌধুরী পরিবারের শরিকানগণ এ পূজার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করেন। এ পরিবারের আরেকটি কীর্তি হলো গোবিন্দলালের মৃত্যুর পর তাঁর চার পুত্রের বিধবা মাতার 'অন্নমেরুতুলাদান' অনুষ্ঠান সম্পাদন করে কালাবতী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ব্রাহ্মণদের প্রচুর পরিমাণ চাল ও বাসনপত্র এবং সে সঙ্গে সোনারূপা দান।

নূতন যুগের ভোরে ঃ

বিশ শতকের প্রথমার্ধ ছিল বাঁকুড়া ব্লক-১ এর পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নানা কারণে এলাকা সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনপ্রভাতের আলোর সন্ধান পায়। প্রথমতঃ শিক্ষাহীনতার অমারাত্রির অবসান খুলে দেয় উত্তরণের পথ। বাঁকুড়া জেলা বোর্ডের নথি থেকে জানা যায়, ১৮৯৪-৯৫ সালে সদর থানায় অবস্থিত ৬টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে একটির অবস্থান ছিল আগয়ায়। আর ১৫টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে চারটির অবস্থিতি ছিল কেঞ্জেকুড়া, মৌলবনা, হেলনা-শুশুনিয়া ও শানাবাঁধে। আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে এ জনপদের সামাজিক বিকাশ যে নূতন বাঁক নিয়েছিল তাঁর পরিচয় মেলে পরবর্তী শতাব্দীর প্রথম পাদে শিক্ষার আকাশে দুই জ্যোতিষ্কের প্রোজ্জ্বল আবির্ভাবের মধ্যে।

একজন ছিলেন হেলনা-শুশুনিয়া গ্রামের রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, আরেকজন শানবাঁধ গ্রামের যদুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। রামগতি ছিলন অত্যন্ত মেধাবী ও কৃতী ছাত্র। বৃত্তিসহ বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ১৯২৫ সালে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি. পাশ করে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে দূরবিস্তৃত অঞ্চল খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। যদুপতিও ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র। তিনি ১৯১৯ সালে বাঁকুড়া জেলা স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন। উচ্চশিক্ষা লাভ করে তিনি সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। জগদল্লা গ্রামের কালীকৃষ্ণ চৌধুরি ও গোবিন্দপ্রসাদ চৌধুরির আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের কথা আগেই বলা হয়েছে। কেঞ্জেকুড়া গ্রামের রামানুজ কর (১৮৯১-১৯৩৯) প্রথম বিভাগে এফ.এ. পাশ করে সাংবাদিকতা করেছেন ও 'বাঁকুড়া জেলার বিবরণ' গ্রন্থ রচনা করে বাঁকুড়ার জেলার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে গঠনমূলক চিন্তাভাবনার পরিচয় রেখেছেন। ব্যক্তিগতভাবে নৈষ্ঠিক গান্ধাবাদী ও খাদি পরিধানের উগ্রসমর্থক রামানুজ ইউনিয়ন বোর্ড রাজনীতি করেছেন। যদুপতি মুখোপাধ্যায় নামে শানবাঁধা গ্রামের একজন গ্র্যাজুয়েট বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ পশ্চিমপ্রান্তে নূতন আর্থ-সামাজিক-ধর্মিয় ভাবাদর্শ পরিবর্তনের স্রোতে জুগিয়েছিল নূতন প্রাণশক্তি। নূতন জীবনবোধ হাজির হয়েছিল প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়ে। মনোহরপুরে (মধ্যযুগের বরাবাথানে) ১৯২৭ সালে স্বামী যোগজীবনানন্দ প্রতিষ্ঠা করেন সত্যায়তন মহামন্দির। তিনি সামাজিক বর্ণবৈষম্য স্বীকার করতেন না। আশ্রমের দোলপূর্ণিমা উৎসবের সময় অনুষ্ঠিত হোমযজ্ঞে তিনি বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলকে আহুতি প্রদানের অধিকার দিয়েছিলেন। এর ফলে স্থানীয়ভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও তিনি দমেন নি। আশ্রম প্রাঙ্গণে চাষাবাদে ও শাকসবজি উৎপাদনে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। দেশিয় বস্ত্রের উন্নয়নকল্পে তিনি আশ্রম চত্বরে বহু তাঁত বসিয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি ছাত্রাবাসসহ একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এ বিদ্যালয় থেকে ১৯৪০ সালে আঁধারথোল গ্রামের ডাঃ বিজয় কুমার মণ্ডল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। স্বামী যোগজীবনানন্দ ১৯৪১ সালে 'ক্ষেত্রপাল আন্দোলন' নামে একটি আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল বাউরি সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ-নীচ বোধাভিত্তিক শ্রেণীভেদের অবসান, সাঙ্গা প্রথার বিলোপ, মদ্যপান বর্জন ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সামাজিক উন্নতি বিধান। এ আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত স্তিমিত হয়ে পড়ে।[১৫] যাহোক, ১৯৪৪ সালে বাংলার গভর্নর লর্ড কেসি বাঁকুড়া জেলা সফরকালে মনোহরপুর সত্যায়তন আশ্রমের জনসেবামূলক কাজকর্ম পরিদর্শনে এখানে এসেছিলেন।

১৯৪৩ সালে হরেরডি (বর্তমান মধুবন) এলাকার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের উদ্দেশ্যে এসে হাজির হয়েছিলেন সমাজসেবী ব্যবসায়ী মোহনলাল গোয়েঙ্কা। স্থানটি তাঁর ভাল লেগেছিল। অতএব তাঁর কর্তৃত্বাধীন গোয়েঙ্কা ট্রাস্টের তহবিল থেকে জমি, বাগান, পুকুর, ঘরবাড়ি তৈরির জন্য নিদয়া-পাপুরডিহি-তাঁতকানালি মৌজায় ক্রয় করেন কয়েক একর জমি। এভাবে বহির্বিশ্বের সংগে যোগাযোগ স্থাপিত হলে এ এলাকার আরণ্য বিচ্ছিন্নতা কেটে যায় এবং মোহনলাল গোয়েঙ্কার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পরিণতি ছিল ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট 'মধুবন গোয়েঙ্কা' বিদ্যালয় নামে পরিচিত উচ্চ বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। অরণ্য বলয়ে দেখা দেয় শিক্ষালোকের উদ্ভাসনা।

তৃতীয়তঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের আবেদন ও জাতীয় চেতনার প্রসার এ জনপদকে দিয়েছে এক নূতন দিশার অভিমুখ। চট্টগ্রাম জেলা থেকে আগত অনুশীলন দলের সদস্য যোগেশচন্দ্র দে ১৯২৩ সালে বাঁকুড়া সম্মিলনি মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হয়ে এখানে ছাত্র থাকাকালীন অনুশীলন দলের একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে রাজগ্রামে বিবেকানন্দ পাঠাগার স্থাপন করেন। তিনি রাজগ্রামের প্রফুল্ল কুণ্ডুসহ সর্বেশ্বর ভট্টাচার্য ও জয়কৃষ্ণ দাসকে নিয়ে একটি গোষ্ঠী গঠনে সফল হয়ে দেশে ফিরে যান। এভাবে রাজগ্রাম থেকে এ জেলায় সর্বপ্রথম বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার সূচনা ঘটে। এ বৈপ্লবিক তৎপরতার সঙ্গে পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছিলেন কুমিদ্যা গ্রামের যামিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে গঙ্গাজলঘাটির বড়শাল গ্রামে পুলিশ একটি বেআইনি অস্ত্রতৈরি কারখানার সন্ধান পায়। এ ঘটনার তল্লাসিসূত্রে বাঁকুড়া থানার কুমিদ্যা গ্রামের যামিনীকান্ত পুলিশের হাতে

ধরা পড়েন। তাঁকে বি.সি.এল. আইনে নজরবন্দী করে রাখা হয়।[১৬] শোনা যায়, কেঞ্জেকুড়ার সারদা প্রসাদ কর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বাঁকুড়া জেলায় জাতীয় আন্দোলন সবচেয়ে জোরদার আকারে দেখা দিয়েছিল ১৯৩১ সালের লবন সত্যাগ্রহের সময়। এ সময়ে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন এ এলাকার বেশ কয়েকজন দেশকর্মী। যেমন জগদল্লা গ্রামের হরিপদ মিশ্র, বেলিয়া গ্রামের পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল, মেট্যাকলার কিঙ্কর পণ্ডিত, শুকপাহাড়ীর মিহির কুমার দত্ত ছিলেন নির্যাতিত দেশকর্মী। স্বাধীনোত্তরকালে ভারত সরকার তাঁদের তাম্রপত্র দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বভারতীয় ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসু ২৭শে ও ২৮শে এপ্রিল বাঁকুড়া জেলায় ব্যাপকভাবে সফর করে কয়েকটি জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। ২৭শে এপ্রিল কেঞ্জেকুড়াতেও একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কেঞ্জেকুড়া যাওয়ার পথে সুভাষচন্দ্র মনোহরপুরের সত্যায়তন আশ্রমের স্বামী যোগজীবনানন্দজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সে সময়ে এ অঞ্চলে সক্রিয় জাতীয়তাবাদী কর্মি ছিলেন মনোহরপুরের ভূষণচন্দ্র পাৎসা, কেঞ্জেকুড়ায় ঈশানচন্দ্র কর, মহাদেব তন্তুবায় প্রমুখ। কেঞ্জেকুড়ায় সুভাষচন্দ্রের জনসভা সংগঠিত করার ব্যাপারে সারদাপ্রসাদ করের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। জনসভায় জনসমাবেশ ঘটাবার জন্য প্রচারকার্যে বিভিন্ন গ্রামে মুদ্রিত পোষ্টার ব্যবহার করা হয়েছিল।

১৯৪১ সালের ৩১শে জানুয়ারি ও ১লা ফেব্রুয়ারি বাংলার বিশিষ্ট হিন্দু মহাসভা নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাঁকুড়া জেলা সফরকালে ৩১শে জানুয়ারি রাজগ্রামে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, তখন রাজগ্রাম বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পায়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষ ডঃ মুখার্জির প্রস্তাবমত বিদ্যালয়টির নাম 'রাজগ্রাম বিবেকানন্দ হিন্দু উচ্চবিদ্যালয়, রাখতে সম্মত হলে তাঁর চেষ্টায় বিদ্যালয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' বা আগষ্ট আন্দোলন এ জেলায় সুসংগঠিত শক্তিশালী আকার নেয়নি। কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ও নাশকতামূলক কাজ ঘটেছিল মাত্র। নাশকতামূলক কাজ হিসাবে গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৪২ সালের ৬ই অক্টোবর মনোহরপুরে অবস্থিত কেঞ্জেকুড়া ইউনিয়ন বোর্ড কার্যালয়গৃহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। শোনা যায়, ঘাটতোড় গ্রামের একটি পচাই দোকানেও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল।

আগষ্ট আন্দোলনের পর কংগ্রেস পরিচালিত জাতীয় আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়লে হিন্দু মহাসভা শক্তি সঞ্চয় করে। ফলে কেঞ্জেকুড়া হিন্দু মহাসভার একটি শক্তিশালী ঘাটিতে পরিণত হয়। এখানকার হিন্দু মহাসভার শাখা সমিতির প্রথম সভাপতি রামচন্দ্র বটব্যাল (পেশায় মোক্তার), প্রথম সম্পাদক রামরতন কর, গ্রামের বাসিন্দা সতীশচন্দ্র চন্দ্র, অরুণচন্দ্র কর্মকার, সুধীর কর্মকার, লক্ষ্মীকান্ত কর, মৌলবনা নিবাসী নকুলচন্দ্র শর্মা, মনোহরপুর নিবাসী দুর্গাদাস পাৎসা ও রঘুনাথ পাৎসা হিন্দু মহাসভাকে একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করেন।[১৭] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নূতনগ্রামে ও বাদুলাড়াতে এ সময়ে মুসলিম লীগের সংগঠনও গড়ে উঠেছিল।

মন্তব্যঃ

বাঁকুড়া ব্লক-১ জনপদে মানুষের বসবাসের সূচনা ঘটেছে পুরনো প্রস্তর যুগে। এ সুদীর্ঘ প্রাচীনত্ব সত্ত্বেও ইতিহাস-সংস্কৃতির বিচারে এ জনপদ কোন গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারেনি। এমনকি, সামাজিক বিকাশও ছিল ছবিরতাগ্রস্ত। প্রকৃতপক্ষে, এ জনপদের জীবনপ্রভাত ঘেটেছে বিশ শতকের প্রথমার্ধে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আমূল ভূমিসংস্কার ও ব্যাপক শিক্ষা প্রসারের চাপে সামন্ততান্ত্রিক অতীত দ্রুত অপমৃয়মান। তাহলেও কালপাথরের বাগপরিবারের সরস্বতী পূজা, শুনুকপাহাড়ীর দত্ত পরিবারের দুর্গাপূজা ও কালাবতীর চৌধুরী পরিবারের মহাসরস্বতী পূজার ধুমধাম ধরে রেখেছে অতীতের কিছু পরিচয়।

সূত্রনির্দেশিকা ঃ

১। Bankura District Gazetteer : Ed. A. K. Bandyopadhyay, 1968, P. 56

২। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ঃ বিনয় ঘোষ, পুস্তক প্রকাশক, কলকাতা-১২
প্রথম প্রকাশ, সাধারণতন্ত্র দিবস, জানুয়ারী ১৯৫৭, পৃঃ ৬৫৭

৩। তদেব, পৃঃ ৬৫৮

৪। Bankura District Gazetteer : L.S.S. O'Malley, 1908, P. 104

৫। সূত্র ঃ শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ছাত্না।

৬। Bankura District Gazetteer : O'Malley, 1908, P. 22

৭। বাঁকুড়াজনের ইতিহাস-সংস্কৃতি ঃ রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, ২০০২, পৃঃ ৬৭-৬৮

৮। বাঁকুড়া শহরের গোড়ার কথা ঃ শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমরাঢ় গবেষণা সাময়িকী ঃ সম্পাদক গৌতম দে, চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৭, পৃঃ ১৮-১৯

৯। তদেব, পৃঃ ১৯

১০। বাঁকুড়া জেলায় সতীদাহ ঃ শ্যামসুন্দর শুকুল, প্রত্নপরিক্রমা ঃ মল্লভূম (২), সম্পাদনা জলধর হালদার। পৃঃ ২২২

১১। চৌধুরী পরিবার সম্পর্কে তথ্যসূত্র ঃ শ্রীকল্যাণ চৌধুরী, জগদল্লা

১২। বাগ পরিবার সম্পর্কে তথ্যসূত্র ঃ শ্রীকালীপদ বাগ, বাঁকুড়া

১৩। হারুমল্লিক সম্পর্কে তথ্যসূত্র ঃ গোরাজল মল্লিক, নূতনগ্রাম।

১৪। দত্ত পরিবার সম্পর্কে তথ্যসূত্র ঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত ও মধুসূদন দত্ত, বাঁকুড়া

১৪ক। কলাবতীর চৌধুরী পরিবার সম্পর্কে তথ্যসূত্র ঃ শ্রীবংশীধর চৌধুরী, শ্রীভাগবত চৌধুরী ও শ্রী সুনীল চৌধুরী

১৪খ। চলার পথে ঃ বীরেশ্বর ঘোষ, বাঁকুড়া, আশ্বিন ১৩৮৯, পৃঃ ৩৭

১৫। বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি ঃ রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, পৃঃ ৪১১-১২

১৬। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস (১৯২৩-১৯৪৭) ঃ সুব্রত রায় ঃ পৃঃ ২০

১৭। বাঁকুড়া জিলা হিন্দু মহাসভার ইতিবৃত্ত ঃ রাখহরি চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৮

ব্যক্তিঋণ ঃ শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ছাত্না

প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের আলোকে
বাঁকুড়া ১ ব্লক এলাকা

চন্দন শুকুল

ভূমিকা

প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের আলোকে বাঁকুড়া ১নং ব্লক এলাকার বিষয়ে আলোচনায় হারিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া অতীতের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে যে কথা প্রথমেই বলে নেওয়া আবশ্যক তা হল বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের উপাদানগুলি যা এতাবধি পাওয়া গিয়েছে তার নৃতাত্ত্বিক, ভূতাত্ত্বিক, প্রত্ন আবহবিজ্ঞান ইত্যাদি পারম্পর্য বা যোগসূত্র রক্ষাকারী অপরাপর উপাদানের সামগ্রিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যখ্যা ও আলোচনা একসূত্রে গ্রথিত হলে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়া সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত সংগৃহীত পুরাবস্তু, বিভিন্ন সময়ের পুরাতাত্ত্বিকদের অভিমত, বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জী, ক্ষেত্রগবেষকদের মতামত, ইত্যাদির ভিত্তিতে আলোচনা করা সম্ভব। এই এলাকার ভূবৈশিষ্ট্য, দ্বারকেশ্বর নদের গতিপথ এর অতীত রূপ, এর তীরবর্তী এলাকায় ক্রমান্বয় অব্যাহত জীবনধারা, আদি হতে মধ্য, নব্যপ্রস্তরযুগ-লৌহ-তাম্রযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগের প্রান্তসীমা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক-সামাজিক তথা ধর্মীয় প্রভাবের মধ্য দিয়ে প্রসারিত তার নিদর্শন ও উপাদান অর্থাৎ আদি মানবের ব্যবহৃত পাথরের অস্ত্রশস্ত্র, পাথরের নিদর্শন, ভগ্ন মৃৎকৌলাল, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবাশ্ম, লৌহ নিষ্কাশনের নিদর্শন, মন্দির, মসজিদ ও ধর্মীয় প্রভাবের উল্লেখ সহ আলোকপাত করা যায়।

ভূতাত্ত্বিক বিন্যাস

ভূতাত্ত্বিকদের বিচারে এই এলাকার সংগঠন শুশুনিয়া পাহাড় সংলগ্ন এলাকার দূর অতীত গন্ডোয়ানা পর্বের সঙ্গে বিজড়িত। বাঁকুড়া ১নং ব্লক এলাকা হতে উত্তর-পূর্বে মাইল পনের দূরে আনন্দপুর গ্রামের কাছে গন্ডোয়ানা শিলার প্রাপ্তি সেই দিকেই ইঙ্গিত দেয়। গাছপালা ও জীবজন্তু যখন ছিল না সেই পৃথিবীর আদিকাল আর্কিয়ান যুগের নাইস (Gneiss) এই এলাকা সহ বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমপ্রান্তে দেখা গেছে। সুদূর অতীতে এই এলাকা সমুদ্রের অগভীর উপকূলভাগ ছিল বলে ভূবিজ্ঞানীদের অনুমান যা ক্রমশ মহাদেশীয় বিচলনের ফলে ও প্লিস্টোসীন মহাপর্বে (বিগত ১০ হাজার হতে ৬ লক্ষ বছর) হিমবাহ সম্প্রসারণ ও তটরেখার উন্নীতকরণের ফলে এলাকার সামগ্রিক গঠন হয়েছে। এরই সাথে প্লিস্টৌসীন যুগে বিভিন্ন সময়ে সুদীর্ঘ বৎসর গড় অতিবৃষ্টি এবং পরে দীর্ঘ অনাবৃষ্টি ও শুষ্ক আবহাওয়ার ইঙ্গিত দেয় দ্বারকেশ্বর নদের নদীগর্ভ সংলগ্ন মৃত্তিকা ও বালুকা চরিত্র। নদীটির তীরবর্তী এই ব্লক এলাকায় এ সময়কালীন ল্যাটেরাইটের বিস্তৃতি সহ গ্রানাইট, কোয়ার্টাজাইট অস্তিত্ব-এর তরঙ্গায়িত ভূমিরূপে লক্ষ্য করা গেছে। দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী মৌজাগুলিতে লক্ষ্য করা যায় অ্যালুভিয়াম এর উপস্থিতি। এর মধ্যে ক্লে, শিল্ট, স্যান্ড এবং গ্রাভেল এছাড়া মাইকা-সিস্ট ফিলাইট যুক্ত অপরাপর উচ্চ ভূমিগুলিতেও লক্ষ্যনীয়। মৃত্তিকা জেলার অপরাপর স্থান হতে আলাদা করা যায় না একেবারে উপরে তৃণমূলের সঙ্গে মাটি। এর নীচে চুন বালির মিশ্রন প্রায় দেড় মিটার গভীর ও তৃতীয় স্তরে ফেরাজেনাস কনেরেশন এবং চতুর্থ পঞ্চম স্তরে শক্ত মাটির সাথে গ্রাভেল এবং বোল্ডার দেখা যায়। এর নীচে

ল্যাটেরাইটের মোটা স্তরের নীচে বেডরক সাধারণত লক্ষ্য করা যায়। দ্বারকেশ্বর এর তীরে বোরুটের কাছেও বড় গ্রানিট পাথরের চাঁই নদীগাত্রের আশে পাশে লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য বিগত ত্রিশ বছরে চাষাবাদ ও বাসস্থান গঠনের নিবিড় প্রসারে ভূত্বকের ক্ষয়াটে টিলার মত অংশ ও নদী সন্নিকটস্থ ভূমিরূপ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। যার ফলে বর্ষায় সৃষ্ট স্বাভাবিক খাদ, ফল্ট এবং উপরিভাগে ছড়িয়ে থাকা এই এলাকার প্রত্নক্ষেত্রগুলি প্রায় বিলোপ হয়ে গিয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠের পশ্চিম হতে ক্রমশ পূর্ব; ইষৎ দক্ষিণের ঢাল এই ব্লকের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

দ্বারকেশ্বর নদী

দামোদর নদের পরই এই জেলার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নদী দ্বারকেশ্বর বাঁকুড়া ১নং ব্লক এলাকার মধ্যখান দিয়ে বয়ে চলেছে। পুরুলিয়া জেলার হুড়া থানার নিকট হতে বাঁকুড়া জেলায় প্রথমে ছাত্না ব্লক তারপর কেঞ্জাকুড়ার রামনগর J.L. No. 93, মৌজার নিকট বাঁকুড়া ১নং ব্লকে প্রবেশ করেছে। এর নাম দ্বারকেশ্বর বিশ্লেষন করলে আমরা পাই 'দ্বারকা'র প্রভূ অর্থাৎ কৃষ্ণ। এর পুরাতন নাম ধলকিশোর বা ঢলকিশোর। ভূতাত্বিক বিচারে এই নদী প্লিস্টোসীন যুগের মালভূমির উচ্চ টিলার ঢাল হতে সৃষ্টি হয়ে fault তৈরী হয়েছে ঐ সময়ের দীর্ঘ অবিরাম অতি বারিপাতের ফলে। নদী বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুরূপে এই দ্বারকেশ্বর নদ প্লিস্টোসীন যুগের সুদীর্ঘকাল অতি বৃষ্টিপাতের ফলে টিলার ঢাল হতে সৃষ্ট হয়ে ক্ষয়িষ্ণু পাহাড় বা তরঙ্গায়িত ভূমিরূপের উপর দিয়ে অগ্রসর হয়ে পশ্চিম হতে ক্রমশ দক্ষিণ পূর্বের দিকে অগ্রসর হয়েছে। ফলতঃ ঐ সময় নদী ছিল বর্তমানের চেয়েও অনেকাংশে চওড়া হলোসিন যুগের সূচনালগ্ন পর্যন্ত। নদীর দক্ষিণ তীর হতে বেশ কিছু দূরের মৌজাগুলিতে যেমন চিকচিকা J.L. No. 141 আদি প্রস্তরায়ুধগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। হলোসিন যুগ (বিগত ১০০০০ বছর) সূচনা লগ্ন হতে বিগত আনুমানিক ৩০০০ বছর পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ক্রমান্বয় বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা এবং খরার ফলে নদীগর্ভের Paleo-clay layer বিনষ্ট হয় এবং নদীর উপরিভাগের জলধারণ ক্ষমতা হারিয়ে যায়। বিগত ৩০০০ বছর হতে অদ্যাবধি মোটামুটি একটা গড় বৃষ্টিপাত চললেও এই জন্যেই আমরা দ্বারকেশ্বরকে দেখি বর্ষায় প্রায় জলপূর্ণ এবং অন্যান্য সময় জলশূন্য। ১৮৩৮ সালের হরচন্দ্র ঘোষের রিপোর্টেও অনুরূপ চিত্রই দেখতে পাওয়া যায়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত ভবিষ্য পুরানে রাঢ়ীখন্ড বর্ণনায় দ্বারকেশ্বর নদের উল্লেখ করতে গিয়ে 'এ রাঢ়ীখন্ড জাঙ্গলং' দেশ 'দারিকেশী যাদুত্তরে য দ্বাষ্ট যোজনামতঃ' অর্থাৎ দ্বারকেশ্বর নদের উত্তরবর্তী এই ভূখণ্ড ষোড়শ যোজন বিস্তৃত। এখানে দ্বারকেশ্বর নদকে দারিকেশী নামে উল্লেখ করতে দেখা যায়। ঐ সময় সমগ্র বাঁকুড়া জেলার অনুরূপে বাঁকুড়া ১নং ব্লক এলাকা সহ দ্বারকেশ্বর তীরভূমি নিবিড় অরন্যানি ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এই সামগ্রিক এলাকা অর্থাৎ দামোদর নদ হতে দ্বারকেশ্বর এর উত্তর তীর অবধি অঞ্চল ছিল পুষ্করন রাজ্যের অধীন ছিল বলে গবেষকগণ মনে করেন। এরপর দীর্ঘ সময় কোন রাষ্ট্রীয় বিকাশের ছত্রছায়ায় এই এলাকা থাকার কোন প্রমান অদ্যাবধি না মেলায় আবার দ্বাদশ শতাব্দীতে কোটাটবী রাজত্বের আওতাভুক্ত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে কৃষ্ণকায় অরন্যচারী গোষ্ঠীসমূহের নৃপতিদের নেতৃত্বে যে ভূম রাজ্যগুলি গড়ে উঠেছিল তারমধ্যে এই ব্লক এলাকা যেহেতু বাঁকুড়া থানার পশ্চিমাংশ এবং ছাত্না থানার পার্শ্ববর্তী তাই ব্লক এলাকার পশ্চিমাংশ সামন্তভূমের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সম্ভবতঃ পূর্ব অংশ মল্লভূমের আওতাভুক্ত ছিল অনুমান করা যায়। এই এলাকা অর্থাৎ দ্বারকেশ্বর তীরবর্তী স্থানসমূহ প্রস্তরযুগীয় স্মৃতি বহনকারী অস্ট্রিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ছিল যার প্রমান মৌলবনার বীরস্তম্ভ এবং ক্রমান্বয়ে শৈবকেন্দ্র রূপে তার আত্মপ্রকাশ এই নদের তীরবর্তী অন্যান্য ব্লকের অপরাপর প্রসিদ্ধ শৈবকেন্দ্র এক্তেশ্বর, বহুলাড়া, ডিহর, পাঁচাল এর অনুরূপ ছিল বলে অভিমত রয়েছে।

প্রস্তরায়ুধ ও প্রত্নবস্তু

১৮৬৭ সালের ভ্যালেন্টাইল বলের গোপীনাথপুরের প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কার শুধুমাত্র বাঁকুড়া জেলা নয় সমগ্র বঙ্গদেশে প্রত্নচর্চার ও সংগ্রহের নবদিগন্ত সূচীত করেছিল। তবে প্রাসঙ্গিক হল এই ব্লক এলাকায় ১৯৫৯ সালে প্রখ্যাত

প্রত্নতত্ত্ববিদ ভি.ডি. কৃষ্ণস্বামীর প্রত্নস্থল ও প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কারই এই জেলায় তত্ত্বগতভাবে বিজ্ঞানসম্মত প্রত্নচর্চার সূচনা করে। আদি প্রত্নাশ্মীয় কালের একটি চমৎকার একমুখী চপার এই ব্লক এলাকার দ্বারকেশ্বর তীরে জগদল্লা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপরশোল J.L. No. 178 আবিষ্কার করেন এখানের প্রত্নক্ষেত্রে এরূপ অন্যান্য প্রস্তরায়ুধ থেকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন বলে জানা যায়। ১৯৫৯-৬০ সালের ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কার এর জেলাব্যাপী যে প্রচেষ্টা ভি.ডি. কৃষ্ণস্বামীর পরিচালনায় সংঘটিত হয়েছিল তাকে ভৌগলিক ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি হল কংসাবতী কুমারী নদী উপত্যকা এবং অন্যটি দ্বারকেশ্বর নদী উপত্যকা যার মধ্যে অনেকগুলি প্রত্নক্ষেত্র ঃ ধলডাঙ্গা J.L. No. 194, দামোদরপুর J.L. No.184, মাঞ্জুরা J.L. No. 187, কৃষ্ণনগর J.L. No. 182, চিকচিকা J.L. No. 141 এই ব্লক এলাকার প্রত্নক্ষেত্র বলে স্বীকৃত ছিল। অপর একজন প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ধরণী সেন ও অন্যান্যরা ঐ উপরশোল মৌজা হতেই দুটি আদি প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কার করেছিলেন। আন্দারথোল গ্রাম পঞ্চায়েতের চিকচিকা গ্রামের J.L. No. 141 একটি ফাঁকা তরঙ্গায়িত প্রান্তরে আবিষ্কার হয়েছিল দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম
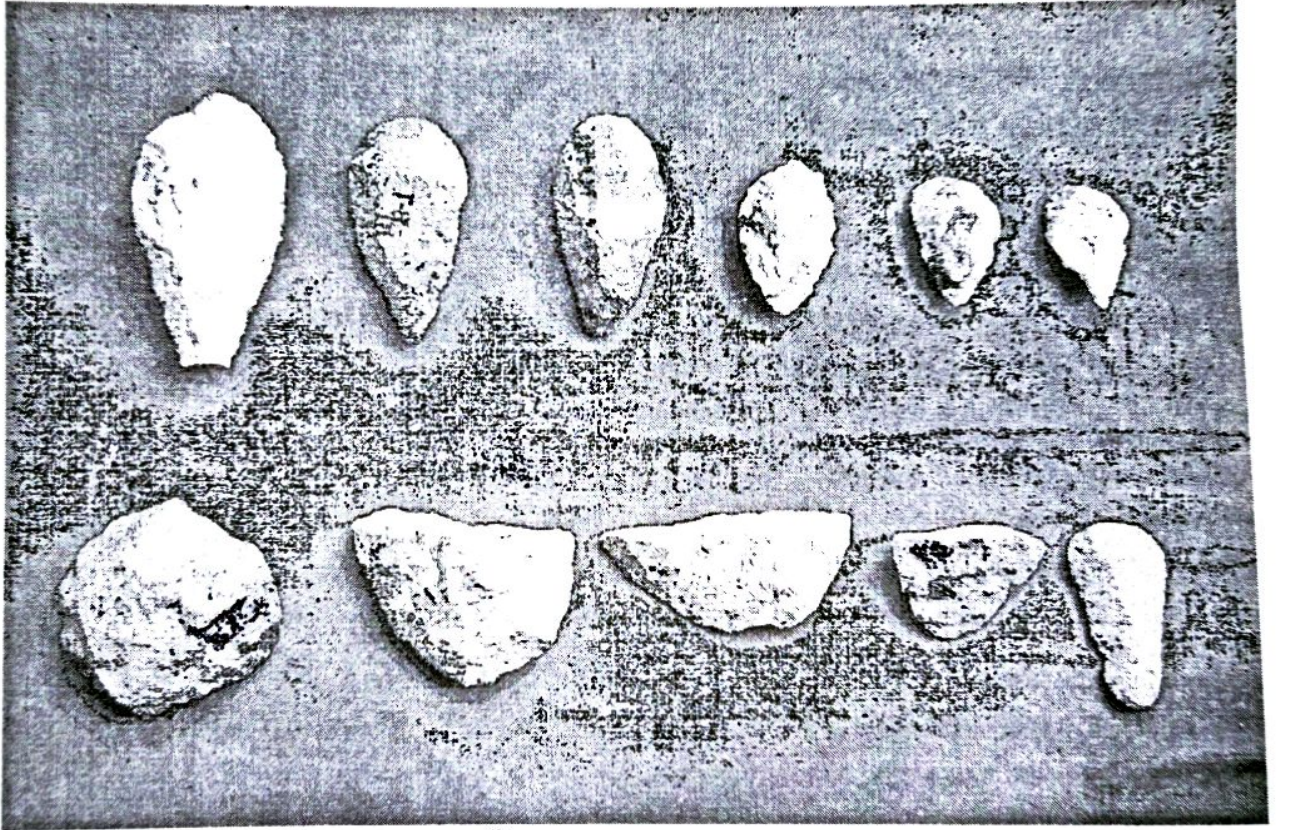
বাঁকুড়া ১ ব্লকে সংগৃহিত প্রস্তরায়ুধ সংগ্রহ ঃ শ্যামসুন্দর শুকুল

একটি কোয়ার্টাজাইটের তৈরী হাতকুঠার যা ডেট্রাইটাল ল্যাটেরাইট স্তর হতে সংগৃহীত। হাতিয়ার তৈরীর পদ্ধতি ও টাইপের দিক থেকে দামোদরপুরে প্রাপ্ত প্রস্তরায়ুধ আদি অ্যাশিউলিয় সংস্কৃতির এবং মাঞ্জুরা মৌজায় প্রাপ্ত প্রস্তরায়ুধ আবিভিলি ও অ্যাশিউলিয় প্রকৃতির ছিল বলে গবেষকগণ অভিমত দিয়েছেন। এর পরবর্তী সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ পরিচালিত অভিযানের ফলে এই নদী উপত্যকায় প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির চিহ্ন অনেকটা সুসম্বন্ধ আকারে আত্মপ্রকাশ করলেও পুরাশ্মীয় কালানুক্রম সম্বন্ধে নির্ভুলভাবে সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। সত্তর এবং আশির দশকে বিভিন্ন সময়ে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় অধুনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর অধ্যাপক ডঃ রূপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বাঁকুড়ার পুরাক্ষেত্র গবেষক শ্যামসুন্দর শুকুল উপরোক্ত প্রত্নস্থল সহ আরও যেসব নতুন প্রত্নক্ষেত্র পর্যবেক্ষন করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জগদল্লা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশী J.L. No. 191, আড়ালবাঁশী J.L. No. 190 ছাড়াও

মোলবনা J.L. No. 94, বোরুট J.L. No. 219 প্রভৃতি স্থান হতে শুধুমাত্র অ্যাশিউলিয় প্রকৃতির হাত কুঠার পাওয়া গেছে তাই নয়, মুস্টেরীয় কৃতি সহ সাথে সাথে অ্যালুভিয়াম স্তর হতে রিং স্টোন ও ১ ইঞ্চির কিছু মাইক্রোলিথ পাওয়া গেছে। মাজুরা, আড়ালবাঁশী উপরশোল হতে মূল নুড়িখন্ড হতে সৃষ্ট ডিম্বাকৃতি হাতিয়ার, সুক্ষ্মাগ্র হাতকুঠার, পত্রাকৃতি হাতকুঠার (Hand axe), ছেদক লেভালয়সীয় দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম ডিসকাস্, রিংস্টোন গোলাকৃতি ক্ষেপনাস্ত্র প্রয়াত শ্রী শুকুলের সংগ্রহে রয়েছে। ১৯৮০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ব বিভাগীয় প্রধান ডঃ সুধীরঞ্জন দাস এ সকল প্রত্নবস্তু ও প্রত্নস্থলগুলি পর্যবেক্ষন করেন এবং এর গঠন, টেকনিক ব্যাখ্যা করেন। আশির দশকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ববিদ ডঃ দিব্যেন্দু কান্তি ভট্টাচার্য্য সমরূপ গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। এই এলাকায় দামোদরপুর মৌজায় লম্বায় ১ ফুট ও চওড়ায় ৮ ইঞ্চি বিশিষ্ট একটি জীবাশ্ম কোন তৃণভোজী প্রাণীর মস্তিষ্ক বলে অনেকে অনুমান করেন এছাড়া ঐ এলাকা হতে প্রাপ্ত হাড়ের টুকরা কোন প্রাণীর মেরুদন্ডের কশেরুকার হাড় বলে অনুমান করা যায়। এই জীবাশ্ম দুটি ১৯৭৮ সালের বন্যার পরবর্তী সময়ে শ্রী শুকুল সংগ্রহ করেছিলেন যদিও এদের আনুমানিক প্রাচীনত্ব বিষয়ে এখনো নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় না। দ্বারকেশ্বর নদ্যতট সহ এই ব্লক এলাকার উপলাস্তীর্ণ ভূভাগ হতে যে সব প্রস্তরায়ুধ পাওয়া গিয়েছে তার শৈলী এবং ধার, শিল্পনৈপুন্য সৌন্দর্য্য ভারতসহ বিশ্বের অন্যত্র প্রাপ্ত প্রস্তরায়ুধের সমমানের। আবিভিলিও, আশিউলিয়, মুস্টেরীয়, লেভালয়সীয় সংস্কৃতির প্রস্তরায়ুধ যেমন দেখা গেছে তেমনি পাভলভীয় সংস্কৃতিতুল্য ক্ষুদ্র প্রস্তরায়ুধ মাইক্রোলিথ পাওয়া গেছে। এছাড়াও কৃষি সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ ছিদ্রযুক্ত গোল পালিশ করা পাথরের নিদর্শনও এই সামগ্রিক এলাকার নব্যপ্রস্তরযুগের কৃষ্টির প্রমান রাখে। আদি প্রত্নাশ্মীয় কালের যেসব আয়ুধ পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই কোয়ার্টজ পাথরের তবে সামগ্রিকভাবে এগুলিকে অস্থায়ী প্রত্নস্থল বলেই গবেষকরা অনুমান করেন। কিছুকিছু প্রস্তরায়ুধের অবনমিত গাত্রে লালচে কমলা রংয়ের ল্যাটেরাইটের প্যাটিনা (Patina) বা মরিচা ও ল্যাটেরাইটের সন্নিবেশযুক্ত প্রত্নক্ষেত্র এর প্রাচীনত্বের বিষয়ে স্বাক্ষ্য দেয়। দীর্ঘ সময় ভূপৃষ্ঠে পড়ে থাকায় ল্যাটেরাইটের সাথে বৃষ্টির, জলের সংস্পর্শে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ঐরূপ প্যাটিনা তৈরী হয়। মাঞ্জুরা মৌজা ও চিকচিকায় মূল নুড়িখণ্ড আঘাত করে ধার বিশিষ্টকরণের নমুনা যেমন দেখা যায় তেমনি মূল নুড়িগাত্রের অংশ যুক্ত শল্ক ছাড়ানোর প্রক্রিয়াজাত হাতকুঠার অ্যাশিউলির নমুনা এমনকি মুস্টেরীয় কৃতির যে নমুনা পাওয়া যায় তার শল্কচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় সুতীক্ষ্ণকরণ এবং দ্বিপার্শ্বীয় রিজ তৈরী করে স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা যুক্ত নমুনা লক্ষ্যনীয়। এই ধরণের নমুনা আধুনিক তলোয়ার ছোরার রিজ প্রস্তুতের অনুরূপ অনুমান করা হয়। মূল নুড়িখণ্ড হতে শুল্কচ্ছেদ করে গোলাকার বানিয়ে ডিসকাস আকৃতির হাতিয়ার নমুনা ক্ষেপনাস্ত্র প্রস্তুত প্রনালীর স্বাক্ষ্য বহন করে কারণ ডিসকাস নিক্ষেপ করে শিকার ও আত্মরক্ষা উভয়েই সম্ভব ছিল। প্রস্তরযুগের পর্যায় অনুযায়ী বিভেদ করলে নিম্ন পুরাপ্রস্তরের Hand axe বা হাত কুঠারের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী, এছাড়া পাওয়া যায় খাঁজযুক্ত চাঁচনি, ছেদক বা Cleaver জাতীয় আয়ুধ। মধ্যপ্রস্তর যুগে কাটার Chopper, গোলাকৃতি, অর্ধচন্দ্রাকৃতি আয়ুধ, ক্ষুদ্র বাটালি, ছিদ্র করার হাতিয়ার ইত্যাদি। মধ্যাশ্মীয় যুগের পর নবাশ্মীয় যুগে গোলাকার ছিদ্রযুক্ত প্রস্তর নিদর্শন, Ring stone, কুঠার, বাটালি, শিলনোড়া ইত্যাদি।

প্রস্তরের উপাদান অনুযায়ী বিভাজনে নিম্ন পুরাপ্রস্তরের নমুনায় দেখা যায় মূলত কোয়ার্টজ ও ব্যাসল্ট পাথরের। পরবর্তী পর্যায়ে সহজে চিলকা নিখুঁতভাবে ছাড়ানো যায় এরূপ সুক্ষ্মদানাযুক্ত চার্ট ও কোয়ার্টজ, মাইক্রোলিথের ক্ষেত্রে ক্রিস্টাল জাতীয় পাথর লক্ষ্যনীয়। প্রস্তরের গঠন ও আয়তন লক্ষ্য করলে দেখা যায় হাত কুঠারগুলি অধিকাংশ লম্বায় ১৪ থেকে ২০ সেমি, চওড়ায় ৭.৫ সেমি হতে ৯.৫ সেমির মধ্যে। উপরের স্থূলতম অংশের প্রস্থচ্ছেদ ৩.৫ সেমি হতে ৪.৫ সেমির মধ্যে। হাতের পাঞ্জার মাপ ঐ অনুযায়ী বিশ্লেষন করে ৭২ বর্গসেমির কাছাকাছি অর্থাৎ গড়ে ৫ হতে ৬ ফুট উচ্চতার আদিম মানবের অনুমান করা যায়। ১৯৬৬ সালের প্রখ্যাত প্রত্নতাত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তর রিপোর্টের উল্লিখিত শুশুনিয়া পাহাড় গন্ধেশ্বরী নদীতটের ১ লক্ষ বছরের প্রাচীন মানবসংস্কৃতি হোমোসেপিয়েন্স গোষ্ঠীর (মস্তিষ্ক ধারণ ক্ষমতা ১৩৫০ ঘনসেমি) অনুরূপ ছিল অনেকে অনুমান করেছেন।

দ্বারকেশ্বর নদ্যতট সংলগ্ন এই বাঁকুড়া ১ নং ব্লক এলাকায় কিছু মৌজা এলাকা যেমন আড়ালবাঁশী ও মাঞ্জুরা

বাঁকুড়া ১ ব্লকে সংগৃহিত নব্যপ্রস্তর যুগের নিদর্শন সংগ্রহ ঃ শ্যামসুন্দর শুকুল

মৌজা থেকে যেমন আদি প্রস্তরযুগের সংস্কৃতির আয়ুধ পাওয়া গিয়েছে তেমনি মধ্যপ্রস্তরের নিদর্শন যুক্ত হাতিয়ার মিলেছে। আবার একেবারে নদ্যতট সংলগ্ন স্থানে নবাশ্মীয় যুগের রিংস্টোন, মাইক্রোলিথ সংগৃহীত হয়েছে ভিন্ন সংস্কৃতির নিদর্শন একই স্থান হতে সংগৃহিত হওয়ায় অনুমান প্লিস্টোসীন-এর আদি প্রস্তরায়ুধ কাল হতে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে আদি মানবের ক্রমান্বয় নিরবচ্ছিন্ন বাসভূমি এই এলাকা হলোসীনের কৃষিকার্য, পশুচারণের দিগন্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এখান থেকে প্রাপ্ত ১১ সেমি ব্যাসযুক্ত ২ সেমি চওড়া রিংযুক্ত রিংস্টোন কৃষি সভ্যতার নিদর্শন বলে ধরা হয়। প্রায় ২ সেমি ব্যাসযুক্ত কাষ্ঠদণ্ডের উপরে পরপর থাকে থাকে পরিয়ে সুক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠদণ্ডকে ভারযুক্ত করে ভূমিকর্ষনে সহায়ক হত বলে অনুমান করা হয়। এলাহাবাদের চোপানীমানডোতে যেমন খননকার্যে প্রাপ্ত বীজ পোতার, ছুচলো খুঁটিতে লাগানোর মত ছিদ্রযুক্ত পাথর, রিংস্টোন বুনো ধানের সঙ্গে একত্রে পাওয়া গিয়েছিল তেমন আড়ালবাঁশীতে না পাওয়া গেলেও অনুরূপ সংস্কৃতির নবাশ্মীয় যুগে আদি মানব উপনীত হয়েছিল অনুমান করা যায়। হলোসীন যুগে (প্রায় ১০হাজার বছর) জলবায়ুর একটা মৌলিক তারতম্য এসেছিল। এই যুগটাতে বৃষ্টিপাত কমে আসায় নদীতীরবর্তী সমতল ভূমির আয়তন বেড়ে যায় আবার নদী অনেকটা সংকুচিত হয়ে আসে। যার ফল হিসাবে গোচারন, পশুচারন ভূমির সৃষ্টি হয়। ফলতঃ মানুষের সামগ্রিক জীবনচর্চার প্রগতি ও রূপান্তর দেখা দিতে থাকে। বৃহৎ প্রাণী শিকার কেন্দ্রিক খাদ্য সংগ্রহ তথা হাতিয়ার নির্মান পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। নদীর ক্ষীন স্রোত ধরে মানবের জলজ প্রাণী মৎস শিকার ইত্যাদির পাশাপাশি পশুপালন, কৃষির বিকাশ-এর সূচনা ঘটতে থাকে। দ্বারকেশ্বর নদীর একেবারে ধার ঘেঁষে আড়ালবাসী, মৌলবনা প্রভৃতি স্থান হতে মাইক্রোলিথ ভাঙ্গা মৃৎকৌলাল সংগৃহীত হয়েছিল বলে জানা যায়। নদীর একেবারে নিকটস্থ এই স্থানগুলি হতে স্থূল রিংস্টোন যা কৃষি সভ্যতার নিদর্শন এবং কৃশ আকৃতির পালিশযুক্ত ছোট রিংস্টোন যা সুতা কাটার তকলি বলে অনেকের অনুমান তা সংগৃহীত হওয়ায় বস্ত্র বয়ন কৃৎকৌশলের ইঙ্গিত দেয়। আবার মৌলবনা গ্রামে J.L. No. 94, অ্যাশিউলিয় হাতকুঠার যেমন পাওয়া গেছে তেমনি এই এলাকায় মেগলিথ বা বীরস্তম্ভের সন্ধান পাওয়া যায়। ভূম রাজ্যেত্রয় তুঙ্গভূম, ধবলভূম ও সামন্তভূমের মূল নাড়ীর যোগ আদি

নিষাদ স্তর পর্যন্ত প্রোথিত ছিল ইতিহাসকারগণ অভিমত দেন। এই সামগ্রিক এলাকার সাথে বাঁকুড়া ১নং ব্লক এলাকা অভিন্ন ছিল এই দিক থেকে কেনা অষ্ট্রিক জাতি বৈশিষ্ট্যের বীর যোদ্ধাদের স্মৃতিফলক যুক্ত এই বীরস্তম্ভদ্বয় সেই দিকেই ইঙ্গিত দেয়। এই বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডগুলিকে মেগালিথ, মেনহির, বীরস্তম্ভ, বীরকাঁড় ইত্যাদি নানা নামে বিভিন্ন গবেষকগণ অভিহিত করেন। Mega অর্থ বৃহৎ Lith অর্থাৎ প্রস্তর। দ্বারকেশ্বর উত্তর তীরবর্তী গ্রামপঞ্চায়েতের মোলবনা গ্রামে যে দুটি বৃহৎ প্রস্তর আছে একটি ভগ্ন। দুটি স্তম্ভেই ধনুর্বানধারী যোদ্ধামূর্তি ও শীর্ষদেশে সিংহমূর্তি খোদিত। ছাত্‌নার কামারকুলি, ইন্দপুরের বাজোড়া, গঙ্গাজলঘাটির থুমকোড়ো, ইত্যাদি বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম অংশে এরূপ বৃহৎ প্রস্তর লক্ষ্য করা যায়। মোলবনার বীরস্তম্ভের সাথে শুশুনিয়া ও ছাত্‌নার সিংহমূর্তির সাদৃশ্য মানভূমের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে একসময়ে সিংহ টোটেম বিশ্বাসী নিষাদ সংস্কৃতির আভাষ দেয়। শুধুমাত্র স্মারক হিসাবেই নয় নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে এগুলিকে বংশধ্বজ বা ফুলকেতু বলা যায় যাতে কূলের আদি পুরুষকে স্মরণ করা হয়। কোন কোন পণ্ডিত আদিম জাতিদের মধ্যে এর সাথে লিঙ্গ পুজার সাযুজ্য খুঁজে পান যা আবার তথাকথিত আর্য হিন্দু সংস্কৃতি ভিন্ন বলে মত দেন। ইউরোপ সহ মিশর, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার পলিনেশিয়া সহ ইষ্টার দ্বীপের এবং ভারতে বিশেষত দক্ষিণ ভারতে এর নিদর্শন লক্ষ্যনীয়। নন্দীগ্রাম ও উজানী জোড় এলাকায় প্রস্তরাকীর্ণ ল্যাটেরাইটের প্রান্তরে লৌহ গলানোর প্রাচীন অস্তিত্ব ক্ষেত্র পর্যবেক্ষকগণের নজরে এসেছিল। crusible iron এর ল্যাটেরাইট হতে লৌহ প্রস্তুত প্রণালীর নিদর্শন স্বরূপ ধাতুমলের অস্তিত্ব এবং মূল ধাতুর অবশেষ, স্পঞ্জ আয়রণ এর নিদর্শন এই এলাকায় পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে ব্রিটিশ যুগে বা মাত্র দুইশত বছর আগেও এর প্রচলন লক্ষ্য করা গিয়েছিল তাই এর কালানুক্রম বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। দক্ষিণ ভারতে লোহার ব্যবহারের সাথে মেগালিথ প্রথা জড়িত ছিল প্রমান পাওয়া যায়। যোদ্ধাদের মূর্তিগুলির হাতে ধনুক, তীর, ঢাল, তরবারি ইত্যাদির দেখা মেলায় যোদ্ধাদের স্মৃতিস্মারক হিসাবে অনুমিত হয়। বাঁকুড়া শহরের ভৈরবস্থানের ঢাল তরবারি হাতে খোদিত যোদ্ধমূর্তির মেগালিথ শোনা যায় দ্বারকেশ্বর তীরের কোন স্থান হতে সংগৃহীত। লৌহ ব্যবহার এর স্তর এভাবেই এই এলাকায় একটি ধারাবাহিক নব্যপ্রস্তর পরবর্তী সোপান শ্রেণী হিসাবে কেউ কেউ অভিমত পোষন করেন। বর্তমানকালের বাঁকুড়া সাওতাল-খেরিয়া-খয়রা-মাল-বাউরী-বাগদি-হাড়ি-ডোম-কুর্মি-কোরা-ভূমিজ ইত্যাদি আদি অস্ত্রাল দ্রাবিড়ীয় উপজাতি সংমিশ্রনে অর্ধ উপজাতীয়, শবর-নিষাদ কৌম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশ ছিল। সুদূর আফ্রিকা হতে আদি মানবের মহানিষ্ক্রমন এবং উপকূল ভাগ ধরে লক্ষ হাজার বছরের ক্রমান্বয় অগ্রগতি ভারতসহ ব্রহ্মদেশ, যাভা সুমাত্রা ইন্দোনেশিয়া হয়ে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত এর বিস্তৃতির জেনেটিক প্রমান সাপেক্ষে গবেষনা অস্ত্রাল-দ্রাবিড়ীয় জনগোষ্ঠীর বিচরণের ইঙ্গিত উসকে দিয়েছে। অনেক পণ্ডিত আদিম জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রচলিত মেনহির বা বীরস্তম্ভ প্রথার সাথে লিঙ্গ পূজার যোগসূত্র খুজে পান যা মোলবনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। জেলার এবং এই বাঁকুড়া ১নং ব্লক এলাকার ধর্মীয় চেতনায় শিবের আধিপত্য সুস্পষ্ট। দ্বারকেশ্বর তীর বিধৌত ভূমিতে অপরাপর স্থানগুলিতেও প্রসিদ্ধ শৈবকেন্দ্রগুলির অবস্থিতি স্পষ্ট বোঝা যায়।

মোলবনার শিবমন্দির - গাজন

বাঁকুড়া শহর হতে ২০ কিমি দূরে আরো ২০ কিমি কেঞ্জাকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কেঞ্জাকুড়াগামী সড়কের কেঞ্জাকুড়া মোড় হতে ১ কিমি পূর্বদিকে পড়ে মৌলবনা গ্রাম J.L. No. 94। এই গ্রামে মৌলেশ্বর শিবের মন্দির অবস্থিত। চারফুট উঁচু পা ভাগের পর প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু মূল মন্দির। বারো ফুট লম্বা ও এগার ফুট প্রস্থের জঙ্ঘাযুক্ত প্রতি কোণে পাঁচটি করে রথপথ বিমানের নিচে কার্নিশে শেষ হয়েছে। এর চূড়ায় ত্রিশূল দেখা যায়। জনশ্রুতি তিনশত বছরের পুরাতন ছোট আকারের একটি মূল মন্দির এর সংস্কৃত রূপ বর্তমান উচ্চ মন্দিরটি। যাট্‌ বৎসর পূর্বে জনৈক গ্রামবাসী 'রতন' এর প্রতিষ্ঠাতা বলে জানা যায়। এই মন্দির মধ্যে মৌলেশ্বর শিবলিঙ্গ দেখা যায়। মৌলেশ্বর মন্দিরে প্রাপ্ত উড়িয়া ভাষা রচিত 'দেবডাক' ' দিক ডাক' পুঁথি থেকে জানা যায় উড়িষ্যার কোন স্থান হতে বা তীর্থকেন্দ্র হতে 'ওড়দ' ও 'মোড়দং' নামক রায় উপাধির দুজন ব্যক্তি স্বীয় ক্ষমতাবলে ছাত্‌না এলাকায় প্রভুত্ব বিস্তার করে তারাই মৌলেশ্বর সন্ধান পেয়ে সংস্কার করে পূজা ও গাজনের ব্যবস্থা চালু করে। মৌলেশ্বরে সেবাপূজার ব্যবস্থা আছে এবং

চৈত্র সংক্রান্তির সময় সাতদিন ব্যাপী উৎসব সহ গাজনের ব্যবস্থা করেন। গাজন মূলত অনার্য সংস্কৃতি জাত তবে হিন্দু মূলধারায় তা একীভূত পরবর্তী রূপান্তরের ধারায় এসেছে। শোনা যায় মোলবনায় গাজন দেখতে এসে ছাত্নার ব্রাহ্মণ রাজা ঝারাইৎ সাঁওতালদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। এছাড়া আঁচুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের জামরাডিহি, বৌলাড়া, উরিয়ামা (কেঞ্জাকুড়া) কেরানীপুরে শিবের গাজন প্রচলিত আছে। জামরাডিহির রায়, বৌলাড়ায় নাপিতরা ও উরিয়ামায় ব্রাহ্মণরা এর পরিচালনা করেন। সভ্যতা বিকাশের আদি সময় থেকে বাঁকুড়া অঞ্চলের ধারাবাহিক ইতিহাস যথাযথ প্রমান সাপেক্ষে ধরা পড়ে না। জৈন ধর্ম সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থ আচারাঙ্গ সুত্ত খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বেই রচিত হয়েছিল। ঐ বিবরণ অনুযায়ী আড়াই হাজার বছর আগে আর্য সভ্যতার অভিগমন আদি অষ্ট্রিক দ্রাবীড়ীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রতিহত হয়েছিল। যদিও জৈন ধর্মপ্রচারকদের নিরবচ্ছিন্ন প্রচারের ফলে মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী অভিমত পোষন করেন। এই এলাকার মোলবনা সহ আদিনাথ, পার্শ্বনাথ এর প্রস্তর মূর্তিগুলি এরূপ স্বাক্ষ্য দেয়। পালযুগে, পাল রাজবংশ আনুষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধধর্ম অনুসারী ছিলেন এবং খ্রীষ্টিয় চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দী থেকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেশব্যাপী পুনরুত্থান জৈনধর্মের অবনতি সূচীত করে। পরবর্তী সেন রাজবংশের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরক্তি বঙ্গজুড়ে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার ঘটায় তার ফলে রাঢ়ী, কান্যকুব্জ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য গোষ্ঠী রাঢ় এলাকায় নানাস্থানে কেন্দ্র বিস্তার করে, যার মধ্যে দ্বারকেশ্বর নদীতট সংলগ্ন এই এলাকাও বিষ্ণু (বাসুদেব) পূজার প্রচলনের ইঙ্গিত দেয় যা চৈতন্য পরবর্তী সময়ে বাসুদেব ভক্তির প্রাচীনধারা রাধাকৃষ্ণের লীলামৃত উপাসনায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। যে ঘটনা এই দিক পরিবর্তনের সবচেয়ে বেশী এই জেলা তথা এলাকায় সহায়ক হয়ে ওঠে তা হল ষোড়শ শতকের শেষ প্রান্তে প্রবলপ্রতাপ বিষ্ণুপুর মল্লরাজ বীর হাম্বীরের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা ও মল্লরাজবৃত্তের পৃষ্ঠপোষকতায় পরবর্তী সময়েও আরো নানা রাধাকৃষ্ণের মন্দির। একথা স্বীকার্য্য শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বাসুদেবের দুরস্বর্গলোকবাসী ধারণার নির্বাসন তথা শ্রদ্ধার নিগড় বৃত্তের বাইরে এনে রাধার প্রেমলীলায় বাঁশী হাতে মাধবের ধারণায় সাধারণ বাঙ্গালীর লৌকিক হৃদয়মন্দিরে ছড়িয়ে দেবার কৃতিত্ব শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির প্লাবন। নানাস্থানে রাধামাধবের মন্দির পরবর্তীকালে এরই স্থাপত্য রূপ। এই বাঁকুড়া ১নং ব্লক এলাকায় জগদল্লায় এরূপ একটি রাধামাধব মন্দির দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মে কৃষ্ণের লীলামূর্তির পরিচায়ক পর্বের মধ্যে জন্মবৃত্তান্ত, কংস ও পূতনা বধ, কালীয় নাগ দমনের বৃত্তান্ত, রাসমণ্ডল প্রভৃতিগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। জগদল্লায় কালীয় দমন উৎসব পালন এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এই এলাকার কুমিদ্যার রাসমঞ্চ ও রাসউৎসব জনপ্রিয় লৌকিক ধর্ম প্রভাবের নিদর্শন বলা যায়।

রাধামাধবের মন্দির, জগদল্লা

বাঁকুড়া হতে খাতড়াগামী সড়কের বামপার্শ্বে ব্রাহ্মণ প্রধান একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম জগদল্লা J.L. No. 196। গ্রামের মধ্যে লম্বায় ১৫ ফুট ও চওড়ায় ১০ ফুটের আয়তাকৃতি আসনের উপর পঁচিশ ফুট উঁচু পূর্বমুখী একটি রাধামাধবের মন্দির আছে যেটি একটি পঞ্চরত্ন মন্দির। আসন চত্বরের উপর দুটি সাড়স্তম্ভ ও দুটি অর্ধস্তম্ভের উপর মেঝে চত্বর। মেঝে চত্বরের ছাদ খিলান। তারপর দশ ফুট ও পাঁচ ফুট দৈর্ঘ্য প্রস্থের বিগ্রহ মন্দির। ছাদের কিছু অংশ বৃত্তাকার, অর্ধবৃত্তাকার ও বর্গাকার হয়ে আবার বৃত্তাকারে শীর্ষ বিন্দুতে স্থির। সম্মুখের দেয়ালে অর্ধবৃত্তাকার কার্নিশ, কুলুঙ্গি আছে। দ্বারের উপরে লতানে নক্সা রয়েছে। চারকোণে চারটি মধ্যখানে মূল চূড়া স্থাপিত। দ্বার ও কার্নিশ সজ্জিত চারটি পাঁচ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট চূড়া রয়েছে। শীর্ষে আমলক কলসের উপর চক্রপক্ষীযুক্ত লৌহদণ্ড প্রোথিত রয়েছে। মধ্যের মূলচূড়া দশফুট উচ্চতার অন্য চারটি চূড়ার অনুরূপ। মন্দিরের ভিতরে কাঠের সিংহাসনের উপর রাধামাধবের বিগ্রহ রয়েছে। রাধামাধবের মূর্তি দুটি খুবই সুন্দর। মাধব অর্থাৎ 'কৃষ্ণ' কালো রং-এর এবং রাধা সোনালী বর্ণের। এই গ্রামের চৌধুরী পরিবারগুলি বারশ বঙ্গাব্দের তৃতীয় শতক পর্যন্ত দ্বারকেশ্বরের একেবারে দক্ষিণ তীরে পাতাকলা গ্রামের বাসিন্দা ছিল বারশ ত্রিশের এক প্রচণ্ড বন্যায় পাতাকলা গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেলে তারা আরো উঁচুতে জগদল্লায় বসতি স্থাপন করেন। এর আগে নাম ছিল মাধবপুর। চৌধুরী বংশের জয়দেব চৌধুরী এর প্রতিষ্ঠাতা

প্রচলিত জনশ্রুতি যে তিনি জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট হতে এই মূর্তি লাভ করেন এবং ঐ একই সময়ে কেন্দুলিতে কবি জয়দেব প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবের বিগ্রহ মূর্তি যা ঐ সময়ে উপহৃত হয়েছিল তার সাথে গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। এই মন্দিরে নিত্যসেবা পূজার বন্দোবস্ত আছে যে সকল বৈষ্ণবীয় উৎসব অনুষ্ঠান হয় তার মধ্যে সবচেয়ে ধুমধামের সাথে মাঘীপূর্ণিমার রাস অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়নাগ দমনের উৎসব পালিত হয়।

লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দির, বাঁশী

দ্বারকেশ্বরের দক্ষিণ তীরে বাঁশী গ্রামে J.L. No. 191, একটি মন্দির রয়েছে। পাল পরিবারের শ্রীনাথ পাল কর্তৃক একটি লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দির নির্মিত হয়েছিল কিন্তু ঐ মন্দির সাম্প্রতিক সময়ে ভগ্নদশাপ্রাপ্ত হলে এটির সংস্কার করা হয়। মন্দিরের বিমান অংশ ভেঙ্গে পড়ার পরে আধুনিক প্রযুক্তি অলংকরণে এটি সংস্কার করা হয়।

বৎসরের বিভিন্ন সময়ে যে সব পরব এই এলাকায় হয়ে থাকে তার কিছু উল্লেখ করা হল ঃ-

ক্রমিক নং	স্থান	পরব	সময়
১।	মোলবনা	শিবের গাজন মেলা	বৈশাখ মাস
২।	মোলবনা	নীলাম্বরের গাজন	২৫ শে জৈষ্ঠ্য
৩।	জগদল্লা	কালীয়দমন উৎসব	কৃষ্ণপক্ষ ত্রয়োদশী ভাদ্রমাস
৪।	কেঞ্জাকুড়া	সঞ্জীবনী মেলা	পৌষ সংক্রান্তি, ২রা মাঘ
৫।	কুমিদ্যা	রাসউৎসব	ফাল্গুন ৫ দিন
৬।	জগদল্লা	রাসউৎসব	
৭।	মোলবনা	মৌলেশ্বরের গাজন	চৈত্র সংক্রান্তি

এইভাবে আমরা দেখতে পাই শিব, কৃষ্ণ ইত্যাদিদের আরাধনা গাজন, রাসউৎসব নানা মেলা সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে স্বীয় সংস্কৃতির হিন্দু সাধারণ ধর্মে স্বাঙ্গীকরণ ঘটেছে। দুর্গা, কালী, সরস্বতী সহ বাংলার লৌকিক দেবদেবী টুসুভাদু ইত্যাদি মিলেমিশে গেছে সার্বিক ধর্মচেতনায়। আবার হিন্দু ব্যতীত অপরাপর ধর্মের পাশাপাশি সহাবস্থান ও জনসংখ্যার বিন্যাসে ধরা পড়ে। কিন্তু একথা বলা যায় ধর্মীয় চেতনা বা সংস্কৃতি সংঘাতের পথে না গিয়ে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সাম্প্রদায়িকতার বাইরের সহাবস্থান ও ঐক্যের মূল ভারতীয় চেতনায় আজকের বাঁকুড়া ১নং ব্লকের জনসমাজের চিত্র তুলে ধরেছে। হিন্দু স্থাপত্য, সংস্কৃতির পাশাপাশি মুসলীম সংস্কৃতি ও ধর্ম বিকশিত হয়েছে বাদুলাড়া এলাকায়।

বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের পূর্বে পাঁচ শতাব্দীকাল মল্লরাজতন্ত্র এই এলাকায় আধিপত্য বজায় রাখলেও পরবর্তী সময়েও মুসলমান শাসনেও তেমনভাবে এই এলাকায় তার তারতম্য ঘটেনি। মুসলমান শাসনের অবসানের পর বর্ধমান রাজকুলের মমতাবৃদ্ধিতে মল্লরাজত্বের পতন শুরু হয়েছিল এবং বর্গীর আক্রমন লুণ্ঠন এর পতন ত্বরান্বিত করেছিল মুসলমানদের এই জেলায় প্রবেশ ও বসবাস মুঘলযুগ হতেই ধীরে ধীরে শুরু হয়। নানান ব্যবসার সূত্র ধরে সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব হতে তাদের আগমন ঘটে। ঐ সময় বা তার পূর্ব হতে (যেমন সতেরশ শতাব্দীতে সিদ্ধ ফকিরের বিষ্ণুপুরে আগমন, কোরবান সাহেবের সমাধি) মুসলীম ধর্মগুরুদের, ফকিরদের এ অঞ্চলে পদার্পন ধর্মপ্রচার মুসলমান জনসংখ্যার সূচনা করেছিল। বাঁকুড়ার মাটিতে ধর্মান্তরিত করণের সরল ধর্মীয় প্রচার ঘটেছিল এবং নানা স্থানে মসজিদ গড়ে উঠেছিল। ইংরেজ আমলের নানা স্থানে এইরূপ মসজিদের একটি বাদুলাড়া J.L. No. 68 তে দেখা যায়।

জুম্বা মসজিদ ঃ বাদুলাড়া

বাঁকুড়া শহর হতে বাঁকুড়া পুরুলিয়া সড়কের শালবনী গ্রাম হতে দক্ষিণ দিকে গেলে আঁচুড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের বাদুলাড়া গ্রাম J.L. No. 68। মুসলমান প্রধান এই গ্রামে সর্দার পাড়ার মধ্যস্থলে বাদুলাড়ার একটি প্রাচীন মসজিদ অবস্থিত যার আনুমানিক বয়স দেড়শত বৎসরের অধিক। জুম্বা মসজিদ নামে পরিচিত এই মসজিদ ৪৪ ফুট দৈর্ঘ্য ও ২৪ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট নামাজ পাঠ করার চত্বর এবং উপরে সরল ছাদ। মুল মসজিদ কক্ষ কুড়িফুট লম্বা ও দশফুট প্রস্থ বিশিষ্ট এবং এর তিনটি দ্বার রয়েছে। নামাজ পাঠের জন্য ইমামের আসন ও খুতবা পাঠের জন্য নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। বাইরের গঠনে তিরিশ ফুট উঁচু এবং তিনটি গম্বুজ ও চারটি বড় মিনার বিশিষ্ট। আরো কয়েকটি ছোট মিনার আছে। সম্মুখে মুসলিমরীতি অনুসারী লতাপাতার নক্সা রয়েছে। ১২৭৯ বঙ্গাব্দের গ্রামে সকলের দেয় চাঁদায় কিয়ামুদ্দিন মিদ্যার নেতৃত্বে এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। প্রতি শুক্রবার, রোজার নামাজ, ইদলফেতর, ইদুজ্জোহার বিশেষ নামাজ পাঠ হয়। এই মসজিদ ছাড়াও বছর পঁচিশেক আগেকার একটি নতুন মসজিদ এই গ্রামে রয়েছে।

জেলার অপরাপর স্থানের ন্যায় বাঁকুড়া ১নং এলাকায় ইদ্ মহরম, সহ পীরের ঔরস মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বাদুলাড়ার মুসলীম মেলা

বাদুলাড়ার বড় পীরের মেলা ঃ- বাঁকুড়া ১নং ব্লকের আঁচুড়ী অঞ্চলের বাদুলাড়া গ্রামের কুলুরগ্রাম পাড়াতে ৮ই ও ৯ই ফাল্গুন এই মেলা বসে। ৮ই ফাল্গুন ধর্মীয় জলসা ও ৯ই ফাল্গুন কাওয়ালী অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, কলকাতা, হুগলীর নামকরা শিল্পীরা আমন্ত্রিত হন। ঐ সময় প্রায় দশ হাজার মানুষের জনসমাগম হয়। মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দুরাও এসব অনুষ্ঠানে আসেন।

জাকারিয়ার মেলা ঃ- বাদুলাড়ার সর্দার পাড়ায় জাকারিয়া বাবার মেলা হয় ২২শে ফাল্গুন। এখানে বাংলা কাওয়ালী হয় ও স্থানীয়, দূর হতে প্রায় সহস্রাধিক মানুষ এখানে আসেন।

আশরফির মেলা ঃ- বাদুলাড়ায় জিরাবাদ মৌজার ফাঁকা এলাকায় মাঠের মধ্যে কাশ্মীরী ফকির আশরফির মাজার। জনশ্রুতি ইনি দেড়শত বৎসর জীবিত ছিলেন। চৈত্র মাসের ৮ তারিখে এর মেলা বসে।

এইভাবে যেসব মুসলীম এলাকা আছে তার নানা ধর্ম ও মানুষের মিলনে সুন্দর সাম্প্রদায়িক ঐক্যের দৃষ্টান্ত এই এলাকায় গড়ে উঠেছে। এইভাবেই নানা ভাষা - নানা মত, বিবিধের মাঝে মিলন মহানের ভারতীয় সংস্কৃতি তথা ধর্মীয় প্রভাব হতে এক মিশ্র অথচ বৃহৎ মূল ধারায় লীন হওয়ার রূপ এই এলাকার সাধারণ চরিত্র পেয়েছে।

উপসংহার

পরিশেষে একথা বলা যায় এই বাঁকুড়া ১নং ব্লক এলাকা প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের দিক হতে জেলার অপরাপর এলাকা হতে স্বতন্ত্র না হলেও এর সুদীর্ঘকালের প্রত্ন উপাদান নিশ্চিতভাবেই সারা বঙ্গদেশে, পশ্চিমবঙ্গে একটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। দ্বিতীয়তঃ নির্ভরযোগ্য পুরাতত্ত, ইতিহাসের উপরাপর উপাদানের স্বল্পতা অনেক ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্তগুলিকে অনুমান নির্ভর করে তুলেছে। মুখ্য ও গৌণ প্রত্নস্থলের প্রকৃতি পর্যালোচনায় হাতিয়ার, প্রস্তরায়ুধ, প্রত্ন নিদর্শন এর সমাবেশ ও বিন্যাস অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্যের উপর এই এলাকায় আদি মানবের আবাসভুমি, হাতিয়ার নির্মান স্থল গমনাগমন, পশুচারন ও আদি কৃষিসভ্যতার সূচনা লগ্নে আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে এই এলাকার প্রত্নসাংস্কৃতিক ধারার প্রবহমানতা বা Continuity ছিল কিনা, রূপান্তর ঘটা বা আশে পাশের বাইরের সংস্কৃতি হাতিয়ার বানানোর শৈলী প্রভাবিত করেছিল কিনা এসব প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া যায় না। দক্ষিনদিকের পার্শ্ববর্তী ব্লক এলাকাগুলি হতেও আদি প্রস্তরযুগীয় হাতিয়ার সংগৃহীত হয়েছে এবং এইভাবে শিলাবতী, কংসাবতী - কুমারী নদীতীরবর্তী প্রত্নস্থল হতে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি হতে এই এলাকার প্রাপ্ত নিদর্শন, তথা সংস্কৃতির অনেক সাদৃশ্যই লক্ষ্য করা যায় ফলতঃ আদি মানবের গমনাগমনের তথা প্রসারনের ক্ষুদ্রতর সীমা বিভাজন করা যায় না। আবার বিভিন্ন সংস্কৃতির তুল্য নিদর্শনযুক্ত প্রস্তরায়ুধ পাওয়া গেলেও কোন নির্দিষ্ট কালানুক্রম এই কারনেই আন্দাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে জীবজন্তু তথা মানব অবশেষ

তার সাথে রেফারেন্স পাওয়া যায় নি। ক্রমান্বয়ে অব্যাহত বিকাশায়নের ধারায় পার্শ্ববর্তী ব্লকে পূর্বদিকে দ্বারকেশ্বর তীরবর্তী ডিহর হতে নানা প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার প্রবহমান মানব সভ্যতার অস্তিত্ব যা বাঁকুড়া ১নং ব্লক এলাকার যোগসূত্রকে ইঙ্গিত দেয়। পাশাপাশি এও ঠিক আদি প্রস্তর ; মধ্য, নব্যপ্রস্তর বা লৌহযুগ এরূপ নামকরণের প্রবণতা বিজ্ঞানসম্মত বলে অনেক গবেষকই মনে করেন না। আশির দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগীয় অধ্যক্ষ প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ সুধীররঞ্জন দাস প্রত্নবস্তুগুলিকে যথার্থ রায় দিলেও এর কালানুক্রম বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। পুরাতত্ত্ব চর্চায় শুধুমাত্র চোখে দেখে, সংগ্রহ করে, মাঠে প্রান্তরে খেটে হয় না আবশ্যিকভাবে বিজ্ঞান লাগে। নমুনা সংগ্রহ কৌতুহলোদ্দীপক ঠিকই কিন্তু যে অবস্থান হতে সংগৃহীত হচ্ছে তার সামগ্রিক তথ্য ও নমুনা সহ যাকে বলে Content এবং এর বিশ্লেষণ অর্থাৎ Morphological Analysis আবশ্যক কেননা এগুলিই বিজ্ঞানসম্মত হয়ে ওঠে। তৃতীয়তঃ বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী, পেশাদার দক্ষতার ব্যক্তিদের টীম তৈরী করে আঞ্চলিক স্তরে খননকার্য্য, ফটোগ্রাফি, সুসংবদ্ধ গবেষণা ও আলোচনার কার্যক্রম প্রোজেক্ট ওয়ার্ক এতাবধি বিশ্ববিদ্যালয় স্তর বা প্রত্নতত্ত্বের সরকারী উদ্যোগেই মূলত হয়েছে। যার ফলে সাধারণ স্থানীয় ক্ষেত্রগবেষক, উৎসুক ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষন সেখানে তেমনভাবে অন্তর্ভূক্ত হয় না। বস্তুত আধুনিক সময়ে যে লুপ্ত ইতিহাসের উদ্‌ঘাটনের জন্য বিকল্প ধারণার গুরুত্বের কথা বলা হয় তার মূল স্থানীয় ইতিহাস চর্চা, ক্ষেত্রানুসন্ধানী ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষনকে আরো বিজ্ঞানসম্মত করার প্রচেষ্টার জন্য গাইড করা। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ধরণের প্রচেষ্টা এখনো পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব রচনার মূল চাবিকাঠি সরকারী ও পেশাদার ব্যক্তিদের হাতেই, এখনো তার বিকেন্দ্রীকরণ, যা পশ্চিমী দুনিয়ায় এসেছে তা দেখা যায়নি। এই ধরণের অভিমত প্রখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. দিলীপ চক্রবর্তীর মতো আরো অনেকের। যদিও সরকারী ব্যক্তিবর্গের এই ব্লক ও জেলার পুরাবৃত্তে অবদান যেমন পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবকুমার চক্রবর্তী, গৌতম সেনগুপ্ত ইত্যাদি সহ অনেকের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এই ব্লক এলাকায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গবেষকগণের মধ্যে অনিলচন্দ্র পাল, অশোক ঘোষ, অশোক দত্ত , সুধীররঞ্জন দাস, রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, অবিনাশচন্দ্র দাস, রূপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতিদের অবদান স্মরণীয়। বাঁকুড়ার ইতিহাস পুরাতত্ত্ব ক্ষেত্র গবেষনায় ডঃ মানিকলাল সিংহ, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, হেমেন্দ্রনাথ পালিত, দুঃখভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন দাস, কান্তি হাজরা, সুশীল মাহাত, উৎপল চক্রবর্তী, শ্যামসুন্দর শুকুল, তরুণদেব ভট্টাচার্য্য, গৌতম দে, গিরীন্দ্র চক্রবর্তী, জলধর হালদার, মোহন সিংহ সহ বহুজনের বিশিষ্ট অবদান রয়ে গেছে। আদি প্রস্তরায়ুধ কাল হতে সহস্র বৎসর ব্যাপী দ্বারকেশ্বর বিধৌত এই এলাকার মানব ইতিহাস এর বিকাশ, সংস্কৃতি ধর্মীয় চেতনা হতে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন সামগ্রিক উত্তরণের যে প্রতিচ্ছবি তার সাধ্যমত অতি যৎসামান্যই হয়ত উল্লিখিত হল যার অজানা আরো বহু তথ্য কালরূপান্তরে ভবিষ্যতের দিগন্তে উন্মোচিত হবে।

গ্রন্থঋণ ঃ

১। Bengal District Gazetteers : Bankura : L.S.S. O'Malley

২। West Bengal District Gazetteers : Bankura : by - Amiya Kumar Banerjee, I.A.S.

৩। The Pictorial Encyclopedia of the Evolution of Man by - J. Jelirek

৪। ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস ঃ ডঃ দিলীপ চক্রবর্তী

৫। প্রাগৈতিহাসিক বাঙ্গলা ঃ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

৬। প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া ঃ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

৭। বাঁকুড়াজনের ইতিহাস সংস্কৃতি : রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী

৮। বাঁকুড়া : তরুনদেব ভট্টাচার্য

৯। বাঁকুড়ার মন্দির মসজিদ গীর্জা : প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১০। বাঁকুড়ার পুরাকীর্তি : অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১১। অনুদ্‌ঘাটিত মেগালিথিক সভ্যতা : শ্যামসুন্দর শুকুল (শারদীয়া শীর্ষক)

১২। বাঁকুড়া জেলায় পুরাতত্ব চর্চায় আধুনিক প্রত্নবিজ্ঞানের প্রয়োগ : রূপেন্দ্রকমার চট্টোপাধ্যায় (প্রত্ন পরিক্রমা মলভূম)

১৩। বাঁকুড়া জেলায় প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান ও উৎখনন (বাঁকুড়ার খেয়ালী) : গৌতম দে

১৪। ফিল্ড নোটস : বাঁকুড়া Vol. III শ্যামসুন্দর শুকুল পাণ্ডুলিপি

১৫। রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি : মাণিকলাল সিংহ

১৬। সুবর্ণরেখা হইতে ময়ুরাক্ষী : Vol. III মাণিকলাল সিংহ

১৭। বাংলার লৌকিক দেবতা : গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

১৮। তথ্যসূত্র - ডঃ বিপ্লব ভূষণ বসু

তথ্যসূত্র - মজিবুল মল্লিক

তথ্যসূত্র - পশ্চিমরাঢ় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা

১৯। পশ্চিমবঙ্গ বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা

মানব সম্পদ — জনসংখ্যা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

সুবিকাশ চৌধুরী

বর্ত্তমানে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠির অন্যতম উপাদান হোল সেই দেশের মানব সম্পদের উন্নয়ন। কারো কারো মতে কোনো দেশের সর্বাপেক্ষা বড় শক্তি হোল সেই দেশের মানব শক্তি। এই মতের বিপরীত বক্তব্য থাকলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নও জনসংখ্যার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এই সময়কালে মানব সম্পদের উন্নয়নের মধ্যে কোন্, কোন্ বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্ত হবে তা নিয়ে ইউ.এন.ডি.পি.'র যে বক্তব্য তাকে গ্রহণ করেই দেশ, রাজ্য তথা এই জেলার মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। যদিও একই ধরনের উপায় অবলম্বন সবক্ষেত্রে সম্ভব নয় তা সত্ত্বেও মূল বিষয়গুলি সবক্ষেত্রেই গ্রহণ করা হয়েছে। এই নিবন্ধে মানব উন্নয়নের সমগ্র মাপকাটিতে পরিমাপ করা যেহেতু সম্ভব নয় তাই মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। যাতে বাঁকুড়া-১ নং ব্লক এলাকায় জনসংখ্যা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত একটি সম্যক ধারণা গড়ে তোলা যায়। মানব উন্নয়ন সূচকের প্রধান তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হোল স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার মান। এক্ষেত্রে সূচক নির্ধারণ করা সম্ভব নয় বলেই একটি সামগ্রিক চিত্র তৈরী করার প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে এবং জেলার নিরিখে ব্লক নং ১ এর অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জনবিন্যাস

২০০১ সালের জনগননা অনুসারে বাঁকুড়া-১ নং ব্লকের জনসংখ্যা ৯৫৮৪০। আয়তন অনুসারে জেলার ব্লকগুলির মধ্যে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম অর্থাৎ সবচেয়ে ছোট ব্লক মেজিয়ার পরেই বাঁকুড়া ১নং। জনসংখ্যার বিচারেও এই ব্লকের স্থান নীচের দিক থেকে চতুর্থ। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫৭২ জন মানুষ বসবাস করেন। জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩ ভাগ মানুষের বাস এবং জেলার জনঘনত্ব ৪৬৪ অপেক্ষা এই এলাকার জনঘনত্ত্ব বেশী।

শহর সংলগ্ন এই গ্রামীন ব্লকটি ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে গঠিত এবং পৃথক কোন থানা নেই। বাঁকুড়া-১ নং এলাকায় মোট জনসংখ্যার ৩৬.৫৫ শতাংশ তপঃজাতির এবং ৬.৬৬ শতাংশ তপঃ উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। বয়সের ভিত্তিতে ৬ বৎসরের নীচে শিশুর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১৪.৫৪ ভাগ, যা ১৯৯১ সালের ১৬.৭২ শতাংশ অপেক্ষা কম। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার মধ্যে শিশুর সংখ্যা গত একদশকে ক্রমহ্রাসমান, এবং উল্লেখযোগ্য ভাগে কন্যা সন্তানের হার হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯১ সালে প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে ৯৭৫ জন কন্যা সন্তানের জায়গায় ২০০১ সালে ৯৩৪। যদিও লিঙ্গ অনুপাত জেলার গ্রামীন এলাকায় বেশী তা সত্ত্বেও এই ব্লকে শতকরা ৫১.২১ ভাগ হোল পুরুষ জনসংখ্যা।

সারনী নং ২-তে গ্রামপঞ্চায়েত ভিত্তিক জনসংখ্যা, পরিবারের সংখ্যা, আয়তন এবং নারী, পুরুষের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। এলাকাগতভাবে জগদল্লা-২ সবচেয়ে বড় হলেও জনসংখ্যার বিচারে সবচেয়ে কম। এবং জগদল্লা-১ এর এলাকা সবচেয়ে ছোট কিন্তু জনসংখ্যার বিচারে চতুর্থ।

তপঃ জাতি ও উপজাতির সর্বাধিক বসবাস করেন জগদল্লা-২ গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় এবং শতকরা ৫২.৬১

ভাগ ও ২১.৩০ ভাগ যথাক্রমে। আঁচুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তপঃজাতির জনসংখ্যা সর্বনিম্ন যদিও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা গ্রামপঞ্চায়েতগুলির মধ্যে সর্ব্বাধিক।

সারনী নং- ৩, ৪, ৫ এ জেলা, ব্লক-১ এবং গ্রামপঞ্চায়েতভিত্তিক পেশাগত অবস্থান দেখানো হয়েছে। মোট কর্ম্মীর মধ্যে বেশীর ভাগ হোল কৃষি মজুর। সংখ্যাগত বিচারে মোট কর্ম্মরত মানুষের সংখ্যা কেঞ্জাকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই সর্বাধিক। এবং কৃষি মজুরের সংখ্যা আন্দারথোল এলাকায় শতাংশের হিসাবে বেশী।

সারণী নং - ১

বাঁকুড়া জেলার পরিবার ও জনসংখ্যা

	ভৌগলিক এলাকা (বর্গমিটার)	পরিবারের সংখ্যা	জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	জনঘনত্ব
১৯৯১	৬৮৮২.০০	৪,৯৭,৪২০	২৮,০৫০৬৫	১৪,৩৭,৫১৫ (৫১.২৫)	১৩,৬৭,৫৫০ (৪৮.৭৫)	৪০৮
২০০১	৬৮৮২.০০	৬০,৬০২০	৩১,৯১,৬৯৫	১৬,৩৬,০০২ (৫১.২৬)	১৫,৫৬,৬৯৩ (৪৮.৭৪)	৪৬৪

বাঁকুড়া ১নং ব্লকের পরিবার ও জনসংখ্যা

	ভৌগলিক এলাকা (বর্গমিটার)	পরিবারের সংখ্যা	জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	জনঘনত্ব
১৯৯১	১৬৭.৬৪	১৪,৯৩১	৮৪,৪৩৭	৪২,৯১৭ (৫০.৮৩)	৪১,৫২০ (৪৯.১৭)	৫৬০
২০০১	১৬৭.৬৪	১৭,৬২১	৯৫,৮৪০	৪৯,০৮৩ (৫১.২১)	৪৬,৭৫৭ (৪৮.৭৯)	৫৭২

	তপঃজাতির মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
১৯৯১	৩১,৪৫২ (৩৭.৩৫)	১৫,৮৮৩ (৫০.০০)	১৫,৫৬৯ (৪৯.৫০)
২০০১	৩৫,০০২৯ (৩৬.৫৫)	১৭,৮৪২ (৫১.৯৩)	১৭১৮৭ (৪৯.০৭)

	তপঃউপজাতির মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
১৯৯১	৪৯৪৩	২৪৭৬	২৪৬৭
২০০১	৬৩৮৩ (৬.৬৬)	৩২৮৩	৩১০০

	৬ বছরের নীচে জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
১৯৯১	১৪১১৬	৭১৪৮	৬৯৬৮
২০০১	১৩৯৩৮ (১৪.৫৪)	৭১৮৯	৬৭৪৯

সারণী নং - ২

গ্রামপঞ্চায়েত ভিত্তিক জনসংখ্যা - ২০০১

গ্রামপঞ্চায়েতের নাম (১)	মোট এলাকা (হেক্টরে) (২)	পরিবারের সংখ্যা (৩)	মোট সংখ্যা (৪)	পুরুষ (৫)	মহিলা (৬)
(১) কালপাথর	৩৪০৩.০৩	২২৯০	১২৪৭৮	৬৩৫৭	৬১২১
(২) আঁচুড়ি	৩২৯৪.৫৪	৩৫২৮	১৯৭৬৫	১০০১৫	৯৭৫০
(৩) কেঞ্জাকুড়া	২৬৬৪.৬৭	৩৬৬৩	২০০৬৮	১০৩০৪	৯৭৬৪
(৪) জগদল্লা-২	২৩৮৭.৪৯	২২৯৩	১২৪১৩	৬৫৩০	৫৮৮৩
(৫) আন্দারথোল	৩৯৮২.৬৩	৩৩১৮	১৭৮৪৩	৯১১৯	৮৭২৪
(৬) জগদল্লা-১	১২৬৯.২৭	২৫২৪	১৩২৪১	৬৭৪১	৬৫০০

গ্রামপঞ্চায়েতের নাম	তপঃজাতির জনসংখ্যা			তপঃউপজাতির জনসংখ্যা			৬ বছর পর্যন্ত্য বয়সের জনসংখ্যা		
	মোট	পুং	মহিলা	মোট	পুং	মহিলা	মোট	পুং	মহিলা
কালপাথর	৬২০৬ (৪৯.৭৩)	৩১৫৩	৩০৫৩	১৮৯৬ (১৬.৪৫)	৯৬০	৯৩১	১৭৮৭ (১৫.৫১)	৯৪৯	৮৩৮
আঁচুড়ি	৪৬২২ (২৩.৩৮)	২৩১৭	২৩০৫	৪০০ (২.০২)	২২১	১৭৯	২৭৬০ (১৩.৯৪)	১৪১৫	১৩৪৫
কেঞ্জাকুড়া	৫৪৩১ (২৭.০৬)	২৭৭৮	২৬৫৩	২১২৩ (১০.৪১)	১০৭১	১০৫২	২৯৭৪ (১৫.০১)	১৫১৫	১৪৫৯
জগদল্লা-২	৬৫৩০ (৫২.৬১)	৩৩৬৩	৩১৬৭	২৬৪৫ (২১.৩০)	১৩৩৮	১৩০৭	১৫৪১ (১৭.৭৭)	৭৬৬	৭৭৫
আন্দারথোল	৭৫৫০ (৪২.৩১)	৩৮৭৭	৩৬৭৩	১১২৯ (৬.৩৩)	৫৫১	৫৭৮	২৬৯১ (১৫.০৮)	১৩৯১	১৩০০
জগদল্লা-১	৪৬৯০ (৩৫.৪২)	২৩৫৪	২৩৩৬	০৫ (০.০৪)	০৩	০২	১৭৩৭ (১৩.১২)	৮৮০	৮৫৭

সারণী নং - ৩

ব্লক - ১ এ জীবিকাগত বিভাজন ২০০১

	মোট	পুরুষ	মহিলা
মোট কর্মী	৩৯,৬৫৬	২৭,৩০৮	১২,৩৪৮
মুখ্যকর্মী	২৬,১০২	২১,৫৪৫	৪,৫৫৭
চাষী	৭,২৪৪	৬,৫৩২	৭১২
কৃষি শ্রমিক	৫,২৬১	৩,২৯৫	১,৯৬৬
গার্হস্থ্য শিল্প	২,৩২০	১,৭২১	৫৯৯
অন্যান্য কর্মী	১১,২৭৭	৯,৯৯৭	১,২৮০
প্রান্তিক কর্মী	১৩,৫৫৪	৫,৭৬৩	৭,৭৯১
চাষী	২,৬১০	১,৩৭৮	১,২৩২
কৃষিমজুর	৭,৮৭৩	২,৬৯৭	৫,১৭৬
গার্হস্থ্যশিল্প	৬৮১	১৬৯	৫১২
অন্যান্য কর্মী	২,৩৯০	১,৫১১	৮৭১
অকর্মী	৫৬,১৮৪	২১,৭৭৫	৩৪,৪০৯

(সংখ্যা শতাংশের নির্দেশক)

সারণী নং - ৪

গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক জীবিকাগত বিভাজন - ২০০১

গ্রামপঞ্চায়েতের নাম	মোট কর্মী			মুখ্যকর্মী			চাষী			কৃষিশ্রমিক			গার্হস্থ্য শিল্প			অন্যান্য কর্মী		
	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা
কালপাথর	৫৫৭৫	৩৪৪১	২১৩৪	১৫১৮	১২৪৯	৩০৮	১৬৪৪	১৩৪৩	৩০১	৮০৩	৫২৪	৩২১	১১৮	৯৯	৬৮	৭২৩	৬৬৪	১০৭
আঁচড়ি	৬৯৫২	৫২৩০	১৭২২	৮৮৪	৮৩৩	৫১	৮৮৪	৮৩৩	৫১	৬০৭	৪৫৪	১৫৩	৭৯	৫৭	২২	৩১৫২	২৮৬৭	২৮৫
কেঞ্জাকুড়া	৮৭৯৬	৫৮৪২	২৯৫৬	১২৫৭	১১৩২	১২৫	১২৮৪	১১৫৮	১২৬	৭৫৪	৪৬০	২৯৪	১৫০৫	১১৭৯	৩২৬	২২২৮	১৯৬০	২৬৬
জগদল্লা-২	৫৩৫৭	৩৪৯৮	১৮৫৯	৩৬৩৪	২৮৬৮	৭৬৬	৯৯৯	৯৫০	৪৯	১২৪৮	৭৪৫	৫০৩	১৯৯	১৩৮	৬১	১১৮৮	১০৩৫	১৫৩
আন্দারথোল	৭৪৭০	৫১৪১	২৩২৯	১৭০৩	১৫৬৪	১৩৯	১৭০৩	১৫৬৮	১৩৯	১৪৯২	৮৮৮	৬০৪	৯৩	৬১	৩২	১৩২০	১২৪০	৮০
জগদল্লা-১	৪৮৪১	৩৭৭৪	১০৬৭	৭২৯	৬৮৩	৪৬	৭২৯	৬৮৩	৪৬	৩০০	২০৪	৯৬	২৩২	১৮৬	৪৪	২৬৭০	২২৪৩	৪২৭

সারণী নং - ৫

গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক জীবিকাগত বিভাজন - ২০০১

গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	প্রান্তিক কর্মী			চাষী			ক্ষেতমজুর			গার্হস্থ্যশিল্প			অন্যান্য কর্মী		
	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা
কালপাথর	২৫৯৩	১১১৯	১৫২৫	৪৯২	৩২২	১৭০	১৮৮৭	৬৫৯	১২৮৫	১১৯	৭৩	১০৬	৩২৩	২৪২	১৪৪
আঁচুড়ি	২২৩০	১০১৯	১২১১	৬০২	৩৬৫	২৩৭	৯৮২	২৬২	৭০০	৯১	২১	৭০	৫৫৫	৩৫১	২০৪
কেঞ্জাকুড়া	৩০৫৪	১১১১	১৯৪৩	৬৭০	২৯৯	৩৭১	১৮২৮	৫৬৯	১২৫৯	১৮৮	৪৭	১৪১	৩৬৬	১৯৬	১৭২
জগদল্লা-২	১৭২৩	৬৩০	১০৯৩	২১৫	৮৫	১৩০	১১১১	৩৫৪	৭৫৭	৫৩	১৭	৩৬	৩৪৪	১৭৪	১৭০
আন্দারথোল	২৮৬২	১৩৮৮	১৪৭৪	৫৯৯	৩০৭	২৯২	১৭১৬	৭১৫	১০০১	১০০	১৬	৮৪	৪৪৭	৩৫০	৯৭
জগদল্লা-১	৯১০	৪৫৬	৪৫৪	১১৯	৪২	৭৭	২৭৬	১২২	১৫৬	১০৫	২৯	৭৬	৪০৮	২৬৩	১৪৫

নৃতাত্ত্বিক অবস্থান

১৯৫১ সালে স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রথম জনগননা হয়েছিল বর্ণ বিভাগের পরিবর্ত্তে পেশা ও রুজি রোজগারের ভিত্তিতে। তপঃজাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে গোষ্ঠী অনুযায়ী গননা হয়ে আসছে। হান্টার সাহেব বাঁকুড়া জেলায় হিন্দু ও হিন্দুভাবাপন্ন তিরাশিটি বর্ণ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছিলেন। রাঢ় অঞ্চলে বৃত্তি বিভাগের ধারা পশ্চিমবাংলার অন্যান্য এলাকা থেকে নানা দিক দিয়ে তফাৎ আছে। কৃষি জমির অপ্রতুলতা, সেচের অভাব জনিত কারণে ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। বাঁকুড়া জেলার সাথে এই এলাকার ও বৃত্তি বিভাগটি মোটামুটি একইরকম।

১) শিকারী গোষ্ঠী - সাঁওতাল, মুন্ডা, কোড়া, ভূমিজ।

২) পশুচারক ও পালক গোষ্ঠী - বাউরী, হাঁড়ি, গোপ ইত্যাদি।

৩) মৎসজীবি সম্প্রদায় - বাগ্দী, মাঝি, খয়রা, মেটে, ধীবর ইত্যাদি।

৪) শষ্য উৎপাদক - সদগোপ, তিলি, তেলি, কৈবর্ত্ত ইত্যাদি।

৫) শিল্পী ও বণিক সম্প্রদায় - শাঁখারি, কামার, কুমার, ছুতোর, তাম্বুলি, বেনে, তাঁতি ইত্যাদি।

৬) রাজপুত, ছত্রী - সেন, বীরসিং, তুং, মান ইত্যাদি।

৭) ব্রাহ্মণ - উৎকল, কনৌজ, রাঢ়ী ইত্যাদি।

উপরোক্ত ১-৩নং ভূক্ত সম্প্রদায়ের মানুষই বর্ত্তমানে এই এলাকার ক্ষেতমজুর বা কৃষিশ্রমিক হিসাবে বেশীরভাগ চিহ্নিত।

তপঃজাতিভূক্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এই এলাকায় প্রধানত যাদের উল্লেখ করা যেতে পারে তা হোল —

বাউরী ঃ বাঁকুড়া জেলায় তথা এই এলাকাতে মূলতঃ আন্দারথোলে বাউরি সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা বেশী। বাউরীদের মধ্যে আবার নটি উপভাগ আছে। শহর বা গ্রামের উপান্তে, আলাদা পাড়া তৈরী করে বসবাস করে। অভাব, অজ্ঞতা এবং দারিদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত। জাতিগত পেশা কিছু নেই। মূলতঃ কৃষিমজুর, মুটেগিরি, রাজমিস্ত্রীর যোগানদার এবং বর্ত্তমানে রিক্সা চালাবার কাজও অনেকে গ্রহণ করেছেন। মেয়েরাও ঝি, কামিনের কাজ করে থাকেন।

বাউরীদের মধ্যে শিক্ষিতের হার এখনও কম। সংরক্ষণের সুবিধা এই সম্প্রদায়ের মানুষরা গ্রহণ করতে পারেনা। মনসাপূজা বাউরি সমাজে প্রচলিত। মনসা পূজার সময় ভক্তদের ওপর মনসাদেবী 'ভর' করেন বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। একে বলে 'ঝুপাল'। 'ঝুপাল'-এর সময় ভক্ত উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহিত জীবনে দারিদ্রের ও অশিক্ষার কারনে ঝগড়াঝাটি হয় একটু বেশী। নেশাগ্রস্ততা ও কুসংস্কার প্রবলভাবেই এদের মধ্যে বিরাজ করছে।

বাগ্দী ঃ তপঃ সম্প্রদায়ের মধ্যে এটিও একটি বড় জনগোষ্ঠী। আদিম পেশা ছিল মৎস্য শিকার। জলজঙ্গল বাগ্দীদের আশ্রয় ও জীবিকার ক্ষেত্র ছিল। সেখানে মৃত্যুর কারণ ছিল অনেক ক্ষেত্রেই বিষধর সাপ। ফলে মনসা বাগ্দীদের উপাস্য প্রধান দেবী। বিয়ে ও সামাজিক ক্রিয়াকান্ডে বাগ্দী ও বাউরীদের মধ্যে বহু সাদৃশ্য আছে। মল্লরাজাদের আমলে বাগ্দীরা স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও যোদ্ধা জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। শিক্ষিতের হার এদের মধ্যেও কম। বর্ত্তমানে এদের পেশা হোল - কৃষিমজুর, রাজমিস্ত্রী, বিড়ি কারিগর ও রিক্সা চালকের কাজও করে থাকে। সম্প্রদায়ের মানুষই পঞ্চায়েতে আসন সংরক্ষণের কারণে প্রশাসনিক কাজে অংশগ্রহণ করছে। প্রথমদিকে কিছুটা জড়তা থাকলেও বর্ত্তমানে কিছুটা কাটিয়ে উঠছে। নেশাগ্রস্তও এদের একটি বড় সমস্যা। তেঁতুলিয়া বাগ্দী ছাড়া বিবাহ সম্পর্ক বাউরীদের মতোই। তেঁতুলিয়া-পদবী, বাগ, সাঁতরা, রাই, খান, পুইলা।

শুঁড়ি ঃ শুঁড়িরা তপশীলভূক্ত সম্প্রদায়। অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্যান্য নিম্নবর্ণের সম্প্রদায়গুলির মত দুর্দশাগ্রস্ত নয়। জাতিগত পেশা মদ তৈরী। পরবর্ত্তীকালে যারা মদের ব্যবসা ছেড়ে অন্য ব্যবসায় নিয়োজিত হয়েছিলেন, তারা

সাহা হিসাবে পরিচিত। যদিও সাহারা নিজেদের পৃথক গোষ্ঠী হিসাবে দাবী করেন। এই এলাকায় খুব বেশী মানুষের বসবাস নেই। মহাজন, গোলদার, আড়তদার বিভিন্ন ব্যবসায়িক সূত্রে পরিচিত।

তাঁতি, তন্তুবায় ঃ তন্তু শব্দের অর্থ সূতা বা আঁশ। তন্তুবায় বা তাঁতি নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে সম্ভবত আলাদা কোন গোষ্ঠী নয়। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ পেশা হিসাবে তাঁতশিল্পে আশ্রয় নেওয়ায়, তাঁতিরা বাঁকুড়ায় বিশিষ্ট শিল্পীগোষ্ঠী হয়ে উঠেছিলেন। মূলতঃ কেঞ্জাকুড়া গ্রামে এদের একটি বড় অংশ বসবাস করেন। একসময়ে তাঁত চালনা লাভজনক বৃত্তি ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে হস্তচালিত তাঁতের সঙ্গে যুক্ত তাঁতিদের খুবই অর্থনৈতিক দুর্দশা। এদের অনেকেই তাঁত চালাবার কাজ ছেড়ে কাপড়ের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এবং সঙ্গতিপূর্ণ। এদের পদবী মূলতঃ বীট, চন্দ, দাস, দত্ত, দে, গুঁই, কর, নন্দী, পাল ইত্যাদি। যারা জাত ব্যবসা ছেড়েছেন, কৃষি, ব্যবসা ও চাকুরি তাদের বর্ত্তমান অবলম্বন।

লোহার, কামার ঃ নানা বর্ণ ও গোষ্ঠীর মানুষ নিয়ে উদ্ভূত পেশাভিত্তিক সম্প্রদায়, যাদের কাজ হোল লোহা গলিয়ে নানা ধরণের জিনিষপত্র তৈরী করা। যারা কামারশালা বা ওয়ার্কশপ নিয়ে কাজ করেন তারা কামার নামে পরিচিত। লোহার-কামার — লোহা নিয়ে কাজ করেন। পিটুলি-কামার বিতলের বাসপত্র নির্মাণ করেন। কাঁসা নিয়ে কাজ করেন কাঁসারি, স্বর্ণকামার সোনার গয়না তৈরী করেন ইত্যাদি। এই এলাকায় বেশ কিছু এই পেশার সাথে যুক্ত মানুষ আছেন।

তাম্বুলি, তামলি ঃ অর্থাৎ বণিক গোষ্ঠী হিসাবে নানা ধরণের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। বর্ত্তমানে কৃষি প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খুচরো ব্যবসা ইত্যাদি জীবিকা হিসাবে বেশীরভাগ লোক গ্রহণ করেছেন। কিছু গ্রামে এদের উল্লেখযোগ্যভাবে অবস্থান আছে।

তেলি, তিলি ঃ এই সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ লোকই এই এলাকার শষ্য ব্যবসায়ী ও জোতদার। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবার ফলে সঙ্গতিপূর্ণ তিলিরা তেলিদের থেকে নিজেদের পৃথক বলে মনে করেন।

বাঁকুড়া সদর থানার জনবিন্যাস (বর্তমানে বাঁকুড়া ১নং ও ২নং ব্লকে বিভক্ত)

জনগণনা -- ১৯২১

বাউরী -	২৩,১২৬	কুর্মী -	১১৫	তিলি -	৬,৭১৩
বাগ্দী -	২,৫২৫	নাপিত -	১,৩০৯	সদগোপ -	২,০৪০
শুঁড়ি -	৩,৬৬৫	চাষী কৈবর্ত্ত -	২,৫৮৩	কামার -	২,৩৬৭
লোহার -	১,৫৩৯	জানিয়া কৈবর্ত্ত -	১,৪৫২	কুমোর -	৫১৪
মাল -	২,১২১	ব্রাহ্মন -	১৩,০৪৭	কায়স্থ -	১,৮১৩
সাঁওতাল -	১,৯২৭	বৈষ্ণব -	১,৪১৪	রাজপুত -	৪,৫৫২
মুচী -	৭১৫	গোয়ালা -	৭,৫৩০	গান্ধবণিক-	৫২৯
ভূঁমিজ -	৫৫৩	তাম্বুলী -	৩,০১৮	কুলু -	২,০৯২
ডোম -	১৪৩	তাঁতী -	৩,২১৮		

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা (১৯২১)

হিন্দু	--	৮৬,৫৭৪
মুসলমান	--	৪,১৮৯
প্রেত পুজক	--	১,০৮২
খৃষ্টান	--	৫৭৮
অন্যান্য	--	৩
মোট	—	**৯২,৪২৬**

সাক্ষরতা এবং শিক্ষা

মানব উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হোল শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে। কোন একটি দেশের জীবনযাত্রার মানের নির্ণায়ক বলে মনে করা হয় সেই দেশের শিক্ষার স্তরকে। এছাড়াও উন্নয়নের অন্যান্য উপাদানগুলির সঙ্গে শিক্ষার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কোন একটি জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সার্বিক সাক্ষরতা ও স্ত্রী শিক্ষার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা দরকার।

সারণী নং-৬ এ বাঁকুড়া জেলার ও ব্লক-১ এর বিগত চার দশকের সাক্ষরতা বৃদ্ধির তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে আলোচ্য সময়ে সাক্ষর মানুষের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে সারা জেলার সাথে আলোচ্য ব্লকটির সেরূপ কোন পার্থক্য নেই। নারী সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেলেও অর্দ্ধেকেরও বেশী নারী এখনও নিরক্ষরতার অন্ধকারে জেলার ক্ষেত্রে লিঙ্গ জনিত ফাঁক যেখানে ২৭.৪%, সেখানে এই এলাকার তার চেয়েও বেশী অর্থাৎ ২৯.৬%। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে সর্বাধিক নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা জগদল্লা-২ এ এবং এই এলাকার সাক্ষরতার হার হোল ৪৯.৮৫ শতাংশ। লক্ষ্যণীয়ভাবে এই গ্রামপঞ্চায়েতে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার মধ্যে তপঃ জাতি ও তপঃ উপজাতিভূক্ত ৫২.৬১ জনসংখ্যা হোল যথাক্রমে ২১.৩০%। অর্থাৎ তপঃ জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরক্ষতার হার এখনও বেশী। সামগ্রিকভাবে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেলেও, সাক্ষরতার প্রসারে আরো গুরুত্ব দেওয়া দরকার। বিভিন্ন আর্থসামাজিক গোষ্ঠীর সাক্ষরতার হারে যে তাৎপর্য্যপূর্ণ পার্থক্য আছে সেটিকে দূর করা দরকার। সব অংশের মানুষের কাছে সাক্ষরতার কর্মসূচী এবং শিক্ষার সুযোগকে সমানভাবে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করা দরকার। এইসব পরিবারগুলির মধ্যে মহিলারা দুই তৃতীয়াংশই নিরক্ষর এবং এরাই হোল পেশাগত দিক থেকে শ্রমজীবী। স্বাভাবিকভাবেই নিরক্ষরতার সাথে আয়ের সম্পর্কও বিদ্যমান। সুতরাং অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সাক্ষরতার ও শিক্ষার অগ্রগতি ঘটাতে হলে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্য্যকরী করা জরুরী কর্ত্তব্য।

সাক্ষরতায় ও শিক্ষায় অগ্রগতির বিষয়টি শিশুদের বিদ্যালয়ে নাম নথিভূক্ত করা এবং অন্ততঃ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা সম্পূর্ণ করার ওপরে অনেকটাই নির্ভরশীল। তাই বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্তিকরণের যে তথ্য পাওয়া গেছে তা সারণী নং ৮ এ দেখলেই বোঝা যাবে। দেখা যাচ্ছে যে ৫-৮ বছর পর্য্যন্ত শিশুদের মধ্যে ৬.৭ শতাংশ শিশু এবং ৯-১৩ বৎসর বয়সের শিশুদের মধ্যে ১০.৭ শতাংশ শিশুরা স্কুলে নাম নথিভূক্ত করাচ্ছেনা। এই হারও জেলা সামগ্রিক হারের থেকে বেশী, কারণ স্কুলের বাইরে যে সমস্ত শিশুরা আছে তাদের জেলার ক্ষেত্রে হার হোল ৪.৪ শতাংশ। বিদ্যালয়ে নাম নথীভূক্তকরণ সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কিত বিষয়ে বিভিন্ন ভুলভ্রান্তির কথা রাজ্য মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্বভাবতই সাক্ষরতার উৎসমুখে স্কুল চলো কর্মসূচীর গুরুত্ব কতোখানি তা সর্বস্তরে অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

সারণী নং - ৬
চারদশকের সাক্ষরতার হার জেলা ও বাঁকুড়া-১ এর

সাল	জেলা			ব্লক-১		
	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা
১৯৭১	২৭.৩৬	৩৯.৬৮	১৭.০৪	৩৩.৭৩	৪৫.৯৮	২০.৭৬*
১৯৮১	৩৫.৮৮	৫২.০৯	২৫.৯৩	৪৫.০৫	৫৭.৯৭	৩১.৪৪*
১৯৯১	৫২.৭৫	৬৪.৬৬	৩৬.০৫	৫২.২৩	৬৮.৮৬	৩৫.০১
২০০১	৬৩.৮০	৭৬.৪০	৪৯.৪০	৬৩.২০	৭৭.৭০	৪৮.১০

* ১৯৭১ এবং ৮১র তথ্য বাঁকুড়া ব্লক-১ ও ২নং যুক্তভাবে।

সারণী নং - ৭

গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক সাক্ষর ও নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা

গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	সাক্ষর মানুষের সংখ্যা			নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা		
	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা
কালপাথর	৫৭৬১ (৪৬.১৭)	৩৮৯৬	১৮৬৫	৬৭১৭	২৪৬১	৪২৫৬
আঁচুড়ি	১১৩৯৪ (৫৭.৬৫)	৬৮৪০	৪৫৫৪	৮৩৭১	৩১৭৫	৫১৯৬
কেঞ্জাকুড়া	১১২০৩ (৫৫.৮২)	৭০০০	৪২০৩	৮৮৬৫	৩৩০৪	৫৩৭৭
জগদল্লা-২	৬১৮৯ (৪৯.৮৬)	৪১৩৮	২০৫১	৬২২৪	২৩৯২	৩৮৩২
আন্দারথোল	৯২৩১ (৫১.৭৩)	৫৮৮৪	৩৩৪৭	৮৬১২	৩২৩৫	৫৩৭৭
জগদল্লা-১	৮০০৭ (৬০.৪৭)	৪৭৭৭	৩২৩০	৫২৩৪	১৯৬৪	৩২৭০

সারণী নং - ৮

ব্লক-১ এ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নাম নথীভূক্তকরণের সংখ্যা

শ্রেণী	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
প্রথম	১৩০৭	১২৬১	২৫৬৮
দ্বিতীয়	১১৫৪	১১০৬	২২৬০
তৃতীয়	১২০৮	১১৬৭	২৩৭৫
চতুর্থ	১১৬২	১০৯৫	২২৫৭
মোট	৪৮৩১	৪৬২৯	৯৪৫০
৩০.৯.০৫ তাং পর্যন্ত	৫৮৮৬	৫৪৬০	১১৩৪৬

স্কুলের বাইরে যারা ভর্ত্তি হয়নি তাদের সংখ্যা
ব্লক-১ নং (৩০.৯.২০০৫ পর্যন্ত্য)

৫-৮ বছরের শিশুদের	ছেলে	মেয়ে	মোট	শতকরা হার
শিশুদের মোট সংখ্যা	৬২৭৮	৫৮৮৩	১১১৬১	১০০
ঐ বয়সের যারা ভর্ত্তি হয়নি	৩৯২	৪২৩	৮১৫	৬.৭
জেলার হার - ৪.৪%				
৯-১৩ বছরের শিশুদের মোট সংখ্যা	৫১৯১	৪৫৬৩	৯৭৫৪	১০০
যারা ভর্ত্তি হয়নি	৭৩৬	৭৬৬	১৫০২	১৫.৪০
জেলার হার - ১০.০৮%				

সারণী নং - ৯

বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত সুবিধা ব্লক -১

যতগুলি বিদ্যালয়	সংখ্যা
একটি মাত্র ঘর	১৩টি
দুটি ঘর	৩১টি
তিনটি ঘর	২৩টি
চারটি ঘর	২৪টি
চারের অধিক ঘর	১৩টি
রান্নার চালাঘর আছে	১০০টি
পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে	৯০টি
স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়	২৪টি
ব্ল্যাক বোর্ডের সংখ্যা (১-৩ পর্য্যন্ত)	৪৬টি
ব্ল্যাক বোর্ডের সংখ্যা (তিনের অধিক)	৫৮টি
শৌচাগার আছে	৮৫টি
খেলার মাঠ আছে	২৭টি
ছাত্র প্রতি জায়গার পরিমাণ (বর্গফুট)	৯.৮৯

সারণী নং - ১০

ব্লক -১ এ ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত (২০০৩-০৪)

	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা	শিক্ষকের সংখ্যা	ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৫	১০১৫৩	২৬২	৩৮.৭
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪	৯১০	২৬	৩৫.০
উচ্চবিদ্যালয়	৮	৩৭৫৪	১০৩	৩৬.৪

সারণী নং - ১১

ব্লক -১ এ শিশু ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র

	সংখ্যা	শিশু ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মোট পড়ুয়া
শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	১৮	৯৪০
মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র	২	৪১০
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক	২১৬	(চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণী)

স্বাস্থ্য

মানব উন্নয়নের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বাঁকুড়া সম্পর্কে বলা হয় যে কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া এবং ফাইলেরিয়া এই তিন নিয়ে বাঁকুড়া। অন্যদিকে অপুষ্টি এবং শিশু মৃত্যুর হার ও উল্লেখযোগ্য। যদিও এই ধারণার পরিবর্ত্তন হয়েছে তা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য একটি চিন্তার বিষয় জেলার ক্ষেত্রে। কারণ স্বাস্থ্য খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত জীবনধারণের বিষয়গুলির সঙ্গে। স্বাস্থ্যের কারণে শ্রমদিবস নষ্ট হলে তার প্রভাব দিনমজুরদের ওপর পড়তে বাধ্য। উপার্জনকারী ব্যক্তি অসুস্থ হলে পরিবার ঋণ ফাঁদে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। এছাড়া সু-স্বাস্থ্য উৎপাদনশীলতার সাথে ধনাত্মকভাবে সম্পর্কিত। এই বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার সজ্ঞা অনুযায়ী স্বাস্থ্য বলতে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বোঝায় না। স্বাস্থ্য হোল শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে ভালো থাকা।

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি বাঁকুড়া ১নং ব্লক এলাকায় কোন অবস্থায় আছে তা দেখা যাক —

সারা পৃথিবীর অবস্থা হোল প্রত্যেক বছর ১৩০ মিলিয়ন নবজাতক শিশুর মধ্যে ৪ মিলিয়ন জন্মানোর ৪ মাসের মধ্যেই মারা যাচ্ছে। এই তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে কোন একটি দেশের নবজাতক এবং শিশু মৃত্যুর হার সেই দেশের জীবনমানের গুণগত দিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। সেই কারণে মাতৃত্বকালীন অবস্থা ও শিশুদের স্বাস্থ্য বিষয়ে বিনিয়োগ বা অগ্রাধিকার দেওয়া শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর জন্যই নয়, এটা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে মানব কল্যাণের যে উপদেশগুলি যেমন দারিদ্র হ্রাস এবং জীবনমানের উন্নতির জন্যই প্রয়োজন।

সমাজের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত অবস্থার সঙ্গে জনঘনত্ব, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, নারী-পুরুষ অনুপাত, গ্রাম থেকে শহরে যাওয়ার হার এই বিষয়গুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। পশ্চিমবাংলায় গ্রামাঞ্চলে মোট শিশুমৃত্যুর হারের ক্ষেত্র গত কয়েকবছর ধরেই বেশ নিম্নমুখী প্রবনতা দেখা যাচ্ছে এবং ১৯৮২-২০০২ এই দুই দশকের সমগ্র দেশের তুলনায় পশ্চিমবাংলার অবস্থা অনেক ভালো। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্রমশ উন্নত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও বাঁকুড়া জেলার সামগ্রিক বিচারে ব্লক-১ এর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। ২০০৫ এর প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে ব্লক-১ শিশু মৃত্যুর হিসাবে জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ প্রতি হাজারে ৪৬.৯৯। যেখানে সিমলাপালে ১.৫৩ প্রতি হাজারে এবং জেলার ব্লকগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভালো।

শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার জন্য আরো বেশী বেশী সচেষ্ট হওয়া দরকার। শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবার সার্বিক উন্নতি ও শিশু মৃত্যুর হার কমানোর প্রয়াস, এই দুটি বিষয়ই সাধারণভাবে মা ও শিশুর পৌষ্টিক বিন্যাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। শিশুদের অপুষ্টির বিষয়টি এখানে লক্ষ্যনীয়ভাবে বেশী। বিভিন্ন বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় ৬৭% শিশু অপুষ্টির শিকার এবং এটির ক্ষেত্রেও জেলার চিত্র প্রায় একইরকম। এবং দেখা যায় যে শিশু এক বৎসর পর্যন্ত যতো শিশু অপুষ্টিতে ভোগে তার চেয়ে বেশী (১-৩) বছর পর্যন্ত শিশুরা অপুষ্টির শিকার। এক্ষেত্রে আই.সি.ডি.এস., গ্রামপঞ্চায়েত এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের যৌথভাবে কিছু প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে অপুষ্টিগত সমস্যা কিছুটা হ্রাস করা যাবে।

বয়সানুপাতে ওজন এবং উচ্চতা পুষ্টি ও বৃদ্ধির সূচক। এই সম্পর্কিত তথ্য আই.সি.ডি.এস. কেন্দ্রগুলিতে সংরক্ষিত হয়। এগুলি ঘুঁটিয়ে পর্য্যালোচনা করে দেখা দরকার কোন ঘাটতি হচ্ছে কিনা?

শিশুদের রক্তাল্পতার ক্ষেত্রে রাজ্যের এবং জেলার বিচারে এই ব্লকের অবস্থানে খুব বেশী পার্থক্য নেই। এন.এফ.এইচ.এস. এর হিসাব অনুযায়ী গ্রামে রক্তল্পতায় ভোগা শিশুর সংখ্যা শতকরা ৮২ ভাগ। রক্তাল্পতায় ভোগা এবং শিশুদের মধ্যে পুষ্টির অভাবের ফলে বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের শক্তি ও সামর্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

একইভাবে মহিলাদের পুষ্টিগত অবস্থাও উদ্বেগের কারণ। যদিও এ বিষয়ে ব্লক ভিত্তিক তথ্যের কিছু অভাব আছে। সামগ্রিক পশ্চিমবাংলার অবস্থার বিচারে এই এলাকার অবস্থানও খুব খারাপ। সীমিত ও তীব্র রক্তাল্পতার ক্ষেত্রে রাজ্যের তথা এলাকার স্থান খুব নীচে। রক্তাল্পতা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এর প্রতিরোধের জন্য সকল স্তরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত জরুরী।

সারণী নং - ১২
স্বাস্থ্য চিত্র - বাঁকুড়া -১

শিশু মৃত্যুর হার - ২০০৫		
মোট	পুরুষ	মহিলা
৪৬.৯৯	৪৭.৪৭	৪৬.০৪

	মোট শিশু ০-৬ বৎসর বয়সের	অপুষ্টির শিকার	প্রতি হাজার শিশুদের মধ্যে
অপুষ্টির অবস্থা মে ২০০৬ পর্যন্ত	৭৭৯২	৪৯১২	৬৩০

	১ বছরের নীচে শিশুদের			১-৩ বছরের বয়স		
অপুষ্টির অবস্থা	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
মে ২০০৬ পর্যন্ত শতকরা হার	৪৪.৩০	৬২.৮৭	৫৩.১৬	৬০.৪৯	৭৫.১০	৬৭.৩০

সারণী নং - ১৩
বাঁকুড়া ১নং ব্লকের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	চিকিৎসকের সংখ্যা	নার্স	শয্যা সংখ্যা
আঁচুড়ি	৫১+১(আয়ুর্বেদ)	৪	১০
কেঞ্জাকুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	২	৩	১০
হেলনা শুশুনিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১	৩	

উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ চিংড়া, বেলিয়া, ধগড়িয়া, কুমিদ্যা, শুনুকপাহাড়ী, কাঁকড়াডি, ভগবানপুর, দামোদরপুর, হেলনা, ধলডাঙ্গা, বাঁশী, কাপিষ্টা, সানাবাঁধ, আঁচুড়ি, মোলবোনা, তাৎকানালী, কেঞ্জাকুড়া, ধগড়িয়া (কেঞ্জাকুড়া)।

জগদল্লা - ১ গ্রাম পঞ্চায়েত ঃ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা - ১

আঁধারথোল গ্রাম পঞ্চায়েত ঃ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা - ১

কালপাথর গ্রাম পঞ্চায়েত ঃ আয়ুর্বেদ চিকিৎসা - ১

সারণী নং - ১৪

গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক স্বাস্থ্য কর্মসূচী

রোগপ্রতিষেধক টীকাদান কর্ম্মসূচী

গ্রামপঞ্চায়েতের নাম	প্রাক্ প্রসব নথিভূক্তি	টিটেনাস টিকাসাইজড (প্রসূতিমা)	প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব	বাড়ীতে প্রসব	মোট	প্রসব পরবর্ত্তী ৩য় চেকআপ	মোট শিশু প্রসব	০-১ বছরের শিশু মৃত্যু	১-৫ বছরের শিশু মৃত্যু	মাতৃত্ব-কালীন মৃত্যু
আঁচুড়ি	৪০৮	৩৯৪	৩১৬	৪৯	৩৬২	৩২৮	৩৬৪	৯	২	০
জগদল্লা-১	২২০	২০৮	১৯৫	২৯	২২৪	১১৮	২২৫	৩	১	১
জগদল্লা-২	২৪৪	২৩৯	১৭৮	৩৩	২০৫	২০২	২০৮	৮	৩	০
আঁধারথোল	৩৯৮	৩৫০	২৮৮	৭৫	৩৫৩	২৯০	৩৫৪	১১	৪	০
কালপাথর	৩৭০	৩২৭	১৮৪	১৫৫	৩১৯	৩০৯	৩১৭	১৮	২	০
কেঞ্জাকুড়া	৩৫২	৪২৯	২৯২	৮৪	৩৭৬	২৬৯	৩৭৮	১২	১	০
মোট	২০৬৯	১৯৩৬	১৪৫০	৪০৫	১৮৪৯	১৪৯৫	১৫৫৮	৬১	১৩	১

সারণী নং - ১৫

গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক শিশুদের প্রতিষেধক টীকাদান

গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	বি.সি.জি.	ডি.টি.পি	পোলিও ভ্যাকসিন	মিজিলস্	ভিটামিন 'এ'
আঁচুড়ি	৩২৭	৩৩৬	৩৩৬	৩২০	৩০২
জগদল্লা-১	২২১	২৪৪	২৪৪	২২৬	২৩০
জগদল্লা-২	২৩৩	২৩৭	২২৭	২২৫	২০৮
আন্দারথোল	২৬২	৩৭৩	৩৭০	৩৪৯	৩১৮
কালপাথর	২৯৬	৩২৮	৩২৬	২৬৮	২১৯
কেঞ্জাকুড়া	৩৭১	৩৭১	৩৭১	৩৬৯	৩৬৫
মোট	১৮১০	১৮৪৯	১৮৭৪	১৭৫৭	১৬৯২

সারণী নং - ১৬

পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ

গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	মোট প্রজননক্ষম স্বামী/স্ত্রী	অস্থায়ী			স্থায়ী		মোট	শতকরা হার
		TUB	নির্বাহীকরণ	IUD	CC	OP		
আঁচুড়ি	৩০৬৪	১০৯৯	০	৪৩	২১৩	৪২৪	১৭৭৯	
জগদল্লা-১	২৩২০	১১২৯	০	১১	১২৭	২৫৬	১৫২৩	
জগদল্লা-২	১৯৭২	১০১৮	০	২৪	৭০	১৯৬	১৩০৮	
আন্দারথোল	২০৬০	১২৪৩	০	৬৯	৯৫	৪২৪	১৮৩১	
কালপাথর	২৩৪৩	৯৩৩	০	৮	২৪৬	৩১১	১৪৯৪	
কেঞ্জাকুড়া	৩৫৯৭	১৬৭১	০	২৫	২১৪	৩৫৯	২২৪৯	
মোট	১৬৩৫৬	৭০৭৯	০	১৮০	৯৬৫	১৯৭০	১০২১৪	৬২.৪২

সারণী নং - ১৭

গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক সুসংহত শিশু বিকাশ (ICDS) কেন্দ্রের সংখ্যা এবং পাণীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা

গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	কেন্দ্রের সংখ্যা	পাণীয় জলের ব্যবস্থা		শৌচাগার	
		আছে	নেই	আছে	নেই
আঁচুড়ি	১৮	১৫	৩	১	১৭
জগদল্লা-১	১৩	১০	৩	২	১১
জগদল্লা-২	১১	১১	--	৬	৫
আন্দারথোল	২০	১৯	১	৩	১৭
কালপাথর	১৪	১৩	১	১	১৩
কেঞ্জাকুড়া	২০	১৭	৩	৩	১৭
মোট	৯৬	৮৫	১১	১৬	৮০

তথ্যসূত্র :

১) বাঁকুড়া জেলার বিবরণ : রামানুজ কর

২) সেনসাস প্রতিবেদন ২০০১

বাঁকুড়ায় চিকিৎসার সনাতনী ধারা থেকে আধুনিক কারিগরী, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান

গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী

প্রাচীনকাল থেকেই বাঁকুড়া জেলায় দরিদ্র, নিম্নবর্গীয় তথা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসার প্রচলন ছিল না। পরম্পরাগত চিকিৎসার দায়িত্ব বহন করতেন গুণিন ও ওঝা। রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থার মধ্যে ছিল ঔষধি গাছ-গাছড়া ও লতা-গুল্মের ব্যবহার, ঝাড়-ফুক-তুকতাক্, জলপড়া-তেলপড়া, জুড়িবুটি, তাবিজধারণ। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে রচিত জগদ্রামী রামায়ণে কবজ বা রোগ-নিবারক মন্ত্রপূত মাদুলি ধারণের কথা লিপিবদ্ধ আছে (অদ্ভুত অষ্টকাণ্ডে সম্পূর্ণ রামপ্রসাদী জগদ্রামী রামায়ণ ঃ নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃষ্ঠা - ২)। গ্রহবিপ্রগণ কুষ্ঠ ও বসন্ত রোগের চিকিৎসা করতেন। সাধারণ মানুষের কাছে ওঝা, গুণিন ও গ্রহবিপ্রদের সমাদর ও জনপ্রিয়তা ছিল। বাংলার অন্যান্য জেলার মতো এ জেলায় প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা ছিল 'আয়ুর্বেদ' তথা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা। তবে এ জেলায় সঠিক কবে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার সূচনা হয়েছিল তা এখনো গবেষণানির্ভর। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে সামন্তভূমে বৈদ্যদের উপস্থিতির কথা জানা যায় কারণ বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকৃষ্ণকে তাঁর পাগলামির জন্য 'বেজঘরে' বা বৈদ্যের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন (তথ্যসূত্র ঃ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য রচিত বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, পৃষ্ঠা-২৪০)। তবে প্রথম ইতিহাসখ্যাত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক হলেন শ্রীনিবাস আচার্যের পার্যদ মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর নিবাসী সাধক রামচন্দ্র কবিরাজ। জেলার বিভিন্ন স্থান সহ দ্বারকেশ্বর নদ তীরবর্তী বহু স্থানে বহু আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসা বিষয়ক পুঁথি আবিস্কৃত হয়েছে (সূত্র ঃ Bankura District Gazetteer, Ed. A.K. Bandyopadhyay, 1968, Page - 476) ১৮৭০-এর দশকে এ জেলায় পুরুষ কবিরাজ ছিলেন ৮৬জন, মহিলা কবিরাজ ১১ জন। বিষ্ণুপুরের নিকটস্থ কাকিল্যার প্রখ্যাত কবিরাজ সচ্চিদানন্দ ন্যায় পঞ্চাননের অনুজ হরিপদ দাশগুপ্ত (১২৮৭-১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) ১৩০৫ বঙ্গাব্দে বাঁকুড়ায় এসে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শুরু করেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন 'হরগোবিন্দ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়'। তাঁর পুত্র নবনীরদ দাশগুপ্তও ছিলেন ব্যাকরণতীর্থ ও ভীষক্‌রত্নম।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বিষ্ণুপুর থেকে জেলাকেন্দ্র বাঁকুড়ায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর কয়েদীদের চিকিৎসার জন্য ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ৭ জুলাই নিযুক্ত হয়েছিলেন কবিরাজ রামচন্দ্র সেন। তারপর নিযুক্ত হয়েছিলেন রামচন্দ্র কবিরাজ (২৯ এপ্রিল ১৮১৩) ও গোবর্ধন কবিরাজ (৪ জুলাই ১৮২০) — তাঁদের মাসিক বেতন ছিল দশ টাকা। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ডাঃ টমাস লীক্ এবং ১১ আগস্ট ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ডাঃ জি. এন. চীক্ সহকারী সার্জেন পদে নিযুক্ত হওয়ার পরও তৎকালীন জেলা কর্তৃপক্ষ বেশ কিছুকাল Native-doctor বা কবিরাজ নিয়োগের নীতি অনুসরণ করে গেছেন। (সূত্র ঃ Bankura District Letters Issued, 1802-1869, Edited - Sinha & Banerjee, Page 4, 70, 79, 124, 177)।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথম পর্যায় সময়কালে বাঁকুড়া শহরে চিকিৎসারত কয়েকজন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন - রাজগ্রামের 'দাশগুপ্ত' পদবীধারী গোপাল কবিরাজ, গুপ্ত পদবীধারী পূর্ণ কবিরাজ, রামব্রহ্ম কবিরাজ, গোলকবিহারী সেনগুপ্ত ও বিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত প্রমুখ।

তৎকালীন কবিরাজদের প্রধান উপজীব্য ছিল পারদ চিকিৎসা — শোধিত পারদ ও গন্ধকের সংমিশ্রণে প্রস্তুত কজ্জলী রসায়ন প্রয়োগ করে বিভিন্ন রোগের মহৌষধি তৈরী করা হোত। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডব্লু. ডব্লু. হান্টার এ জেলার কবিরাজদের 'Native medical pracitioner' বা দেশজ চিকিৎসক নামে অভিহিত করেছেন এবং জেলার তৎকালীন সার্জেন জেনারেলের কাছ হোতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কবিরাজদের ব্যবহৃত ৬৯টি ভেষজ গাছগাছড়ার নাম উল্লেখ করেছেন। (সূত্র ঃ Statistical Accont of Bengal, Hunter, Volume IV, Page - 203, 302)। হান্টার সাহেব বাঁকুড়া জেলার কবিরাজদের জ্ঞান, দক্ষতা ও চিকিৎসা পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করলেও একথা অনস্বীকার্য যে, সমগ্র বৃটিশ যুগে জেলার আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা একটি সমান্তরাল চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবেই সমাদরে বর্তমান ছিল।

ইংরেজ আগমনের সূত্র ধরে জেলায় ইউরোপীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল। নতুন চিকিৎসা ব্যবস্থা সূচিত হওয়ার পিছনে তিনটি প্রধান কারণ বিদ্যমান ছিল — (১) নীলচাষে কর্মরত, প্রশাসনিক ও সামরিক প্রয়োজনে আগত বা বসবাসকারী ইংরেজ ও দেশীয় সিপাহীদের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে, (২) কয়েদীদের স্বাস্থ্য তথা জীবনরক্ষার জন্য সরকারী বাধ্যবাধকতা এবং (৩) সাধারণ জনস্বাস্থ্য বিষয়ক দায়িত্ব পালন। প্রায় সমগ্র উনিশ শতকে ইউরোপীয় চিকিৎসার মূল ধারা ছিল অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা নির্ভর। মোটামুটি বিশ শতকের সূচনাপর্বে অ্যালোপ্যাথির পাশাপাশি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তারপর জেলা তথা শহরের মূলকেন্দ্রে অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি - এ দুটি ধারায় ইউরোপীয় চিকিৎসার উল্লেখযোগ্য প্রসার পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসারের পশ্চাতে ছিল — (১) সরকারী উদ্যোগ (২) জেলা বোর্ডের উদ্যোগ (৩) পৌরসভার আনুকূল্য (৪) ওয়েসলিয়ান মিশন, রামকৃষ্ণ মিশন ও বাঁকুড়া সম্মিলনীর কর্মসূচী ভিত্তিক সেবাপরায়ণতা (৫) জমিদার ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের বদান্যতা (৬) গান্ধীবাদী কংগ্রেস কর্মীদের ম্যালেরিয়া বিরোধী সংগ্রাম, লোক সম্পর্ক স্থাপন ও সেবামূলক কাজ হিসাবে সুলভ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রসারে সহায়তা এবং (৭) জেলার শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে ইউরোপীয় চিকিৎসাকে পেশা হিসাবে গ্রহণের জন্য উত্তরোত্তর আগ্রহ বৃদ্ধি।

বাঁকুড়া জেলায় অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার ধারা ঠিক কখন প্রবেশ করেছিল, সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য দুর্লভ। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল আগে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা বাঁকুড়ায় প্রচলিত হয়েছিল সে সম্পর্কে একটা অনুমান করা যায় কারণ ১৮০৯ খৃষ্টাব্দেই বাঁকুড়ায় স্থাপিত হয়েছিল সিপাহী ব্যারাক হাসপাতাল — আধুনিক বাঁকুড়া গড়ে ওঠার পিছনে এ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এই হাসপাতাল ভবনেই গড়ে উঠেছিল বাঁকুড়া ফ্রি স্কুল, যা বর্তমানে জিলা স্কুল নামে পরিচিত। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা সূচনার পরবর্তী দৃঢ় পদক্ষেপ হোলো ১৮১২ খৃষ্টাব্দে কয়েদীদের জন্য নির্মিত 'ফৌজদারী জেলখানা হাসপাতাল' — এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠার মুখ্য, উদ্যোক্তা ছিলেন তৎকালীন সহকারী সিভিল সার্জেন ডাঃ টমাস লিক। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে জেলাশাসক ক্যাপ্টেন বেল জেলখানার কয়েদীদের জন্য পৃথক হাসপাতাল গড়ে তোলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের আগে এই জেলখানা হাসপাতালেই স্থাপিত হয়েছিল শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য মর্গ বা শব ব্যবচ্ছেদাগার। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এই শব ব্যবচ্ছেদাগার (স্থানীয়দের কাছে 'লাশকাটা ঘর' নামে পরিচিত ছিল, বর্তমান সি.এম.ও.এইচ. অফিসের কাছে) স্থানান্তরিত হয় জেলখানা চৌহদ্দির বাইরে।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত 'বাঁকুড়া চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী' বা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হলে স্থানীয় সাধারণ মানুষের কাছে চিকিৎসার সুযোগ সুপ্রশস্ত ও উন্মুক্ত হয়। হান্টার লিখেছেন, এই চিকিৎসালয়ে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসিত অন্তর্বিভাগীয় ও বহির্বিভাগীয় রোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৭০ জন ও ১২৭১ জন। এই চিকিৎসালয়টি স্থানীয় মানুষের কাছে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের একটি সরকারী নথি থেকে জানা যায় যে তখন বাঁকুড়ায় কোন ড্রাগিস্ট শপ্ বা ওষুধের দোকান ছিল না। (Ref. Bankura Municipal Board Proceedings, 1st April, 1871)। ১৮৬৯ সালে বাঁকুড়া টাউন কমিটি তথা পুরসভা গড়ে ওঠার পর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৬ জুন অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় পুরসভা 'বাঁকুড়া ডিসপেনসারী' নামে একটি

চিকিৎসালয় গড়ে তুলেছিল। পুরসভার এই চিকিৎসালয়টি জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাঁকুড়া পৌরসভার পরিচালনাধীন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত গুরুদাসী হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়টি বর্তমান সময়েও অত্যন্ত জনপ্রিয়তার সঙ্গে বাঁকুড়া শহরবাসী তথা পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের মানুষের সেবা করে চলেছে। ১৮৯৪-৯৫ আর্থিক বর্ষে বাঁকুড়া শহরে গড়ে উঠেছিল লেডি ডাফরিন জেনানা হাসপাতাল — যেখানে অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগের ব্যবস্থা ছিল। কাউন্টেস্ অফ্ ডাফরিন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় মহিলাদের কাছে সুচিকিৎসা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে গঠন করেছিলেন 'National Association for Supplying Medical Aid by Women to the Women of India'— এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নির্দেশে একটি তহবিল গঠিত হয়েছিল। এই তহবিলের কল্যাণে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়ায় স্থাপিত হয় 'লেডি ডাফরিন জেনানা হাসপাতাল'। এই হাসপাতালের প্রথম চিকিৎসক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন মহিলা চিকিৎসক ডাঃ হেমাঙ্গিনী কুলভী — বৃটিশ আমলে বাঁকুড়া জেলায় নিযুক্ত প্রথম ও শেষ মহিলা চিকিৎসক। শহরের স্কুলডাঙ্গা পল্লীস্থিত তাঁর বাসভবন (বর্তমান গান্ধীবিচার পরিষদের পাশে, যে বাড়ীটি এখন নিশ্চিহ্ন) ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ক্রয় করেন সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সরকার ও পৌরসভার মত ডিসপেনসারী স্থাপনের ও পরিচালনার ব্যাপারে জেলা বোর্ডেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এল.এস.এস. ও'ম্যালি তাঁর জেলা গেজেটিয়ারে লিখেছেন (পৃষ্ঠা - ৮৪) — ১৯০৬-০৭ বর্ষে জেলাবোর্ড তিনটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা কোরতো এবং দুটি চিকিৎসালয় জেলাবোর্ডের আর্থিক সাহায্য পেত। তবে জেলাবোর্ড পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয় তিনটি কোন কোন স্থানে অবস্থিত ছিল তা তিনি বলেন নি। সরকার, পুরসভা ও জেলাবোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে জেলায় মোট দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ছিল ১২টি। ইতিমধ্যে সরকার পরিচালিত বাঁকুড়া দাতব্য চিকিৎসালয়টি (যা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়) বাঁকুড়া সদর হাসপাতালে রূপান্তর লাভ করেছিল। মতান্তরে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া দাতব্য চিকিৎসালয় বাঁকুড়া সদর হাসপাতাল নামে পরিচিত হয়েছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া সদর হাসপাতাল ও বাঁকুড়া মহিলা হাসপাতালে (লেডি ডাফরিন) অন্তর্বিভাগীয় শয্যা ছিল যথাক্রমে ৩৬টি ও ২টি। ১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া পশু হাসপাতাল নির্মিত হয়েছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মহিলা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বেড়ে হয় ৪টি। ইউরোপীয়দের কাছ হতে ব্যক্তিগত চাঁদা পেত বাঁকুড়া সদর হাসপাতাল ২২ টাকা ও মহিলা হাসপাতাল ১১ টাকা। তাছাড়া পুরসভা, জেলাবোর্ড ও সরকার প্রদত্ত বার্ষিক অনুদানের (১৯৩০ খৃঃ -এর পরিসংখ্যান) পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২২৫০ টাকা ও ২৫২ টাকা, ১১৫০ টাকা ও ১০৮০ টাকা, ৬৮৪ টাকা ও ৫২৮ টাকা এবং ভারতীয় দাতারা দান করতেন যথাক্রমে ১২৯০ টাকা ও ২৭০ টাকা। অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে বার্ষিক ২৫০ ও ৭৮০১ জন এবং ১১৫ জন ও ৭৬৩৩ জন। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপনে বাঁকুড়া জেলার কয়েকজন মহতী ব্যক্তির বদান্যতা বিশেষভাবে স্মরণীয়, কিন্তু বাঁকুড়া ১নং ব্লক এলাকায় তেমন কোন চিকিৎসালয় গড়ে ওঠার তথ্য পাওয়া যায় নি। ব্লক-২ এলাকাধীন বাঁকুড়া শহরের লাগোয়া সানবান্দা গ্রামে সানবান্দা ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে গড়ে উঠেছিল 'কার্তিকচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়'।

গুটি বসন্তের আক্রমণ থেকে নাগরিকদের রক্ষা করার তাগিদে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কলকাতা মহানগরীতে টীকাকরণ পদ্ধতি চালু হয়েছিল ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে — যা বাঁকুড়া পৌর এলাকায় চালু হয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে। ১৮৭৮-৭৯ ও ১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে টীকাকরণ খাতে বাঁকুড়া পৌরসভার বাজেট বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ৩০ টাকা ও ১০০ টাকা। বসন্তরোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থার পাশাপাশি কলেরা প্রতিরোধমূল ইনোকিউলেসন্-ব্যবস্থাও পরবর্তীসময়ে প্রচলিত হয়েছিল। ১৮৭০-এর দশকে বাঁকুড়া জেলায় প্রথম ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দিয়েছিল বলে জানা যায়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে জেলাবোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত বারোটি অ্যান্টিম্যালেরিয়া সমিতি ছিল। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়ার গ্রামাঞ্চল ছিল কালাজ্বরে অত্যন্ত উপদ্রুত — সে সময় এ জেলায় কালাজ্বরের কোন ফলদায়ক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের এক রিপোর্টে দেখা যায় — বাঁকুড়া সদর হাসপাতালে যক্ষ্মা ক্লিনিক ছিল ও যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসার জন্য চারটি শয্যা ছিল।

দারিদ্র্যের মত কুষ্ঠও ছিল বাঁকুড়া জেলার জীবনে একটি বড় অভিশাপ। ডব্লু ডব্লু হান্টার ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে লিখে গেছেন, উদরাময় ও আমাশয়ের মতো 'Leprosy is common in the District'। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের District Census Report (In paragraph 25) থেকে জানা যায় ১৮৮১ ও ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জেলায় কুষ্ঠরোগজনিত অঙ্গ বৈকল্যের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৮৭৭ এবং ৩৮৯৩ জনের। বাঁকুড়া সদর ও গঙ্গাজলঘাটি থানা এলাকায় এই সংখ্যাটি ছিল বেশী। তৎকালীন জেলাশাসক এফ.এইচ.ব্যারোর মতে এর প্রধান কারণ ছিল — 'Scarcity of Green Vegetables' অর্থাৎ সবুজ শাক সব্জীর অভাব। ব্রিটিশ এম্পারার লেপ্রোসি রিলিফ অ্যাসোসিয়েশন (BELRA) নামক সংস্থার ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সমীক্ষাভিত্তিক বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী — 'Bankura got the highest leprosy-trend in the province'। ১২ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ এর বাঁকুড়া পুরবোর্ডের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে এই প্রতিষ্ঠানটির বাংলা প্রাদেশিক শাখার তহবিলে বাঁকুড়া পুরসভা এক'শ টাকা দান করেছিল।

বাঁকুড়া জেলায় কুষ্ঠরোগের ভয়াবহ প্রকোপ লক্ষ্য করে কুষ্ঠ-নিরাময়ের উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় চিকিৎসা প্রবর্তন সম্পর্কে প্রথম চিন্তাভাবনা করেছিলেন ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন সিভিল সার্জেন ডাঃ রসিকলাল মিত্র। ২০ মার্চ ১৮৭৮-এর বাঁকুড়া পুরসভার পুরবোর্ডের সভার কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে রসিকলাল মিত্রের প্রস্তাব অনুযায়ী কুষ্ঠ হাসপাতাল স্থাপনের জন্য সরাইখানাকে (বাঁকুড়া বঙ্গবিদ্যালয়ের পুরানো ভবন) পুরসভার ডিসপেনসারী কমিটির এক্তিয়ারে স্থানান্তরের জন্য জেলা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। সম্ভবত তৎকালীন জেলা প্রশাসন পুরসভার এই অনুরোধে সাড়া দেননি। অবশেষে বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে বদড়া গ্রামে (বর্তমান বাঁকুড়া ব্লক-২ অন্তর্গত) ১৯০১ খৃষ্টাব্দে 'মিশন টু লেপার্স'-এর পরিচালনায় ওয়েসলিয়ান মিশনারীদের উদ্যোগে স্থাপিত হয় — 'ব্রায়ান লেপ্রোসি হোম'। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে জেলাশাসক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের উদ্যোগে ও সভাপতিত্বে স্থাপিত হয় 'কুষ্ঠরোগ নিবারণী সমিতি' — এই সংগঠনের সদস্য ছিলেন জেলাবোর্ড ও পুরবোর্ডের প্রধানগণ ও শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। বৃটিশ এম্পায়ার লেপ্রোসি রিলিফ অ্যাসোসিয়েশন-এর ইণ্ডিয়ান কাউনিসলের বেঙ্গল ব্রাঞ্চ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়ায় একটি 'Leprosy Investigation Centre' স্থাপন করেন। এই কেন্দ্রটির কার্যকলাপ বাঁকুড়া সদর থানার আঁচুড়ি ইউনিয়ন বোর্ড (বর্তমান ব্লক-১-এ) ও জুনবেদিয়া ইউনিয়ান বোর্ড (বর্তমান ব্লক-২-এ) এর একটি অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এর প্রধান কাজ ছিল কুষ্ঠরোগাক্রান্ত রোগীদের খুঁজে বের করা – to make an epidemiological study of Leprosy। একটি চিকিৎসাকেন্দ্রও এই সংগঠনটি তৈরী করেছিল। তবে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের কোন যথাযথ ব্যবস্থা এরা গ্রহণ করেন নি।

BRITISH EMPEROR LEPROSY RELIEF ASSOCIATION (B.E.L.R.A.) নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ১৯৩০-৪০ এর দশকে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বিশেষতঃ বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় কুষ্ঠরোগ, রোগীদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা (Survey) করেন। এই নিবন্ধের কুষ্ঠরোগ সম্পর্কিত আলোচিত স্থানে BELRA-র কথা ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাঁদের রিপোর্টে তাঁরা বলেন — বাঁকুড়া শহর থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে বাঁকুড়া-ছাত্না সড়কের পাশে বাঁকুড়া-১ ব্লকের গৌরীপুর নামক মৌজার জনহীন বনজ পরিবেশে, নির্মল-বাতাসে কুষ্ঠরোগ তাড়াতাড়ি নিরাময়ের সহায়ক হবে। তাছাড়া আক্রান্ত মানুষেরা সানন্দে সেখানে থাকতে পারবেন। জনবসতি থেকে দূরবর্তী স্থান হওয়ায় রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও কমে যাবে এবং সাধারণ সুস্থ মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হবে না। এই সমীক্ষক দলে ছিলেন ক্যাপ্টেন ডাঃ এস. সি. সেন, ডাঃ প্রফুল্ল মিত্র প্রমুখ। (সূত্র - অচ্যুত শেখর ব্যানার্জী, প্রাক্তন টাইপিস্ট কাম হেডক্লার্ক, গৌরীপুর কুষ্ঠ হাসপাতাল, কমদাঘাটি, বাঁকুড়া। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শ্রী ব্যানার্জী ১ মার্চ ১৯৫০-এ গৌরীপুর কুষ্ঠ কলোনীর টাইপিস্ট পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন)। অচ্যুত শেখর ব্যানার্জীর কথায় জানা যায় কলকাতার গোবরায় অবস্থিত খৃষ্টান লেপ্রোসী হাসপাতাল (যেখানে বর্তমানে মানসিক হাসপাতাল গড়ে উঠেছে) স্থানান্তরিত হয়ে গড়ে ওঠে গৌরীপুর কুষ্ঠ কলোনী তথা হাসপাতাল। সে সময় গোবরা হাসপাতালের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট ছিলেন ডাঃ কুমুদ চক্রবর্তী।

বাঁকুড়ায় কুষ্ঠরোগ ও গৌরীপুর কুষ্ঠ কলোনী প্রসঙ্গে অমিয় কুমার ব্যানার্জী তাঁর জেলা গেজেটিয়ারের (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮) ৪৮৮ ও ৪৯৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন — সাধারণত শ্রমজীবী মানুষ বিশেষত অস্বাস্থ্যকর মাংসভক্ষণকারী মুসলিম, বাউরী ও ভূমিপুত্র আদিম-আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনের মধ্যে বাঁকুড়ায় কুষ্ঠরোগী দেখা যায়। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস — সব ধরণের কুষ্ঠরোগ ছোঁয়াচে ও বংশগত। এ প্রসঙ্গে জেলাশাসক বি. দে. বলেছিলেন — 'in khulna he found leprosy more common among the Bunas, who had migrated there from Bankura and adjoining districts among the local people'। তৎকালীন সময়ে বেশ কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা ও রাজ্যসরকার কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে এসেছিলেন — তারই ফলশ্রুতি হিসেবে বাঁকুড়া শহর থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে ৬ মাইল দূরে দেশের অন্যতম বৃহত্তম কুষ্ঠ হাসপাতাল 'গৌরীপুর লেপ্রোসি কলোনী' প্রতিষ্ঠিত হয়। রোগ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে কুষ্ঠরোগীদের জন্য বেশ কিছু কলোনী গড়ে তোলা হয়েছিল। ১৯৫০-৫১ সময়কালে গৌরীপুর কুষ্ঠ কলোনীতে ছিল ১০০ শয্যা বিশিষ্ট অন্তর্বিভাগ। ১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে সেখানে ৫৩০টি শয্যা গড়ে তোলা হয়। পুরুষ ও স্ত্রী রোগীদের জন্য পৃথক কলোনী, তাঁদের বিনোদনের ব্যবস্থা, কর্মচারী-আবাসস্থল, আধুনিক গবেষণাগার (Laboratory), সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগীদের বসবাসের পৃথক ব্যবস্থা, অ্যাম্বুলেন্স, পর্যাপ্ত জল সরবরাহ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৪৯ সালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও তৎকালীন বাঁকুড়ার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অনাথবন্ধু রায়ের সবিশেষ প্রচেষ্টায় ১৫০ একরেরও বেশী এলাকা নিয়ে বনদপ্তরের গৌরীপুর নামক জঙ্গলে মাত্র পঞ্চাশটি রোগী নিয়ে গড়ে ওঠে গৌরীপুর কুষ্ঠ কলোনী, কালক্রমে রূপায়িত হয়ে পরিচিত হয় গৌরীপুর লেপ্রোসী হাসপাতাল বা G.L.H. — এশিয়ার বৃহত্তম আবাসিক কুষ্ঠ হাসপাতাল। প্রতিষ্ঠাপর্বে কুষ্ঠকলোনীটির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন চট্টগ্রাম নিবাসী সিভিল সার্জেন ডাঃ এন. সি. দেওয়ান। পরবর্তী সময়ে যাঁরা সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদ অলংকৃত করেন, তাঁরা হলেন ডাঃ বিনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ (এপ্রিল ১৯৫০), ক্যাপ্টেন গৌরমোহন দাস ও ডাঃ কে.সি. দাস প্রমুখ — তাঁরা তিনজনেই কুষ্ঠরোগীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। কুষ্ঠকলোনীর সূচনাপর্বে এখানের হেলথ-ভিজিটর ছিলেন বাঁকুড়া নতুনচটী খৃষ্টানডাঙ্গা নিবাসী ড্যানিয়েল মল্লিক। পূর্বে উল্লিখিত সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ কে.সি. দাস কুষ্ঠাক্রান্ত মানুষজনের কাছে আত্মীয়ের মতো, বন্ধুর মতো ছিলেন। কুষ্ঠরোগীদের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ, সহানুভূতি ও সুদূর প্রসারী ভাবনায় সরকারী কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের অ্যাসিটেন্ট ডাইরেক্টর অফ্ লেপ্রোসি পদে বৃত করেন। তাঁরই সবিশেষ প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালে ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে গৌরীপুর প্রতিষ্ঠিত হয় পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট Regional Leprosy Training & Research Institute (R.L.T.R.I.) — যে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কাজ Paramedical-worker দের ট্রেনিং দেওয়া ও কুষ্ঠ বিষয়ক গবেষণা। গবেষণার কাজ নামে হলেও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কাটজু একসময় গৌরীপুর কুষ্ঠকলোনী পরিদর্শনে আসেন। তাঁর পরিদর্শনের ফলস্বরূপ কলোনীতে কুষ্ঠরোগীদের জন্য একটি বর্হিবিভাগ চালু হয়। কুষ্ঠরোগীদের সুস্থতার পর তাঁদের কর্মমুখীন রাখতে রাজ্যসরকারের অধিগৃহীত চাষোপযোগী জমিতে চাষের কাজ শুরু হয়। ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে গৌরীপুর লেপ্রোসি কলোনী নামান্তরিত হয় গৌরীপুর লেপ্রোসি হসপিটালে। পরবর্তী সময়ে রাজ্য সরকারের জনমুখী নীতির সুবাদে ও জাতীয় কুষ্ঠ উচ্ছেদ প্রকল্প (N.L.E.P. 1981) কে সফল করতে 'জেলা কুষ্ঠ সমিতি' গঠিত হয়, যা সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে চলেছে।

সূচনাপর্বে গৌরীপুর লেপ্রোসি কলোনী শুধু হাসপাতালই ছিল না, রোগীদের হাসপাতালেই আবাসিক করে রাখা হোত। তখন কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসা চালমুগরার তেল ও DAPSONE ট্যাবলেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৯৮ সাল থেকে চালু হয় 'মাল্টি ড্রাগ থেরাপি' (MDT)। MDT চিকিৎসা আসার পূর্বে কুষ্ঠ রোগের বেশ কয়েকটি Type বা শ্রেণীর জন্য আজীবন ওষুধ খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। MDT চিকিৎসা চালু হওয়ার পর কুষ্ঠরোগ দূরীকরণে অসামান্য সফলতা পাওয়া যাচ্ছে — অচিরেই হয়ত কুষ্ঠরোগ নির্মূল করার প্রয়াস বাস্তবায়িত হবে।

কুষ্ঠরোগীদের বিনোদনের স্বার্থে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাড়ী থেকে আগত কলোনীর সদস্যবৃন্দ ১৯৫১ সালে সংগঠিত করেন 'মিলন সংঘ' নামে একটি ক্লাব — যেখানে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিনোদনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। রাজ্য সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে ১৯৫৬ সালে প্রথম হাসপাতাল চত্বরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়, যদিও তার পূর্বে ১৯৫৩ সালে হাসপাতাল সীমানার বাইরে দুর্গোৎসব সূচিত হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হাসপাতাল সুপার ডাঃ পার্বতী সেন। ১৯৫৩-৫৬ সালে সূচিত হওয়া দুর্গাপূজা বর্তমানেও অনুষ্ঠিত হয়। একসময় এই হাসপাতালের চিকিৎসাধীন ছিলেন তেমন মানুষেরা সুদূর দিল্লী, গুজরাট, পাঞ্জাব ও রাজস্থান থেকেও হাসপাতালের দুর্গাপূজায় আর্থিক সহায়তা পাঠান। গৌরীপুর লেপ্রোসি কলোনী পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'নোটিফায়েড' এলাকা ঘোষিত হয়েছে ও কলোনীর আবাসিক রোগী ও কর্মীদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র নির্বাচনকেন্দ্র গঠিত হয়েছে।

২৫ জুন ২০০৭ আনন্দবাজার পত্রিকার একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় — রাজ্য সরকার কুষ্ঠ নির্মূলীকরণ প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং ৫৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারী গৌরীপুর কুষ্ঠ হাসপাতালটিকে তুলে দেওয়ারও প্রয়াস চলছে। কারণ হিসেবে রাজ্যসরকার বলেছেন — এ বছরই কুষ্ঠরোগ রাজ্য থেকে নির্মূল হয়ে যাবে।

বাঁকুড়া জেলায় অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রসারে ঐতিহাসিক সগৌরব অবদানের অধিকারী হোলো ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতাল। বাঁকুড়া সম্মিলনীর উদ্যোগে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে এই মেডিকেল স্কুল স্থাপনের পিছনে ছিল দুটি কারণ — (১) ১৯১১ খৃষ্টাব্দ বা ১৩৯৮ বঙ্গাব্দে কলকাতায় সংগঠিত হওয়ার পর বাঁকুড়া সম্মিলনী ১৯১৩-১৯২০ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়কালে বিভিন্ন ত্রাণকার্য সহ জনমুখী কর্মসূচীর মাধ্যমে বাঁকুড়ার জনগণের কাছাকাছি পৌঁছে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন — বাঁকুড়ার গ্রামীণ জনগণের সুবিধের জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত চিকিৎসক তৈরী করা অত্যন্ত জরুরী, (২) প্রতি জেলায় একটি করে মেডিকেল ইনস্টিটিউশন স্থাপনের সরকারী পরিকল্পনা। অতএব হাসপাতাল তৈরী করে বাঁকুড়া জেলা সহ প্রতিবেশী পুরুলিয়া জেলা, বিহার রাজ্যের একাংশ ও মেদিনীপুর জেলায় একাংশের মানুষজনের চিকিৎসার প্রয়োজনে ও শিক্ষিত চিকিৎসকদের জন্য ক্রমবর্ধমান দাবী মেটানোর উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতাল। মেডিকেল স্কুল ও হোস্টেল শুরু করা হয়েছিল একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে। প্রথম পর্যায়ে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিদ্যার ক্লাস হোতো বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজে। বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড এ.ই. ব্রাউন সম্মিলনী মেডিকেল স্কুলের প্রথম অবৈতনিক সুপারিনটেনডেন্ট হন। আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল মেডিকেল স্কুলের কর্মকান্ড।

অনতিকাল মধ্যে বাঁকুড়া সম্মিলনীর সহসভাপতি এবং কাশ্মীর রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রায়বাহাদুর ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের বদান্যতায় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল স্কুলের জন্য লোকপুরস্থিত 'নীলাম্বর মঞ্জিল' নামক বাগানবাড়ী ও বিস্তৃত ভূখন্ড দান হিসেবে লাভ করেন। আদিতে এই বাগানবাড়ীটি ছিল একটি নীলকুঠি। সম্মিলনী মেডিকেল স্কুল তৃতীয় বর্ষে পদার্পন করলে এবং হাসপাতাল ও ক্লিনিকস্ খোলার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতার জনৈক ব্যবসায়ী ত্রিকমদাস কুবেরজীর অর্থানুকুল্যে বহির্বিভাগ এবং ১৪টি শয্যা বিশিষ্ট অন্তর্বিভাগ খোলা হয়। চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল ডাঃ নারায়ণ রায়, ডাঃ দামোদর দাশগুপ্ত সহ চারজন। এর কিছুকাল পর মঙ্গলা দাসী নাম্নী জনৈকা মহীয়সী গ্রামীণ মহিলা ও বাঁকুড়া মহিলা সমিতির অর্থ সাহায্যে স্থাপিত হয় প্রসূতি বিভাগ। বাঁকুড়া সম্মিলনীর কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য রায়বাহাদুর হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকুল্যে প্রতিষ্ঠিত হয় 'অপারেশন থিয়েটার' — এর শিলান্যাস করেছিলেন তৎকালীন বাংলাপ্রদেশের শল্যচিকিৎসক মেজর জেনারেল বি.এস. মিলস্ (আই.এম.এস)। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির স্বার্থে ক্রমশ হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড মহিলা ওয়ার্ড ও কটেজ সমূহ স্থাপিত হয়। ছাত্রদের স্থানীয় সদর হাসপাতালেও শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছিল।

স্কুলের ছাত্রগণ যাতে L.M.F. পরীক্ষায় বসতে পারেন সেজন্য ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে Bengal Council of Medical Registration-এর কাছ হতে অস্থায়ী স্বীকৃতি পাওয়া যায়। চূড়ান্ত স্বীকৃতি মেলে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। ইতিমধ্যে বাংলা সরকার ১৯১৭-২৪ খ্রীঃ-এর ক্যাথেড্রাল সেটেলমেন্টের জন্য কেন্দুয়াডিহিতে নির্মিত যাবতীয় ইমারৎ, ঘরবাড়ী

ও বাগানবাড়ী বাঁকুড়া সম্মিলনীকে বার্ষিক ১ টাকা খাজনায় ইজারা দেওয়ায় স্কুলটি এখানে স্থানান্তরিত হয় এবং হরিতকী বাগান নামক ভূখণ্ডে বহু অর্থব্যয়ে ছাত্রাবাস নির্মিত হয়। কোতুলপুরের ধনী ব্যবসায়ী ভূতনাথ কোলে ও সুরেন্দ্রনাথ কোলের অর্থ সাহায্যে নির্মিত ৪০টি শয্যা সমন্বিত কোলে বিল্ডিং-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন ৫ জানুয়ারী ১৯৩৫, তৎকালীন বাংলার গভর্নর জন্ অ্যান্ডারসন। তারপরে নির্মিত হয় 'Isolation Block' ও রোগীর আত্মীয় স্বজনদের বসবাসের জন্য বিশ্রামগৃহ। কলকাতার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ (বর্তমানের R.G. Kar)-এর অধ্যক্ষ ডাঃ এম.এন.বোস ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে শবব্যবচ্ছেদ ভবনের উদ্বোধন করেন।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে যে ক'জন ছাত্র বাঁকুড়া মেডিকেল স্কুল থেকে L.M.F পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইউরোপিয়ান চিকিৎসা পদ্ধতিতে (অ্যালোপ্যাথিক) চিকিৎসা কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জনৈক গোকুল দাস ও হাটগ্রাম নিবাসী রামকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। State Medical Faculty of West Bengal (১ মার্চ ১৯৫০ তারিখে) প্রদত্ত একটি শংসাপত্রে পরিলক্ষিত হয় — 'Ramkinkar Chattopadhyay, who after having completed a four years course of study in medicine in the Bankura Medical School, passed the final examination of that institution .... prior to the year 1931 and has been in a practice of the Western System of medicine (Allopathy) since that year..... as qualified to practice Medicine, Surgery & Midwifery.

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মেডিকেল স্কুলে Radiology বিভাগ খোলা হলে বাঁকুড়ায় এক্স-রে করা চালু হয়।

চট্টগ্রামের যোগেশচন্দ্র দে নামক এক যুবক ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হয়ে বৃটিশ শাসন বিরোধী সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক দল গঠনে তৎপর হন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মেডিকেল স্কুলের পড়াশোনা সহ বাঁকুড়া ত্যাগের আগে প্রফুল্ল কুমার কুণ্ডু, সর্বেশ্বর ভট্টাচার্য ও জয়কৃষ্ণ দাসকে নিয়ে এই জেলায় অনুশীলন দলের একটি গোষ্ঠী তৈরী করে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে সম্মিলনী মেডিকেল স্কুলটি যে একটি সার্থক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল — ভিন্ন ভিন্ন সময়ের প্রাদেশিক ও জাতীয় স্তরের নেতৃবৃন্দ ও প্রাদেশিক গভর্নরের মন্তব্য কয়েকটি পড়লেই অনুধাবন করা যায়।

১৯২৪ খ্রীঃ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এর মন্তব্য — 'It is the first stepping stone to Swaraj in our Country'.

মহাত্মাগান্ধী ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে — 'National Institution' জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে বিদ্যালয়টির সাফল্য কামনা করেন।

লর্ড লিটন (১৯২৭) — 'I wish it a grand success'.

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (৩.৩.১৯৪০) .... যাঁহাদের অজস্র ত্যাগ ও কৃতিত্বের উপরে এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত তাঁহারা সমস্ত দেশের সাধুবাদের যোগ্য, ... মহৎ দৃষ্টান্তের মূল্যে মূল্যবান।

নেতাজী সুভাষ (২৭.০৪.১৯৪০) .... The Institution is run in an efficient manner and all those responsible for it are to be congratulated on their success. ......

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল স্কুলকে কলেজে রূপান্তরিত করার পথটিও ঐতিহাসিক ও ঘটনাবহুল। ১৯৪৮ সালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্থির করেন ভোরা কমিটির সুপারিশ কার্যকর করে মফঃস্বলের মেডিকেল স্কুলগুলিকে বন্ধ করে দেবেন, সুতরাং স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের এক প্রতিনিধি দল ২৫ জুন ১৯৪৮ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিধানচন্দ্র সেদিন প্রতিনিধি দলকে বলেছিলেন — 'তোমরা যদি ছ'লাখ টাকা আমাকে তুলে দাও আমি কলেজ করে দেব'। ১৯৫০ সালে ফার্স্ট এম.বি.বি.এস. কোর্সের জন্য অনুমোদন চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করা হয় — তখন চ্যান্সেলার ছিলেন ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী। ১৯৫১ সালের মে মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দলের 'ইনস্পেকসন'-এর রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে দু'বছরের অনুমোদন পাওয়া গেছল। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের

সেনেটও চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়ার জন্য সুপারিশ করে চ্যান্সেলারের কাছে তাঁদের লিখিত রিপোর্ট পেশ করেন। ছাত্র ভর্তি শুরু হোলো। কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দপ্তরে রহস্যজনকভাবে ফাইল চাপা পড়ে গেল। 'হিন্দুবাণী' পত্রিকায় (৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা) প্রকাশিত হোলো — 'বাঁকুড়া মেডিকেল স্কুলটিকে কলেজে পরিণত করার জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী যে চেষ্টা করিতেছিল, তাহা কে বা কাহারা বানচাল করিল তাহা জনসাধারণের জানা প্রয়োজন। ....'। অনেকে অভিযোগ তুললেন — স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে এড়িয়ে সম্মিলনী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যাওয়াতেই বিপত্তি ঘটেছে।

ফলস্বরূপ চ্যান্সেলার কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাঁকুড়া সম্মিলনীকে জানিয়ে দিলেন — 'পাঁচ বৎসরের উপযোগী খরচ চালাইবার টাকা সম্মিলনী দেখাইতে পারেন নাই বলিয়া এফিলিয়েশন দেওয়া হইবে না'। তারপর সম্মিলনী আবেদন করল ছাত্র ভর্তির সুযোগ দিতে কারণ ছাত্র ভর্তি হলেই অনুদানের অর্থ আসবে। ছ'হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর সহ এক ডেপুটেশন দেওয়া হল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। স্থানীয় হিন্দুবাণী পত্রিকায় (২০ অক্টোবর ১৯৫৪) লেখা হল — 'বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ লইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার রসিকতা শুরু করিয়াছেন'। চলল বহু লড়াই, সংগ্রাম ও টানাপোড়েন। অবশেষে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারীর অনুষ্ঠিত সভায় সেনেট বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজকে এম.বি.বি.এস. কোর্স পঠন-পাঠনের জন্য স্থায়ী অনুমোদন প্রদান করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাঁকুড়া পৌরসভার সদস্যবৃন্দ ও পৌরপ্রধানগণ অনেকেই বাঁকুড়া সম্মিলনীর সূচনাপর্ব থেকেই এর কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থেকে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে রেখেছিলেন। সম্মিলনী মেডিকেল স্কুলের একটি আসন (কোটা) বাঁকুড়া পৌরসভা মনোনীত গরীব মেধাবী ছাত্রের জন্য বরাদ্দ ছিল। ১৯ এপ্রিল ১৯২৬ থেকে পৌরসভা মনোনীত দু'জন সদস্য - জিতেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও একজন সিভিল সার্জেন মেডিকেল স্কুল কমিটির মেম্বার ছিলেন। পৌরসভার একটি প্রস্তাব ছিল সদর হাসপাতালের সঙ্গে লোকপুর হাসপাতালকে একত্রীকরণ করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করা হোক — যা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। 'এ মিলান অ্যান্ড কোম্পানি' সম্মিলনী মেডিকেল স্কুলকে একটি অ্যাম্বুলেন্স দান করেন ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে। সেটি রাখতে একটি গ্যারেজ ও ড্রাইভারের কোয়ার্টারের জন্য ৭ মে ১৯২৭ পৌরসভাকে সম্মিলনীর সম্পাদক একটি চিঠি দেন। এই চিঠির প্রেক্ষিতে পৌরসভা সিদ্ধান্ত নেয় — 'For a provision of a garrage and drivers quarter to the Ambulance, presented by M/S A. Millan & Co., Resolved that the Municipality can arrange for a garrage only without any responsibility to the Municipality'. পৌরসভার কাছে মেডিকেল স্কুল কর্তৃপক্ষ পৌরকর মুকুব-এর জন্য আবেদন করলে (২৭.০৬.১৯৩১) — পৌরসভা কর্তৃক ১৬০ টাকা মুকুব করার তথ্য পাওয়া যায়। ফার্ণিচার তৈরীর জন্য পৌরসভা বেশ কিছু শাল ও সেগুন গাছ মেডিকেল স্কুলকে দান করে সে সিদ্ধান্তও পৌরবোর্ডের সভার সিদ্ধান্তে পাওয়া যায়। সম্মিলনী মেডিকেল স্কুলকে একটি শববাহক গাড়ী দেওয়ার সিদ্ধান্ত পৌরসভার নথিতে মেলে। পৌরসভার সুপারিশক্রমে যাঁরা মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন তাঁরা হলেন — সুখময় রক্ষিত (১৯৩৪ খ্রীঃ), সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জীর ছেলে ২৮.০৬.১৯৩৫ (ছাত্রের নামের উল্লেখ নেই) এবং ২৬ জুন ১৯৩৬-এ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও নীহারকান্তি রায়।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে অনুমোদন লাভের পর বাঁকুড়ার সম্মিলনী মেডিকেল স্কুল মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত হওয়ার পরবর্তী সময়ে ছাত্রসংখ্যা পঞ্চাশ জনে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর পনের লক্ষ টাকার প্রয়োজন দেখা দিলে স্থানীয় শুভানুধ্যায়ীবর্গ ও স্কুলের অধ্যাপকমণ্ডলীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় তা সংগৃহীত হয়। সূচনাপর্বে মেডিকেল কলেজ রাজ্যসরকারের সবিশেষ আর্থিক সাহায্য না পাওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ হোতে অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করতে হোত এবং তাছাড়া ক্যাপিটেশন ফি বা ডোনেশান-এর ভিত্তিতে ছাত্রভর্তির নীতিও গ্রহণ করতে হয়েছিল। ডোনেশান নেওয়ার গৃহীত নীতির ফলে অন্ধ্রপ্রদেশের বহু ছাত্র এই কলেজে পড়াশোনা করতো। ক্যাপিটেশন ফি নেওয়ার নীতির বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ক্রমাগত সরকারী অধিগ্রহণের দাবীতে উত্তাল ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হলে ১৯৬১ সালের ৪ জুন রাজ্যসরকার কলেজটিকে অধিগ্রহণ করতে বাধ্য

হয়। তখন থেকে কলেজটি সরকারী মেডিকেল কলেজরূপে পরিচালিত হয়ে আসছে। কলেজে পাঁচ বছর মেয়াদী এম.বি.বি.এস কোর্সে পঞ্চাশ জন ছাত্র ভর্তি করা হোত। তাছাড়া Pre Registration Clinical Attendants (P.R.C.A.) কোর্সে আরো কয়েকজন ছাত্র ছ'মাসের জন্য ভর্তি করা হোত। এই কলেজ থেকে উত্তীর্ণ MBBS কিছু ছাত্রকে House-Surgeon হিসেবেও নিয়োগ করা হোত। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ১৩১টি শয্যা বিশিষ্ট জেলা হাসপাতাল — কলেজ হাসপাতালের সঙ্গে সংযুক্ত করলে মোট শয্যা সংখ্যা হয় ৩৪৪টি। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে এই মেডিকেল কলেজটির ২টি ছাত্রাবাস ছিল — একটি ছিল ১৫৬ জন ছাত্রের এবং অন্যটি ৯ জন ছাত্রীর জন্য বরাদ্দ ছিল। বস্তুত বিংশ শতাব্দীতে বাঁকুড়াবাসীর কর্মকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হোলো বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে আবির্ভূত বাঁকুড়া জেলার যে তিনজন যশস্বী চিকিৎসকের নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, তাঁরা হলেন বাঁকুড়া পুরসভার প্রাক্তন পৌরপ্রধান ও তৎকালীন বাঁকুড়ার প্রখ্যাত আইনজীবী রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ডাঃ চন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে L.M.S. পাশ করেন ও তিনি ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহপাঠী), ডাঃ তারিনী চরণ দাস, এল.এম.এস এবং ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল থেকে এল.এম.পি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ডাঃ বৈকুণ্ঠনাথ মিত্র — তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সংসার ত্যাগ করে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমা সারদার মন্ত্রশিষ্য হন ও রামকৃষ্ণ সংঘে যোগ দেন এবং পরবর্তীকালে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসেবেও তিনি সুদূরবিস্তৃত খ্যাতি অর্জন করে স্বনামধন্য হয়েছিলেন।

পরবর্তী দশকের প্রথম দিকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে উত্তীর্ণ, বাঁকুড়ার প্রথম এম.বি. ডিগ্রীধারী চিকিৎসক ডাঃ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (এম.বি. কালী নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন) বাঁকুড়া শহরের কুচকুচিয়া পল্লীতে প্র্যাকটিশ শুরু করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তাঁর সুযোগ্য পুত্র ডাঃ ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বাঁকুড়ার প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক ও মেডিকেল কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আমরুল গ্রাম নিবাসী) ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি. পাশ করেন — তিনি বাঁকুড়া জেলায় কখনো প্র্যাকটিশ না করলেও বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল স্কুলকে কলেজে উন্নীত করার পিছনে তাঁর অবদান স্মরণীয়। বাঁকুড়া হেলনা শুশুনিয়া গ্রামের বাসিন্দা স্ত্রীরোগে পারদর্শী ডাঃ রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতার কারমাইকেল কলেজ থেকে এম.বি. পাশ করে বাঁকুড়ায় সাফল্যের সঙ্গে প্র্যাকটিশ করেছেন ও বাঁকুড়া মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক চিকিৎসকও ছিলেন। ডাঃ হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, প্রসিদ্ধ ভারততত্ত্ববিদ অবিনাশচন্দ্র দাসের পুত্র ডাঃ লক্ষ্মীনারায়ণ দাস [বাঁকুড়া জেলার একমাত্র এম.এস.সি (ফিজিওলজি) এম.বি ডিগ্রীধারী চিকিৎসক], রাজগ্রামের ডাঃ হর্ষগোপাল কুন্ডু - চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক-চিকিৎসক ডাঃ অনাথবন্ধু রায় (রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী), ডাঃ দুর্গাদাস গুপ্ত, শল্য চিকিৎসক ডাঃ ক্ষুদিরাম দে, ডাঃ রামরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রামকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ডাঃ পার্বতীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রখ্যাত চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অবনী ভট্টাচার্য (বাঁকুড়ার প্রাক্তন পৌরপ্রধান), ডাঃ ভোলানাথ হালদার, বাঁকুড়া-১ এর আঁধারথোল গ্রাম (পরবর্তীকালে শহরের শিখরিয়া পাড়ায়) নিবাসী ডাঃ বিজয় মণ্ডল (প্রাক্তন সাংসদ) প্রমুখ চিকিৎসকগণ বাঁকুড়া চিকিৎসা জগতের এক স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করেছিলেন — সম্মিলনী মেডিকেল স্কুল ও কলেজকে সমৃদ্ধতর করার পিছনে যাঁদের অবদান চিরস্মরণীয়। কুমিদ্যা গ্রামের এল.এম.এফ. চিকিৎসক বেচারাম চৌধুরী প্রাক্স্বাধীনতা পর্বের গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য নাম।

ইউরোপীয় চিকিৎসার আরেকটি ধারা ছিল হোমিওপ্যাথি। ১৮৯৭-১৯০৮ খ্রীঃ সময়কাল পর্যন্ত বাঁকুড়া ব্রাহ্ম সমাজের পরিচালক পদে আসীন মহেশচন্দ্র ঘোষকে বাঁকুড়া সদরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পথিকৃৎ বলা চলে। পরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দেন ডাঃ বৈকুণ্ঠনাথ মিত্র — এল.এম.পি. বা রামকৃষ্ণ মিশনের 'ডাক্তার মহারাজ', বাঁকুড়ায় সশস্ত্র বৈপ্লবিক রাজনীতির অন্যতম কর্মী ডাঃ রামদাস চক্রবর্তী (বা রামদাস পালোয়ান) ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ ভবানী কিঙ্কর চক্রবর্তী, ডাঃ চৈতন্যময় মণ্ডল, ডাঃ হরশঙ্কর রায়, রবার্ট ক্রিশ্চান ও তাঁর পুত্র জ্যাকব খ্রিশ্চান প্রমুখ।

বাঁকুড়া জেলায় ইউরোপীয় চিকিৎসা সাম্রাজ্যবাদের স্পর্শমুক্ত ছিল না। কারণ সেনা-ছাউনি ছিল এর সূতিকাগার, প্রশাসনিক প্রয়োজন ছিল এর স্থায়িত্বের মেরুদন্ড আর ইংল্যান্ডের কারখানাজাত ওষুধের ভারতীয় বাজারের প্রত্যন্ত অংশও ছিল এর ভূখণ্ড। তবে জনস্বাস্থ্যের প্রশ্নও উপেক্ষিত হয়নি। উনিশ শতকের প্রথম দশকে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রচলনের সুনির্দ্দিষ্ট তথ্য আছে। হোমিওপ্যাথির সূচনা ঘটেছিল আরো প্রায় এক'শ বছর পর। সরকারী নীতি ও প্রশাসনিক উদ্যোগ, স্বায়ত্তশাসিত জেলাবোর্ড ও পুরসভার প্রচেষ্টা, মিশনারী ও বাঁকুড়া সম্মিলনীর প্রয়াস, স্বল্পসংখ্যক জনহিতৈষী ব্যক্তির বদান্যতা, জেলার মেধাবী যুব-সম্প্রদায়ের ইউরোপীয় চিকিৎসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী প্রভৃতি অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা প্রসারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

বাঁকুড়ার কয়েকজন বিশিষ্ট সমাজসেবী জেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজসচেতনতার বৃদ্ধি সহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'বাঁকুড়া উন্নয়নী' নামক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭। বাঁকুড়া উন্নয়নীর মহতী উদ্যোগেই পৌর এলাকার প্রান্তে পোয়াবাগান অঞ্চলে ত্রিশ একর জমিতে গড়ে ওঠে "ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ" — বিশিষ্ট সমাজসেবী অশ্বিনী পতির দানকৃত সাড়ে চার একর ও বাকী সাড়ে পঁচিশ একর জমি প্রদান করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বাঁকুড়ার আপামর জনসাধারণের আর্থিক দানে (দানমেলার মাধ্যমে সংগৃহীত) ও জেলা পরিকল্পনা পর্ষদের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয় — 'বাঁকুড়া উন্নয়নী ইনস্টিটিউট অফ্ ইঞ্জিনিয়ারিং' — যা বাঁকুড়ার মানুষের বহুস্বপ্ন ও আশা আকাঙ্খায় পূর্ণতা এনে দিয়েছে।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন জনপ্রিয় কিংবদন্তী মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটির উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন বাঁকুড়া উন্নয়নীর সভাপতি এবং তৎকালীন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও বর্তমান বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে, তৎকালীন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দিলীপকুমার বসু, বাঁকুড়া উন্নয়নীর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অচিন্ত্যকৃষ্ণ রায়, সভাধিপতি তরুবালা বিশ্বাস, জেলাশাসক রিনচেন টেম্পো, সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া, সমাজসেবী অশ্বিনী পতি, মন্ত্রী উপেন কিস্কু, প্রাক্তন সভাধিপতি ও শিক্ষাবিদ জ্ঞানশংকর মিত্র ও বাঁকুড়া উন্নয়নীর সহসভাপতি ও সমাজসেবী অমিয় পাত্র প্রমুখ। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটির ক্লাস শুরু হয় ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮। এই প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টাশান্, ইলেকট্রোনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন — এই চারটি বিষয়ের পাঠক্রম রয়েছে। অচিরেই ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ সূচিত হবে বলে বর্তমান কলেজ কর্তৃপক্ষ মনে করেন। পড়াশোনা, প্রশাসনিক সহ বহুক্ষেত্রেই দুর্গাপুরের আর.ই. কলেজ ও খড়্গপুরের আই.আই.টি প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্য করে থাকে। কলেজের গ্রন্থাগারে প্রায় ১৭৫৬৩টি বই (নব্বই শতাংশ বই অ্যাকাডেমিক ও এক শতাংশ অন্যান্য) এবং ৪৯ রকমের 'জার্নাল' আছে — যা ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পাঠক্রমে সাহায্য করে। প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফলও সন্তোষজনক। স্বনির্ভর বিকাশের স্বার্থে ও আভ্যন্তরীন বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বলতম প্রতিষ্ঠান হোল বাঁকুড়া উন্নয়নী ইনস্টিটিউট অফ্ ইঞ্জিনিয়ারিং।

উপনিবেশিক শাসনকালে মোহনলাল গোয়েঙ্কা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কেঞ্জাকুড়ার মধুবনে উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং জেলাবোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত কেঞ্জাকুড়া উচ্চবিদ্যালয় ও হেলনাশুশুনিয়া উচ্চবিদ্যালয় প্রাকস্বাধীনতা পর্বে বাঁকুড়া-১ ব্লকের গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষাবিস্তারের উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

অতীতের গড়ে ওঠা বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল স্কুল তথা কলেজ থেকে বর্তমান সময়কালের উন্নয়নী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গঠিত হওয়া — এসব প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছে জেলার বহুমুখী ও সার্বিক উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে। প্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে বাঁকুড়াবাসীকে সমগ্র রাজ্য তথা দেশে এক মর্যাদাপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই কলেজগুলি হোল স্বাবলম্বন ও সহযোগিতার এক গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত — যা বাঁকুড়াবাসীর কর্মকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে জেলার ইতিহাসে লেখা থাকবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। অধ্যাপক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাঁকুড়া

২। ডাঃ ভৈরব মণ্ডল, বাঁকুড়া

৩। ডাঃ অমিতাভ চট্টরাজ, বাঁকুড়া

৪। শ্রী অচ্যুতশেখর ব্যানার্জী, কদমাঘাটি, বাঁকুড়া

৫। অধ্যাপক অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, বাঁকুড়া

৬। শ্রী অরিন্দম ঘোষ, প্রতাপবাগান, বাঁকুড়া

৭। শ্রী শ্যামাশঙ্কর বরাট, বাঁকুড়া

৮। শ্রীমতি নিবেদিতা চক্রবর্তী, কুচকুচিয়া রোড, বাঁকুড়া

সহায়ক পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ ঃ

১। বাঁকুড়া জনের ইতিহাস ও সংস্কৃতি - রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী

২। বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার - অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। প্রবাসী পত্রিকা - আষাঢ় ১৩৩০

৪। হিন্দুবাণী পত্রিকা - ৮ম সংখ্যা ১৩৬১

৫। 'বাঁকুড়ার খেয়ালী' ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা-র বিভিন্ন প্রবন্ধ সংকলন

৬। সহায়ক গ্রন্থাগার - পশ্চিমরাঢ় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র, কেন্দুয়াডিহি, বাঁকুড়া

লোকায়ত শিল্প

অচিন্ত্য জানা

মনুষ্য সমাজে লোকায়ত জীবন ধারায় লোকশিল্প তথা কারু ও চারু কলার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে মানুষের পেটের ক্ষুধা নিবারণ করে অন্যদিকে মানুষের মনের ক্ষুধা দূর করে। সেই আদিম মানুষ যেদিন লতাপাতা ডালপালা দিয়ে কুঁড়ে ঘর বানিয়ে বসবাস শুরু করল, কুঁড়ে ঘরের সামনে পরিষ্কার করে লতাপাতা এঁকে দিল, সন্ধ্যায় সবাই একসাথে মিলে নাচে গানে, আনন্দে শিকার বা শ্রমের ক্লান্তি দূর করতে শিখলো, সেইদিন থেকে শুরু হল লোকায়ত জীবনধারা। পুরাতন প্রস্তর যুগ, নব্যপ্রস্তর যুগ, নবপোলিয় যুগ এবং ধাতুযুগ মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে লোকায়ত জীবন ধারায় গ্রহণ-বর্জন এবং নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ এগিয়ে এসেছে। লোকায়ত জীবনধারাকে কেন্দ্র করে জীবনধারণ এবং আত্মরক্ষার তাগিদে মানুষ প্রকৃতির দরবারে সহজলভ্য বস্তুগুলোকে কাজে লাগাতে শুরু করে। হাতের কাছে পাথর, মাটি, কাঠ, বাঁশ, লতাপাতা যা পেয়েছে সে সব কাজে লাগিয়েছে তৈরি করেছে নানা দ্রব্য সামগ্রী। কালের গতিতে যুগের পরিবর্তনের সাথে নূতন নূতন লোকশিল্পের সৃষ্টির ফলে বহু পুরাতন শিল্প সামগ্রী কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে ও যাচ্ছে। গ্রামীন জীবনে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে লোকায়ত শিল্প তথা কারু ও চারুকলার গুরুত্ব অসীম।

এখন আমরা লোকসংস্কৃতির আকর ভূমি বাঁকুড়া জেলার ২২টি ব্লকের মধ্যে বাঁকুড়া-১ ব্লকের লোকায়ত শিল্পের অনুসন্ধানে আসব। প্রাচীনকাল থেকে দীর্ঘদিন ধরে বাঁকুড়া তথা রাঢ়ভূম অরণ্য সম্পদে পূর্ণ ছিল ফলে এই জেলার কারুশিল্পের সৃষ্টি ও প্রসার ঘটে। পুরাতন খড়ের বাটালির কাঠামো, কাঠের দরজা, জানালা, আটচালা, খাট, পালঙ্ক, সিন্দুক প্রভৃতি আসবাবপত্র তার প্রমান।

বাঁকুড়া-১ ব্লকে কারুশিল্পের জন্য স্থানীয়ভাবে যে সমস্ত উপাদান দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায় সেগুলো হল জুল-গোঙ্গা, শর বা খাগড়া গাছ, কাশ, খড়, তালপাতা, খেজুর পাতা, শালপাতা, গমের খাড়ি, বাঁশ-কাঠ প্রভৃতি। হাঁড়ি, কলসী তৈরির জন্য মাটি, চুনের জন্য ঘুটিং পাথর প্রভৃতি। শোলা শিল্পের জন্য শোলা বাইরে থেকে কিনে আনতে হয়। মিষ্টান্ন শিল্পের জন্য দুধ এলাকায় উৎপাদিত হয়। ধাতু শিল্পের জন্য লোহা, কাঁসা, পিতল, সোনা, রূপা সবই আমদানি করতে হয়। বাদ্যযন্ত্রের জন্য চামড়া স্বল্প পরিমাণে স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায়। এখন বাঁকুড়া-১ ব্লকের শিল্পের কথা উল্লেখ করা যাক।

ঝাঁটা শিল্প ঃ- ঝাঁটা বিষয়টা খুবই ক্ষুদ্র। কিন্তু ঘরদোর, রাস্তা-ঘাট, অফিস-আদালত, রেলষ্টেশন প্রভৃতি স্থানকে ধূলো, ময়লা, আবর্জনা মুক্ত করতে এর ভূমিকা কম নয়। নারিকেল ঝাঁটা, খেজুর ঝাঁটা, বাঁশের ঝাঁটা। প্রচলন খুবই প্রাচীন অধুনা যুক্ত হয়েছে ফুলঝাঁটা। এখন এক একটি ফুলঝাঁটার দাম ১৫/১৬ টাকা। কিন্তু গ্রামে গঞ্জে বিশেষ করে সাঁওতাল পল্লীতে মেয়েরা তন, বাদাড়, মাঠের আল, ডুংরী, ডহর থেকে জুলগোঙা, শর, কাশ প্রভৃতি গাছ সংগ্রহ করে ঝাঁটা বেঁধে ব্যবহার করে আসছেন যুগ যুগ ধরে। খুব কম লোকই তার খবর রাখে। সংসারে ঝাঁটার জন্য পয়সা খরচ করতে হয় না। আবার কেউ কেউ এইসব ঝাঁটা বিক্রি করে গরীব সংসারে দুটো টাকা কামায়। কালপাথর, আঁধারথোল অঞ্চলে, কেঞ্জাকুড়া অঞ্চলে, তাঁতকানালী, ধবার গ্রাম, তুলসী প্রভৃতি গ্রামের মেয়েরা এই ধরণের ঝাঁটা বেঁধে থাকে।

খেজুর পাতার ঝাঁটা খুবই টেকসই এবং ঝাঁট দেওয়ার কাজে খুবই ভাল বিশেষ করে ঘরের মেঝেয়। খেজুর পাতা মেসিনে চেরাই করে খুব পোক্তাভাবে বাঁধাই করে বাজারে ৬/৭ টাকা দামে বিক্রি হচ্ছে।

চাটাই শিল্প ঃ- তালপাতা এবং খেজুর পাতার তৈরি চাটাই বা তালুই এর ব্যবহার আছে। সাঁওতাল পল্লীতে ব্যবহার বেশি। তবে অন্যান্য সমাজেও এর ব্যবহার যথেষ্ট। কালপাথর, কুমিদ্যা এবং কেঞ্জাকুড়া অঞ্চলে গ্রামের মেয়েরা অবসর সময়ে তৈরি করে। কেউ কেউ বিক্রিও করে। মোলবনার চম্পাশীট এবং প্রতিমা শীট তাল এবং খেজুর পাতার চাটাই বুনে। এ গ্রামে খড়ের চাটাই বুনে শ্যামল ভূঁই, পূর্ণ শীট।

হাতপাখা ঃ- শহরে বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহৃত হলেও গ্রামের মানুষের সম্বল হাতপাখা। হাত পাখাও তালপাতার সবচেয়ে ভাল হয়। তবে গমের খাড়ি দিয়ে পাখা তৈরি করে মোলবনার দুর্গা ভূঁই, তাপসী শীট প্রভৃতি মেয়েরা। তাঁতকানালী, ধোবারগ্রাম, তুলসী প্রভৃতি গ্রামে ঘোং তৈরি করা হয়। বর্ষায় মাথায় ঘোং দিয়ে কৃষক মাঠে চাষ করে। তুলসী গ্রামে লখীরাম হাঁসদা তালপাতার ঘোং বুনে। একসময় লখীরাম হাঁসদা কাঠের পুতুল তৈরি করে নাচাতো। দামোদরপুরের কালিন্দীপাড়া বাঁশ থেকে চাঁচ তৈরীর কাজে বংশপরম্পরায় জড়িত।

মোলবনায় ডাকের গহনা বা শোলার শিল্প তৈরি হয়। শিল্পী মীতা মহন্ত, অমর মহন্ত এবং স্বপন মহন্ত। মোলবনায় এবং কেঞ্জাকুড়ায় ঘুটিং চুন তৈরি করা হয়। মোলবনায় ৪টি পরিবার ঘুটিং চুন তৈরি করে কেঞ্জাকুড়ায় লোহার পাড়ায় চম্পা লোহার তৈরি করে ঘুটিং চুন। মোলবনায় এক ঘর মুচির বাস, খোলা, তবলা এবং ডগির ছাউনী দেওয়া হয় এখানে। বাঁকুড়া-১ ব্লকে বিভিন্ন জায়গায় পূজা পার্ব্বনে কাঁটা মাটির দেহদেবী গড়া হয়। মোলবনার দেবজিত মণ্ডল মাটির প্রতিমা বিভিন্ন সময় গড়ে থাকে। মোলবনার শম্ভু কারক, গুরুপদ মণ্ডল, তারাপদ দে, লালমোহন দাস প্রভৃতি শিল্পী, লাঙ্গল, মই, জোয়াল প্রভৃতি চাষের সরঞ্জাম তৈরি করে থাকে।

কালপাথর আঁধারথোল ও কেঞ্জাকুড়া অঞ্চলে সাঁওতাল পল্লীগুলিতে সাঁওতাল সম্প্রদায় তীর, ধনুক এবং গুলতি নিজেরা তৈরি করে। তাছাড়া ধামসা, মাদল, বাঁশী প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র সাঁওতালগণ নিজেরা তৈরি করে থাকেন। সাঁওতাল সমাজে উল্কির প্রচলন উঠে গেলেও গ্রামেগঞ্জে কচ্চিৎ দেখা যায়। দেওয়ালচিত্র, আলপনা প্রভৃতি আঁকা সাঁওতালদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এইসব শিল্প কাটের জন্য মেয়েরা-ছেলেরা নিজেরাই শিকে নেয়। এর জন্য কোন প্রতিষ্ঠানে শিখতে যেতে হয় না। রমনীদের হাতের টানেই শিল্প-সৌন্দর্য ফুটে উঠে।

মৎস্য শিকার বা মাছ ধরার সরঞ্জামকে কেন্দ্র করে কেঞ্জাকুড়া, মোলবনা, পাতাকোলা, বেলিয়াডিহি প্রভৃতি গ্রামে বেশ কিছু শিল্প গড়ে উঠেছে। কেঞ্জাকুড়ার মেটিয়াকুল্যা পাড়ায় ৫০টি জেলেদের বাস। এদের সবার জীবিকা, জালবুনা, জাল বিক্রি করা, জাল ভাড়ায় খাটানো, মাছ ধরা, মাছ বিক্রি করা আর চাষের সময় কিছু চাষের কাজ করা। খেয়াজাল, বাটাই জাল, লম্বা জাল, ঘুন জাল, গেতুই জাল প্রভৃতি এখানে তৈরি হয়। কেঞ্জাকুড়ায় লোহার পাড়ায় সুধীর লোহার, সাধন লোহার, শ্রীদাম লোহার প্রভৃতি কয়েকজন মাছ ধরা এবং জাল বুনার কাজ করে থাকেন। মোলবনায়ও কয়েকজন জাল বুনে মাছ ধরে, মোলবনায় মাছধরা ঘুনি বুনে সুধাংশু বাউরী, সাধন শীট, শক্তিপদ শীট, মাণিক সাঁতরা, পশুরাম সাঁতরা প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, বিশ্বনাথ মণ্ডল, বাঁশের কাঠি এবং তালপাতার শির দিয়ে মাছ ধরার এক ধরণের সরঞ্জাম বুনে। কেঞ্জাকুড়ায় এবং পাতাকোলায় জেলেদের দুটি সমবায় সমিতি ছিল। তুলে দেওয়া হয়েছে। মাছ ধরা ঘুনি শিল্পের রমরমা ব্যবসা চলে বেলিয়াডিহি গ্রামে। ঐ গ্রামের অজিত দাস, তারাপদ দাস, ফটিক দাস, জয়দেব দাস, পবিত্র দাস, কালীপদ দাস, বাসুদেব দাস, দিলীপ দাস প্রভৃতি শিল্পীগণ ঘুনি বুনা কাজে লিপ্ত। ব্যবসা চলে জৈষ্ঠ মাস থেকে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত। মূল বাজার শুনুকপাহাড়ীর হাট।

এই বেলিয়াডিহি গ্রামে প্রায় সারা বছর ধরে তৈরি করা হয় পাটের দড়ি। পাটের দড়ি দিয়ে তৈরি হয় কুয়োর জল তোলা দড়ি, গরু, ছাগল বাঁধা দড়ি ও খাটের ছাউনীর জন্য দড়ি। এখানে পাট দিয়ে আসন তৈরি করা হয়। পাটের দড়ির সতরঞ্জিও তৈরি করা হয়। কেঞ্জাকুড়া অঞ্চলে মোলবনায়ও পাটের দড়ির কাজ করেন সদর সাঁতরা, গোপাল সাঁতরা, গোরাচাঁদ পাল প্রভৃতি শিল্পীগণ। সৌখিন খাট-ছাওয়ার কাজ করেন মোলবনার পবিত্র মণ্ডল, শ্যামল পাল,

ভজন মণ্ডল প্রভৃতি ব্যক্তিগণ।

মাটি হল সহজলভ্য এবং প্রায়ই বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ মাটির ঘরে বাস করে। পৃথিবীর বৃহত্তম মাটির প্রাসাদ হল পশ্চিম আফ্রিকার মালির জেনে শহরে। ইয়েমেনের রাজধানীসানায় দশতলার মাটির আকাশচুম্বী বেশ কয়েকটি অট্টালিকা এখনও বিদ্যমান। লোকায়ত জীবনধারায় কুমোরের চাকা আবিষ্কার এক যুগান্তকারী ঘটনা। সেই চাকার গতিই এনে দিয়েছে মানব সভ্যতার অগ্রগতি। মাটির তৈরি হাঁড়ি, কলসী, পাত্র নানা ধরণের মূর্তি আগুনে পুড়িয়ে ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল থেকে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং নানা ধাতুর আবিষ্কারের ফলে পোড়া মাটির ব্যবহার দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে। ফলে সমাজে কুম্ভকার সমাজের জীবন জীবিকার উপর আঘাত আসছে। কুম্ভকারগণ সমাজ থেকে হটে যাচ্ছে। বাঁকুড়া-১ ব্লকে কেঞ্জাকুড়া, মোলবনা, জগদল্লা প্রভৃতি স্থানে কিছু কুমোরের বাস। বর্তমান এই শিল্পটি সংকটের মুখে, কুমোর শ্রেণী তাদের পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশা ধরছে।

পূর্ব্বেই পলেছি বাঁকুড়ায় একদা কারুশিল্পের বেশ রমরমা ছিল। এখনও বিভিন্ন গ্রামে কাঠের মিস্ত্রি, সুত্রধরগণ জানালা, দরজা, চৌকাঠ, খাট, পালঙ্ক, প্রভৃতি তৈরি করেন। কেঞ্জাকুড়া নিমাই সুত্রধর কাঠের মূর্তি গড়েন, সিমেন্টেরও মূর্তি গড়তে পারেন। জগদল্লার মিতন সুত্রধর প্রথমে আসবাবপত্র তৈরি করতেন।

বাঁকুড়ায় লোকায়ত শিল্প তালিকায় কারুশিল্প তথা কাঠের ঘোড়ার প্রবেশ গত শতাব্দীর ছয়ের দশকে তৎকালীন শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক পরিমল দাসের ঐকান্তিক চেষ্টায়। পাঁচমুড়া এবং সেন্দড়া পোড়ামাটির ঘোড়ার আদলে তৈরি করা হল কাঠের ঘোড়া, পরিমল দাসের উদ্যোগে প্রথম কাঠের ঘোড়া তৈরি করেন ফুলকুসমার মকর রঞ্জন কর্মকার এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন জগদল্লার মিতন সুত্রধর। বর্তমানে কাঠের ঘোড়া বাঁকুড়ার বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হচ্ছে। মিতন সুত্রধরের কাছ থেকে জগদলারই এক প্রতিবন্ধী ছেলে তপন গরাই ঘোড়া তৈরির কাজ শিখেছে। বাঁশীর তিনজন ছেলে ট্রেনিং নিয়েছে এবং কাঠের ঘোড়া তৈরির কাজ শিখেছে।

বাঁশ শিল্প ঃ- কাঠের পর বাঁশের স্থান। বাঁশের তৈরি ঘর, বাড়ি, লাঠি, বাঁশী, ধনুক, আঁকশি, মই, সিঁড়ি, কপাট, ঝুড়ি, ছিপ, ফুলসাজি, ঘুনি, জোয়াল প্রভৃতি নানা সাবেকী দ্রব্য সামগ্রী এখনও মানুষ ব্যবহার করে। লোকশিল্পের সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত হয়েছে নূতন নূতন চিন্তা ভাবনা। শিল্প নৈপুণ্য বর্তমানে বাঁশ থেকে নানা শিল্প তৈরি করা হচ্ছে। বাঁশের সাবেকী দ্রব্য সামগ্রীর সঙ্গে ডোমদের জীবন এবং জীবিকা জড়িয়ে আছে। "আগডুম-বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে, ঝাঁজ কাঁসার ঘন্টা বাজে" এর সেদিন নেই। অভাব অনটন, দুঃখ, দৈন্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, ডোমদের নিত্য সঙ্গী কেঞ্জাকুড়ায় ডোমপাড়ায় গেছিলাম। দেখা হল কালো কালিন্দী, বয়স ৮০, তবলাবাদক মদন কালিন্দী, ঝুমর ও সংকীর্তন গায়ক, আদিত্য কালিন্দী, ঢাক বাদক, সুধীর কালিন্দী, শানাই বাদক, মনসা মেলায় বসে একটি ঝুমুর গান ও শুনালো। ডোমশ্রেণী যে কত পিছিয়ে আছে তা ওদের পাড়ায় গিয়ে বুঝা যায়। পরিবারের সংখ্যা ১৫, সবার কুঁড়ে ঘর। এদের প্রধান জীবিকা বাঁশের সেই সাবেকী কাজ, বাঁশের ঝুড়ি, কুলো, সাজি, টোকা, চালধুয়া, বাঁশের ছাতা, ভোগের ডালি প্রভৃতি এদের হাতের কাজ। কেউ কেউ চাটাইও বুনে থাকে। নামসংকীর্তনের দল আছে। ঢাক বাজাই এরও দল আছে। এদের ঢাকশিল্পীর সংখ্যা প্রায় ৩০ জন। নিজেরাই ঢাক তৈরি করে। কাছে মোলবনা - মোলবনাতেও ডোমদের বাস। এখানেও বাঁশের ঝুড়ি, কুলো প্রভৃতি তৈরি করা হয়। তাছাড়া বাঁকুড়া-১ নং ব্লকে আরো অন্যান্য গ্রামে ডোমদের বাস। এখানে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে। দামোদরপুরের কালিন্দীরা বাঁশের চাঁচ তৈরী করে।

কেঞ্জাকুড়ায় এক অবাক কাণ্ড ঘটিয়েছে কেঞ্জাকুড়ারই সন্তান ছান্দারের অভিব্যক্তির প্রথম ছাত্র সুধাংশু চন্দ। ঘর সাজাবার এবং উৎসব অনুষ্ঠানে উপহার দিবার বাঁশের তৈরি নানা শিল্প সামগ্রী তৈরির প্রয়াস সুধাংশু চন্দের। বাঁশের তৈরি শিল্পজাত দ্রব্যের তালিকা দিলে একটি পুস্তক হয়ে যাবে, হাতি, ঘোড়া হরিণ, গরুরগাড়ী, ধূপদানি, পালকী, নৌকা বজরা, গৌরনিতাই, যীশু, সারদা, রামকৃষ্ণ, কালীয়দমন কি নয় সবই বাঁশ শিল্পের অন্তর্গত। বর্তমানে কেঞ্জাকুড়ায় সুধাংশুর প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে ত্রিনেত্রী শিল্পাশ্রম। বাঁকুড়া জেলায় ঘর সাজানো বাঁশশিল্পকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ব্লকে এই শিল্পের পরিবেশ গড়ে উঠেছে। জেলা রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরে এই শিল্পের বাজার তৈরি য়েছে। কেঞ্জাকুড়ায়

এই শিল্পের সংস্থা গড়ে উঠেছে। মাঝখানে ১৫টি সংস্থা গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে ১০/১২টি সংস্থা কেঞ্জাকুড়ায় এই শিল্পের উপর ২৫০টি পরিবার নির্ভরশীল। বছরে ১০/১২ লক্ষ টাকার কাজ হয়। সরকারী বা বেসরকারীভাবে একটু প্রচার পেলে, প্রদর্শনী করলে এই শিল্পের জনপ্রিয়তা চারদিকে ছড়িয়ে যাবে।

কাঁসার বাসন শিল্প ঃ- কাঁসার বাসন বাঁকুড়া জেলার একটি প্রাচীন শিল্প। সারা বাঁকুড়া জেলায় কাঁসার বাসন — ঘটি, বাটি, থালা, কলসী, গ্লাস, হাঁড়ি, কড়াই, বালতি প্রভৃতি বহু গৃহস্থালী দ্রব্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা হত। বর্তমানে চ্যালোমিথিয়াম, ষ্টেনলেসষ্টীল, ফাইবার প্রভৃতির দ্রব্য সামগ্রীর সৃষ্টি এবং কাঁসার বাসনের মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় চাহিদা অনেক কমে গেছে। চাহিদা কমায় উৎপাদনও কমে যাচ্ছে। ফলে এই শিল্প থেকে মালিক এবং শ্রমিক উভয়েই সরেযাচ্ছে। তবে আগেকার মত শ্রমিককে আর পিটাই করতে হয় না। এখন মেসিনের সাহায্যে কাঁসার পাত তৈরি করা হয়।

বাঁকুড়া-১ ব্লকে কেঞ্জাকুড়া এবং হেলনা শুশুনিয়ায় কাঁসার বাসন শিল্পের শাল আছে। কেঞ্জাকুড়ার মহাদেব কাইতি জানালেন কাঁসা বাসন শিল্পের উপর কেঞ্জাকুড়ায় ৬০০ পরিবার নির্ভর করে। এদের মধ্যে কেউ কেনাবেচা করে আবার কেউ কেউ উৎপাদনও করে। ২৫০টি শাল রয়েছে। কাঁসার পাত তৈরি করার বড় চারটি কারখানা রয়েছে। প্রতি শালে ৭/৮ জন শ্রমিক কাজ করে। ২০ কেজি বাসন তৈরি করতে ৭জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। মাসে ১০/১৫ দিন শ্রমিকগণ কাজ করে। কেঞ্জাকুড়ার লোহার সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ বাসন শিল্পের শ্রমিক হিসাবে যুক্ত হয়েছে।

তবে কাঁসার বাসনের মন্দা বা ভাটার ফলে কর্মকারদের মধ্যে অনেকে বাঁশ শিল্পের সাথে যুক্ত হয়েছেন। অনেকে বঁড়শি শিল্পের সাথেও যুক্ত আছেন। বঁড়শি শিল্পের মূল কেন্দ্র বড়জোড়া ব্লকের ঘুটগড়িয়া সেখান থেকে মহাজন এসে কাঁচা মাল দাদন করে এবং ফিনিশিং বঁড়শি নিয়ে যায়। হেলনা শুশুনিয়া-কেঞ্জাকুড়ার অনেক পরিবার বঁড়শি তৈরীর সাথে জড়িত।

বাঁকুড়া-১ ব্লকে কেঞ্জাকুড়া, বেলিয়াডিহি প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে বেলমালার কাজ হয়। বেলিয়াডিহির মহন্তদের কয়েকটি পরিবার বেলমালার কাজ করে। কেঞ্জাকুড়ায় অলঙ্কার সোনা এবং রূপার দোকান এবং স্বর্ণশিল্পী রয়েছেন। এখানে সোনা-রূপার গহনা তৈরি এবং খরিদ বিক্রি হয়।

মিষ্টান্ন শিল্পের অনুসন্ধানে গেছিলাম বিশ্বকর্মা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে। মাণিক, নিমাই কর্মকারের সাথে আলাপ হয়। নিজেরাই খাটাখাটনি করে দোকান পরিচালনা করেন। কারিগর অশোক ভুঁই। এই দোকানের বৈশিষ্ট্য হল উৎকৃষ্ট মানের প্যাড়া আর কেঞ্জাকুড়ার সবচেয়ে বিখ্যাত মিষ্টি হল জিলাপি। এক একটি জিলাপির ওজন আড়াই কেজি। বিশ্বকর্মা পূজার দিন বিক্রি হয়। প্রায় সব মিষ্টির দোকানে পাওয়া যায়। ঐ দিনে একটি একটি দোকানে জিলাপি বিক্রি হয় দু-কুইন্টল - আড়াই কুইন্টল।

তাঁত শিল্প ঃ- অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত বাঁকুড়া জেলার দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে রাজগ্রাম, কেঞ্জাকুড়া প্রভৃতি স্থানে বন্দর ছিল। কৃষিজাত, শিল্পজাত দ্রব্য পিতল কাঁসার বাসন, তাঁতবস্ত্র প্রভৃতি নৌকায় করে ঘাঁটালে পাঠানো হত। বিনিময়ে আনা হত তুলা, সুতা, মশলা এবং বাসনত্র এবং লোহার সরঞ্জাম তৈরির কাঁচামাল। একদা বাঁকুড়া জেলা তাঁত শিল্পের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৩২টি তন্তুবায় সমবায় সমিতি ছিল কিন্তু হায় সেই কেঞ্জাকুড়া উইভার্স সোসাইটি, পুরানো দামোদরপুর তন্তুবায় সমিতি এবং রাজগ্রাম কো-অপারেটিভ সোসাইটি আজ ধুকছে। একদিন এই সমিতির অধিনে ৪০০টি তাঁত চলত। সেখানে ১৫০টি তাঁত কোনরকম চলছে। সমিতির টাকার অভাবে কর্মচারীদের বেতন ৫/৬ মাস দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কর্মচারীদের ৫/৬ বছরের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা জমা দেওয়া হয়নি। দোকানে কাপড় নাই। বিক্রি বন্ধ, উৎপাদন বন্ধ। এককথায় বাঁকুড়া ব্লক-১ তথা বাঁকুড়া জেলায় তাঁত শিল্প ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে। তাঁতিদের অবস্থা চরম সীমানায় পৌচেছে।

কিন্তু কেন এই অবস্থা হল? এর জন্য দায়ী কে বা কারা? অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে প্রায় সবাই কমবেশী

দায়ী। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিগত দিনের বস্ত্রনীতি যেমন দায়ী তেমনি তখনকার রাজ্য সরকারের ভুল সিদ্ধান্তও দায়ী। সাথে শিল্পী মহলও দায়ী। বাঁকুড়া জেলায় লুঙ্গী, গামছা, বেড্‌সীট, বেড্‌কভার ছাড়া ফাইন সুতার কাপড় বুনার ক্ষেত্রে শিল্পীগণ এগিয়ে আসেননি। লুঙ্গি, গামছার সীমাবদ্ধ থেকেছেন। লুঙ্গি গামছা থেকে যে বাণী বা মজুরী পাওয়া যায় তা দিয়ে সপরিবারে বাঁচা যায় না। দ্বিতীয়ত বাণী প্রদানের মধ্যে ত্রুটি। কাপড় বুনার যে বাণী দেওয়া হয় তা কেবল একজন শিল্পীর মজুরী। সেই কাপড়ে তাঁতির পরিবারের পারিবারিক শ্রমের মূল্য ধরা হয়না। কাজেই পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দিয়ে থাকেন। তৃতীয়ত অন্যান্য রাজ্য যেখানে পাওয়ারলুমের উপর ভিত্তি করে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে গেল সেখানে আমাদের তাঁতিরা হস্তচালিত তাঁতকে আঁকড়ে ধরে থাকল। ফলে আমাদের রাজ্যে তন্তুজ, তন্তুশ্রী, চরম অবস্থায় উপস্থিত হল। তাঁতিদের অবস্থাও তাই হল। তবে একথা ঠিক বাঁকুড়ার তাঁতি এবং তাঁত শিল্প ধ্বংসের মুখে।

এতক্ষণ আমরা বাঁকুড়া-১ ব্লকের অন্তর্গত লোকায়ত ধারা কারুশিল্পের কথা আলোচনা করলাম। এসবই বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত। কিন্তু আমাদের এসব খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ আর এক শিল্পধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন সেসব কথা না বললে বিষয়টি সম্পূর্ণ হবে না। তা হল বাককেন্দ্রিক এবং অঙ্গভঙ্গ কেন্দ্রিক লোকশিল্প। লোকসংস্কৃতির আকরভূমি বাঁকুড়া জেলার লোকায়েত জীবনধারার সাথে সম্পৃক্ত ধারাগুলিও এখানে বিদ্যমান। তাই এই এলাকায় কান পাতলে যেমন শুনতে পাওয়া যায় ভাদু, তুষু, ঝুমুর, বাউল, মনসার গান, বালিকা সঙ্গীত, কীর্তন, ঢাকের ঢাইকুড়, কুড় বাদ্য তেমনি শোনা যায়। আদিবাসী সাঁওতালদের মাদলের মনমাতানো ধিতাং, ধিতাং বোল্, সাঁওতালী গান — করম, বাহা, সহরায়, দং, লাগড়ে, পাতা, ডাহার আরো কতকি। এখানে যেমন অ-আদিবাসীদের কাঠি নাচ, ঢাক নৃত্য আছে তমনি সাঁওতালদের রয়েছে কারাম নৃত্য, নাটুয়া নৃত্য, ভূপ্ নৃত্য, দাঁসায় নৃত্য, বাহা, সহরায়, দং, খোগড়ে, পাতা, ডাহার প্রভৃতি নৃত্য। তবে এসিব লোক আঙ্গিকের প্রাধান্য, কালপাথর, কেঞ্জাকুড়া এবং আঁধারথোল অঞ্চলে।

এত সরে মধ্যে যে কথাটা বলা জরুরী তা হল আমাদের এই লোকায়ত জীবনধারার উপর বিশ্বায়নের বিষময় প্রভাব। বিশেষ করে মালটি মিডিয়া মাধ্যমগুলি যেভা আমাদের হেঁসেল ঘরে ঢুকে পড়ছে আমাদের শিল্প সংস্কৃতির উপর নগ্ন আক্রমন চালাচ্ছে শেষ পর্য্যন্ত আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে পারবো তো? আমাদের আশা আমরা টিকে থাকব। লড়াই-এ আমরা জিতব। আমাদের রাজ্যে, জেলায় গ্রামেগঞ্জে লোকশিল্পী এবং আদিবাসী শিল্পীগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। গঠিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘ। আমাদের জয় নিশ্চয়।

তথ্যসূত্র ঃ

১। বাঁকুড়ার অর্থনীতিতে লোকশিল্প
২। রাঢ় সংস্কৃতির আঙ্গিনায় বাঁকুড়া
৩। ক্ষেত্র সমীক্ষা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

১। ধীরেন্দ্রনাথ কর।
২। মেঘদূত ভুঁই।
৩। নন্দলাল লোহার।
৪। অজিত দাস।
৫। কালো কালিন্দী।
৬। নিমাই কর্মকার।
৭। মহাদেব কাইতি।
৮। সুধাংশু চন্দ।

বাঁকুড়ার ভূস্বামী ও বিশিষ্ট পরিবার ঃ প্রসঙ্গ ব্লক-১

অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

'ভূস্বামী' শব্দটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ১৮৮৫ সালে প্রণীত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে। ভূস্বামী বলতে বোঝান হয়েছে যে ব্যক্তি প্রজাস্বত্বর ঠিক উপরিস্থ স্বত্বর অধিকারী। এই অর্থে সরকারও একজন ভূস্বামী। জমিদার, তালুকদার ও প্রোপাইটার নিয়ে তৈরি ত্রিভূজ ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সিস্টেমে। এদেরকেই ল্যাণ্ডলর্ড বা ভূস্বামী বলা হয়েছে। জমিদারদের নীচে ছিল পত্তনিদার, দার পত্তনিদার, ইজারাদার ও খণ্ডের জমিদাররা। হিন্দু সভ্যতায় 'জমিদার' অর্থাৎ স্বত্বভোগী ভূস্বামী প্রায় ছিল না। সেন রাজারা রাজস্ব নেওয়া শুরু করেছিলেন নগদ বা মুদ্রায়। মুসলমান যুগে 'জায়গীরদার' নামে সর্বপ্রথম ভূস্বামী শ্রেণির সৃষ্টি হল। পরে পেশকাশ, ইজারাদার, মুকদ্দমা শ্রেণির সৃষ্টি। মুসলমান আমলে এই চারশ্রেণির ভূস্বামী পাই - (১) জমিদার (২) জাগীরদার (৩) ইজারাদার (৪) মুকদ্দম। এরপর এল ইংরেজ। দশসালা বন্দোবস্তের পর চালু হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

বাঁকুড়া জেলার সৃষ্টি ১৮৮১ সালে। ১৮৩২ সালে 'সমাহর্তা' বা কালেক্টর হয়ে আসেন হরচন্দ্র ঘোষ। তিনি ছ' বছর বাঁকুড়ায় ছিলেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ হয় এখানকার অসভ্য বাসিন্দাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে, না হলে তারা সরকারকে অহঃরহ বিব্রত করবে, শাসনকাজ চালাতে দেবে না। হরচন্দ্র নিজের চেষ্টায় একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করে চালাতে থাকেন। তিনি বাঁকুড়ায় ইংরেজি শিক্ষার বীজ প্রথম রোপন করেন জিলাস্কুল (১৮৪০) তৈরির আগেই। লক্ষ্যণীয় যে, জমিদারদের 'ম্যানেজ করা' বা সৃষ্টি করার কাজে প্রথম যুগে বাঁকুড়ায় সরকারকে খাটতে হয়নি। এর কারণ আমাদের মনে হয়েছে (১) ইংরেজ সৃষ্ট জমিদার ও মুসলমান সৃষ্ট 'জাগীরদার' বাঁকুড়ায় ছিল না। স্বাধীন হিন্দু নরপতি ছিলেন বিষ্ণুপুর, ছাত্না, অম্বিকানগর, রাইপুর, খাতড়ার সামন্ত রাজারা। বিষ্ণুপুর জমিদারি ধ্বংস হয় চৈতন্য সিংহের আমলে ঊনিশ শতকে। ইংরেজ সরকার ও তাদের উৎপাদিত জমিদার বর্ধমান রাজা এই ধ্বংসে মুখ্য ভূমিকা নেয়। বাঁকুড়া শহর ছিল ছাত্না ও মল্লভূমের অধীনে। একতেশ্বর শিবমন্দির ছিল তাঁদের 'বর্ডার'। (২) এই জমিদারগণ হয়তো উচ্চবর্ণের ছিলেন। কিন্তু নামেই, আসলে এঁরা ছিলেন নিম্নবর্গের বাউরি-বাগদি-সিং-চুয়াড় শ্রেণির প্রতিনিধি। বহিরাগত ব্রাহ্মণ-বৈশ্য আচরণ ও অত্যাচার সেই অর্থে ছিল না। শাসক-শাসিত সমধর্মী ছিল। তাই প্রজাবিদ্রোহ ছিল না। বরঞ্চ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহে এই জমিদারেরা নেতৃত্ব দিয়ে হতশ্রী ছিলেন। যেমন, বিষ্ণুপুরের মাধোসিংহ, চৈতন্য সিংহ, রাইপুরের দুর্জন সিংহ ইত্যাদি। তাই বাঁকুড়াতে ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের আগেই জমিদারদের নেতৃত্বে সাঁওতালদের বিদ্রোহ ঘটেছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে। (৩) বাঁকুড়াতে নীলবিদ্রোহ জাতীয় কৃষক বিদ্রোহ না ঘটলেও, ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধের আগেই জমিদারদের শক্তি হ্রাস পেয়েছিল ইংরেজের চাপে। বিষ্ণুপুরকে দুর্বল করতে বাঁকুড়া শহরকে সদর কেন্দ্র করা হয়েছিল। ফলে হরচন্দ্রের আমলে জমিদারদের নিয়ে সরকারকে বাঁকুড়া শহর এলাকায় তেমন চিন্তিত হতে হয়নি। চিন্তা হয়েছে প্রজাদের হাঙ্গামা নিয়েও নয়, অসভ্য অধিবাসীদের হাঙ্গামা নিয়ে।

ইংরেজ প্রসাদপুষ্ট বর্ধমান রাজের গ্রাসে চলে যায় সারা বাঁকুড়ার জমি। বর্ধমান রাজা আবার সৃষ্টি করেন পত্তনি জমিদারদের। যেমন কোতুলপুরের ভদ্র পরিবার, হদলনারায়ণপুরের মণ্ডল পরিবার ইত্যাদি। এর পাশাপাশি এরা কিনে নেন মল্ল আমলের ছোটো-ছোটো ঘাটোয়ালী জমিদারীগুলি। জমিদারী ঘাটোয়ালী বলতে জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগী

সৃষ্টি ঘাটোয়ালী বোঝাত। বিষ্ণুপুর রাজত্বের আর্থিক মেরুদণ্ড ছিল ঘাটোয়ালী প্রথা।

বাঁকুড়ায় ইংরেজ আমল পর্যন্ত প্রধানত দু শ্রেণির ভূস্বামীর আধিক্য ছিল (১) ঘাটোয়ালী (২) পত্তনিদার। এছাড়া আরও একশ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল। তাঁরা হলেন ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবি একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এঁরা কিছু জমিজায়গা কিনেছিলেন নিজেদের চেষ্টায় ইংরেজকে খুশি রেখে। যেমন - অযোধ্যার গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শহরের সাহানা পরিবার ইত্যাদি। তাই, ইংরেজ আমলে সৃষ্ট বাঁকুড়ার ভূস্বামী বলতে আমরা এই নতুন ভূমিপতিদেরও ধরব। এঁদের বাড়ি থেকেই জন্ম নিয়েছিলেন নব বাঁকুড়া নির্মাণের কারিগররা। তাই এঁরা ভূস্বামীর পরিচয় ছাড়িয়ে বিশিষ্ট পরিবার রূপেই আজও পরিচিত হয়ে আছেন। লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর সাধনা এঁদের পরিবারে একসাথে মিলে গিয়েছিল।

ইংরেজ আমল পূর্ববর্তী ভূস্বামী ও বিশিষ্ট পরিবার

শহরের পাঠকপাড়ায় প্রথম ব্রাহ্মণ বসতি ঘটে মানসিংহের আমলে। অনুমান করি যে, তার আগে কচ্ছপের খোলাকৃতি শহর বাঁকুড়ায় অব্রাহ্মণ আগমন ঘটেছে, অনার্য বসতিও ছিল। প্রমাণ পাই 'সিনী' ঠাকুরের থানের অস্তিত্বে। গন্ধেশ্বরীর তীরবর্তী পাঠকপাড়া-রামপুরেই দেবসেবক ব্রাহ্মণদের বসতি স্থাপন হয় ষোড়শ শতকে বা তার আগে। শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ইঙ্গিত করেছেন মানসিংহের সময়ে। রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রকাশিত 'দেশাবলিবিবৃতি'তে পাঠকপাড়াকে 'বাঙালগ্রাম' বলা হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে যে সমস্ত কাগজপত্র রয়েছে তার একটি (পড়চা বা চিঠির মতো) হল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে (১৮১৫-১৮২০ খ্রীঃ) লেখা। তাতে পাচ্ছি একজন ভূস্বামী এবং তাঁর কিছু জমিজায়গা পুষ্করিণীর বিবরণ। সম্ভবত মল্ল আমলে দেবোত্তর সম্পত্তি এরা পেয়েছিলেন। তাঁর নাম হল — 'মহামহিম মধুসূদন বাঙাল'। মধুসূদনের প্রচুর সম্পত্তি যে ছিল এ কাগজ পড়েই বোঝা যায়। পাঠকপাড়ার অনুপম প্রাচীন মন্দিরটি এই বংশেরই তৈরি। বাংলাদেশ (বঙ্গ) তেকে রাঢ়ে এসেছিলেন বলেই এঁদের পদবি ছিল বাঙাল। পাঠকপাড়ার বর্তমান চট্টোপাধ্যায়রা কি এদের শাখা?

রামপুরে জিতরাম মিশ্ররা এসেছিলেন এই সময়ের হয়তো একটু পরেই। তাঁদের বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রঘুনাথ জিউ মন্দির। পরিবারটি ধনে-মানে পুরনো বাঁকুড়ার সুপরিচিত বংশগুলির অন্যতম। এই বংশের আশুতোষ মিশ্র দান-ধ্যানে বিখ্যাত ছিলেন। আশুতোষ মিশ্র তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট গুরুসদয় দত্তের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করেন বাঁকুড়া মাতৃভক্তি প্রচার সমিতি। ফটোগ্রাফার অজিত মিশ্র আশুতোষের সন্তান। প্রাক্তন বিধায়ক কাশীনাথ মিশ্রের পিতা রামগোপাল মিশ্র সেবাকাজে তিরিশের দশকে চিনে গিয়েছিলেন ডঃ কোটনিসের সহযোগী হয়ে। সেবা কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তদানিন্তন ভারত সরকার তাঁকে 'কাইজার-ই-হিন্দ' পদকে ভূষিত করেন। বাঁকুড়া শহরের আগেই রাজগ্রামের পত্তন ঘটে। রাজগ্রাম ছিল প্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদ ও জলপথের গুরুত্বপূর্ণ ঘাট। পুরুলিয়া ও বিহার ওড়িশায় ব্যবসা করার এটি ছিল কেন্দ্র। বাংলাদেশের প্রাচীন রাজবংশ যে কটি ছিল তারমধ্যে একটি হল ছাত্না। সামন্তভূম ছাত্না রাজার অধীন গ্রাম ছিল এটি। রাজার অনুগ্রহ ও আগ্রহে রাজগ্রামে যে ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপন হয় তারই পরবর্তী কালে ভূস্বামী হন। রাজপ্রদত্ত ভূমি পেয়েছিলেন প্রচুর। রাজগ্রামে হাট বসত বিশাল। তাতে প্রচুর টাকার কেনাবেচা চলত। সেই ব্যবসার কাজে রাজগ্রামের দত্ত সহ কয়েকটি পরিবার বর্ধিষ্ণু হয়েছিল। রাজহাট থেকে তাম্বুলীদের কুণ্ডু পদবীধারীরা এসেছিলেন। এর্যা বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ করেন। দুর্গা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন কৃষ্ণদাস চট্টরাজ এই চট্টরাজ বংশের প্রথম পুরুষ যিনি রাজগ্রামে রাজ অনুগ্রহে প্রথম বাসিন্দা হন। চট্টরাজদের কুলদেবতা রঘুনাথ। এই বংশের শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় ভূস্বামী হয়েছিলেন। রাজহাট থেকে রাজগ্রামে তাম্বুল ও নুনের ব্যবসা করতে এসে ধনী হয়েছিলেন চৈতন্য কুণ্ডু। এই পরিবারের শিবচরণ কুণ্ডু মদন মোহন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিছু ভূ-সম্পত্তিও দান করেছিলেন। এই বংশেরই কেদার কুণ্ডু পরবর্তীকালে আর্থিক সাহায্য ও ভূমিদান করেন 'রাজগ্রাম বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন'কে। ১৯৪০ সালে এই স্কুল প্রবেশিকা পড়ানর অনুমোদন পায়। পরবর্তী অধ্যায়ে সে প্রসঙ্গ আলোচিত হবে।

বাঁকুড়া শহরের অগেই সম্ভবত ব্রাহ্মণ বসতি ঘটে পশ্চিম সানাবাঁধে। সানাবাঁধে আজও ধ্বংসপ্রায় মন্দিরগুলি এই অস্তিত্ব জানান দেয়। পশ্চিম থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে আসার পথটি ছিল সানাবাঁধের ওপর দিয়ে। পশ্চিমা

লালা শ্রেণি অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে দলে দলে রাজগ্রামে আসত, বিষ্ণুপুর যেত এর ওপর দিয়ে। সেই লালাদের চটি বা বিশ্রামস্থল ছিল এখানে। তারা সঙ্গে এনেছিল 'রাধাবল্লভ জিউ' বিগ্রহ। সেটি সানাবাঁধে তারা স্থাপন করেছিল। দেবপুজোর জন্য বাইরে থেকে এনেছিল ব্রাহ্মণ পুরোহিত। সেই থেকে সূচনা ঘটেছিল ব্রাহ্মণ বাসের। কিন্তু লালারা ছিল বহিরাগত। তাদের জমিজায়গা ছিল না। সে কারণেই সানাবাঁধে ভূস্বামী বা জমিদারের কোনও অস্তিত্বই ছিল না, ইংরেজ আমলেও হয়নি। তবু উনিশ শতকের আধুনিক শিক্ষাগ্রহণে এই গ্রাম প্রথম সারিতে এগিয়ে এসেছিল।

তাঁতবস্ত্রের কারণে যেমন, তেমনি অন্যান্য ব্যবসায় কেঞ্জাকুড়া ছিল সমৃদ্ধ কেন্দ্র। উরাম্যা-পাপুড়দা-গোপালপুর-মোলবনা ছিল অনার্য অধ্যুষিত। সেই অর্থে ব্রাহ্মণ আগমন ঘটেছে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এগুলিতে। বাদুল্লাড়া গ্রামে 'বাসলী' ঠাকুর ছিল বলে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেছেন। আমরা অনুসন্ধান করে বাউরিদের আদিকালে পূজিত এক গ্রামদেবতার সন্ধান পেয়েছি। 'লাড়া' শব্দ থেকে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব এ গ্রামে টের পাওয়া যায়। বাদুল্লাড়াতে সেই অর্থে অস্ট্রিকগোষ্ঠীর অনার্য শ্রেণিরই আদিবাস যে ছিল তা বলা যায়। মুসলমান আমলের শেষদিকে (অনুমান) এ গ্রামে মসজিদটি নির্মান হয়েছিল বলে ধারণা। যোগেশচন্দ্র বলেছেন বাসলী দেবী ছিলেন বাদুল্লাড়া ও জলহরিতে। আমরা অনুসন্ধান করে পেয়েছি সেটি হল বলারডিহি মৌজার ঝোপের ভেতর 'বলারডি' বলে এক গ্রামদেবতা।

দেবোত্তর জমি জিরেতের বাইরে ব্লক-একের গ্রামগুলিতে ছিল ঘাটোয়াল জমির মালিকরা। এরা সবাই ছিলেন ক্ষত্রিয়-শূদ্র-সাঁওতাল। বাগদি-শুঁড়ি-সাঁওতালরা ঘাটোয়াল ছিল। কিন্তু ম্যাক আলপিন সহ বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা যায় এদের হাত থেকে জমি বিক্রি হয়ে অল্পকালের মধ্যেই চলে যায় অন্য শ্রেণির হাতে। কালপাথর ও পাশাপাশি গ্রামগুলির মণ্ডল (শুঁড়ি)-বাগ-প্রামাণিক-সাহানা পদবির তপশিলী সম্প্রদায় জমির স্বত্বাধিকারী হয়েছে আধুনিক কালে। ১৯১১-১৯২২ সারে মধ্যে বারবার দুর্ভিক্ষে এই গ্রামগুলিতে না খেয়ে কত মানুষ মারা গিয়েছিল তার সংখ্যা নেই। 'প্রবাসী' পত্রিকার চিত্রটি আমি প্রমাণ হিসেবে তুলে দিচ্ছি পরিশিষ্টে। আঁধারথোল এলাকায় ঘাটোয়ালী সম্পত্তি ছিল। হেলনা শুশুনিয়া এলাকা ছিল আটবাইচণ্ডী পর্যন্ত ঘাটোয়াল জমিদারি।

আঁধারথোল-খাপ-শ্যামপুর ইত্যাদি গ্রামগুলিতে চাষআবাদ সেকালে ভালো ছিল না। বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এখানে শিক্ষার প্রসার শুরু হয়। ডাঃ রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ বিজয় মণ্ডলেরা সংসদীয় রাজনীতিতে এসেছিলেন এই এলাকার বাসিন্দারূপে।

ইংরেজ রাজত্বকালে শহর বাঁকুড়ার ভূস্বামী ও বিশিষ্ট পরিবারবর্গ

প্রকৃত অর্থে বাঁকুড়ায় ইংরেজ রাজত্বের রমরমার শুরু ১৮৪০ সাল থেকে। কারণ ১৮৪০ সালেই বাঁকুড়ায় প্রথম ইংরেজি স্কুলের পত্তন হয়। তার আগে শহরে টোল-মক্তব-মাদ্রাসা এবং দশেরবাঁধের পাড়ে একটি বঙ্গবিদ্যালয় ছিল বলে জানা যায়। মুসলমান আমলে যে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি ফার্সি শিখে নিজেদের অস্তিত্ব ধরে রেখেছিল, তারাই ইংরেজ আমলে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করল আগে। স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজ রাজত্বের শুরুতেই এদের প্রতিষ্ঠা আগে ঘটেছে।

বাঁকুড়া জেলার সবচেয়ে বিশিষ্ট পরিবারটি হল পাঠকপাড়ার ভট্টাচার্য বংশ। গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্যের পূর্বপুরুষ ফার্সি ও সংস্কৃত দুই শিক্ষাতে পণ্ডিত ছিলেন। গঙ্গানারায়ণ নিজেও ছিলেন বেদজ্ঞ-সংস্কৃত পণ্ডিত। তাঁর ছেলেরা ইংরেজ আমলে যশস্বী হয়েছিলেন। এক ছেলে ডেপুটি হন। তিনি রামসদন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন গঙ্গানারায়ণ চতুষ্পাঠী ও গুরুদাসী দাতব্য চিকিৎসালয়। চিকিৎসালয়টি চালাতে রামসদন মোটা অংকের টাকা (৩০ হাজার টাকা) কাগজপত্র সহ পৌরসভার হাতে তুলে দেন বলে রামানুজ কর জানিয়েছেন।

এই বংশের সন্তান রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়। বসন্তকুমার উচ্চ সরকারি পদে দিল্লি-পাঞ্জাব প্রভৃতি জায়গায় চাকরি করেছেন। একাধিক বই লিখেছেন তিনি, উল্লেখযোগ্য হল 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি'। বসন্তকুমার হলেন রামসদনের মধ্যম পুত্র। জ্যেষ্ঠ বিজয়কৃষ্ণ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন। কনিষ্ঠ

পুত্র সুকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৩-১৯৪৮) ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্তা, লেখক, বাঁকুড়া সম্মিলনী ও বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বসন্ত কুমারের ছেলেরা বাংলাদেশে বিখ্যাত হয়েছিলেন। একজন হলেন কবি কামাখ্যা প্রসাদ, অন্যজন দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। রামানন্দের দুই ছেলে অশোক চট্টোপাধ্যায় ও কেদার ছিলেন সাহিত্যিক ও সাহিত্যসেবী। শনিবারের চিঠি, প্রবাসী, মডার্নরিভিয়ু প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনায় তাঁরা জড়িত ছিলেন। রামানন্দ কন্যা সীতা ও শান্তাদেবী ছিলেন সু-সাহিত্যিক এবং বাঁকুড়া জেলার প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট।

ময়নাপুরের নন্দ বংশের তারিণী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাঁকুড়া শহরে আসেন ওকালতি করতে। কাজি মহল্লায় তিনি বাড়ি করেছিলেন। তাঁর এক পুত্র জগদানন্দ বাংলাদেশে 'গজদানন্দ' নামে কুখ্যাত হন নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনে জড়িত হয়ে। এই বংশের পরবর্তী বংশধরেরা শিক্ষা-দীক্ষায় জেলায় উচ্চ সুনামের অধিকারী হয়েছিলেন। দ্যোতিনীপ্রসাদ এই বংশের সন্তান।

তৃতীয় পরিবারটি হল 'বাঁকুড়া দর্পণ' পত্রিকা সম্পাদক রামনাথ মুখোপাধ্যায়দের মুখুজ্জে বংশ। মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্থাপন করেন মুখার্জি প্রেস। সেখান থেকে ১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয় বাঁকুড়ার প্রথম সাময়িক পত্র 'বাঁকুড়া দর্পণ'। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত সেটি প্রকাশিত হয়েছিল রামরবি মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। রামনাথ বাঁকুড়ার প্রচুর সামাজিক কাজে যুক্ত ছিলেন - খ্রিশ্চান কলেজ প্রতিষ্ঠা, স্বদেশি স্টোর চালু ইত্যাদি। কালীতলার নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেযুগের বিশিষ্ট ব্যক্তি। নবগোপাল বাবু পৌরসভার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

নতুনচটির বাসিন্দা দাসবংশের নাম উল্লেখযোগ্য। কোতুলপুর থেকে ব্যবসার কাজে এসে নতুনচটির বাসিন্দা হন ঠাকুরদাস। পশ্চিমে ব্যবসা করে তিনি প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক হন। তাঁর ছেলে হরিচরণ দাস। তিনি জেলা স্কুলের পণ্ডিত হন এবং পরবর্তীকালে শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্তা হয়ে নানা রাজ্যে চাকরি করেন। জেলাস্কুল থেকেই হরিচরণ ইংরেজি পড়ে এন্ট্রান্স পাশ করেছিলেন। এরপর ভরতি হন কৃষ্ণনগর কলেজে। কাকাটিয়া গ্রামের যদুনাথ রায়, ময়নাপুরের শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায় ও হরিচরণ তখন পায়ে হেঁটে পড়তে যেতেন কৃষ্ণনগর কলেজে। বাঁকুড়া জেলার প্রথম ইংরেজিশিক্ষিত মানুষ ছিলেন এঁরা। হরিচরণ প্রথম শহরের ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। মেদিনীপুরে শিক্ষা বিভাগের কাজ করার সময় হরিচরণের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় ঘটে। তাঁর জীবনীলেখক রাখালচন্দ্র নাগ জানিয়েছেন যে, হরিচরণ বিদ্যাসাগরের সাহচর্য লাভ করেচিলেন। হরিচরণ পাঠ্য বই রচনা করেছিলেন এবং একটি পুঁথিও ছাপিয়েছিলেন।

হরিচরণের পুত্রদের মধ্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন অবিনাশচন্দ্র দাস। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পি.এইচ.ডি.। ঋকবেদ নিয়ে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক হয়েছিলেন। 'Rigvedic Culture of India', তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি প্রচুর গল্প-কবিতা-উপন্যাসের রচয়িতা। সীতা, পালশবন প্রভৃতি উপন্যাস এক সময়ে বিশ্ব বিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল। তাঁর পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে বাঁকুড়া শহরে আসেন গুরুপ্রসাদ সরকার। ফার্সি শিখে তিনি ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির উকিল হন এবং প্রচুর ভূসম্পত্তি করেন। শহরের হাটতলা মহল্লায় তিনি বাসিন্দা হয়েছিলেন। তাঁর এক পুত্র হলেন হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (১৮০০-১৮৭৬) ছিলেন কিংবদন্তী প্রতীম। তিনি বাঁকুড়া শহরের প্রথম সারির 'বাবু' ছিলেন, বিশাল অট্টালিকা বানিয়েছিলেন। বর্ধমান রাজার নায়েবের কন্যা মঙ্গলাকে তিনি বিয়ে করেন। জানা যায়, মাত্র ১১২১ টাকা ১ আনা ১ পাই বার্ষিক খাজনাতে তিনি ২৬টি মৌজার পত্তনিস্বত্ত্ব লাভ করেছিলেন। ১৮১২-১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ সময়কাল জুড়ে হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের পাকাবাড়ি নির্মিত হয়েছিল। লোকে বলত — 'হরিশঙ্করবাবুর বাড়ি, কুলদাবাবুর গাড়ি, আলিজামিনের দাড়ি।' ৫ বিঘা ৩ কাঠা আয়তনের এই বাড়ির সঙ্গে জড়িত আছে ঔপনিবেশিক বাঁকুড়ার দেশীয় শ্রেণির আগ্রাসী ধনী হয়ে ওঠারও ইতিহাস।

কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন আর এক সম্ভ্রান্ত পুরুষ। জজ আদালতে তিনি ওকালতি করতেন। তিনি প্রচুর সম্পত্তি করেছিলেন। ১৯০৪ সালে তিনি নিলামে কিনে ছিলেন বাঁকুড়ার প্রাক্তন ম্যাজিস্ট্রেট এন্ডারসন সাহেবের বাগান। ৭৩০০ টাকায় ১১৯ বিঘা বাগান ও দানার বাঁধ (কলেজ ট্যাঙ্ক) তিনি করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই সরকার খ্রিশ্চান কলেজ তৈরি করতে ১৯০৫ সালের মে মাসে সেই বাগান কিনে নেন। খ্রিশ্চান কলেজ কম্পাউণ্ড বর্তমান

সেই এলাকা ঘিরে তৈরি হয়েছে।

আলি জামিন সম্ভবতঃ শহরের মুসলমান পরিবারগুলির মধ্যে প্রথম সম্ভ্রান্ত ধনী ছিলেন। তিনি বাদুল্লাড়ার বাসিন্দা ছিলেন বলে অনেকে বলে থাকেন। কেউ বলেন রাণীগঞ্জ-বিহার থেকে চামড়ার ব্যবসা করতে এসে ইদগা মহলার বাসিন্দা হয়েছিলেন। এই পরিবারের সুলতানা বেগম জেলার প্রথম মুসলিম গ্র্যাজুয়েট মহিলা। সুলতানার 'জাগরণ' (১৩৪৮) বাঁকুড়ার প্রথম মহিলা সম্পাদিত সাময়িকপত্র।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাল্যবন্ধু ছিলেন স্কুলডাঙ্গার আবদুস সামাদ ও আবদুল জব্বর। এরা প্রসিদ্ধ মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারে সন্তান ছিলেন। স্কুলডাঙ্গাতে এঁদের বিশাল ইমারৎ আজও বিদ্যমান। দুজনে জেলাজজ ও পুলিস কর্তা ছিলেন।

কৃষ্ণধন মিত্রের ছেলে নটবর মিত্র। নটবর ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারি পাস করেন। তিনি কালীতলার হরিসভার অছির সদস্য ছিলেন। তাঁর পুত্র বৈকুণ্ঠনাথ (১৮৯০-১৯৭৩).ও ডাক্তারি পাশ করেন। কিন্তু তিনি সংসার করেননি। স্বামী মহেশ্বরানন্দ নামে পরিচিত হয়েছিলেন সন্ন্যাস নিয়ে। তিনি বাঁকুড়া রামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ হন। এবং কিংবদন্তী প্রতীম হোমিও চিকিৎসক রূপে খ্যাত হয়েছিলেন।

হরিহর মুখোপাধ্যায়দের বংশ জেলায় সুপ্রসিদ্ধ পরিবার। হরিহর (১৮৩৮-১৯০২) বাঁকুড়া পৌরসভার প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান (১৮৮৫-১৯০০)।

উল্লেখ করতে হয় পালিতবাগানের পালিত পরিবারের। এই পরিবারটি এসেছিল বেতুড় থেকে। উমেশচন্দ্র পালিত ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত আইনব্যবসায়ী। তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন জেলাজজ। গোবিন্দপ্রসাদ পালিত হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করতেন। অক্ষয় পালিত ছিলেন কালেকটরের পেশকার।

রামানন্দের বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৯-১৯৪০) এর নাম বাঁকুড়ায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর পুত্র কালু বা অমরনাথ ছিলেন গোবিন্দপ্রসাদ সিংহের জাতীয় বিদ্যালয় গঠনের সহযোগী। তাঁর নামেই 'অমরকানন'। তৃতীয় পুত্র অমরনাথ (১৮৯৯-১৯২৩) অকাল প্রয়াত হয়েছিলেন। প্রমথনাথ ছিলেন কবি-প্রাবন্ধিক-ঔপন্যাসিক। 'প্রবাসী' পত্রিকায় তিনি কবিতা লিখতেন। কয়েকটি প্রবন্ধও লিখেছেন। উপন্যাস লিখেছিলেন একটি — 'নবীনা জননী'। প্রমথনাথ বাঁকুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন (১৬.৬১৯২৮ - ৯.৮.১৯৩৪)। বাঁকুড়া সারস্বত সমাজের তিনি প্রথম সভাপতি। এম.এ. পাস করে বাংলা বিভাগে তিনি আই.ই.এস. হন। তাঁর মৃত্যুর পর রামানন্দ 'প্রবাসী'তে স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন — ''তিনি চরিত্রবান, সুরসিক। ধার্মিক ও পরোপকারী ছিলেন'' (প্রবাসী/অগ্রহায়ণ ১৩৫০)। বাঁকুড়ার সারস্বত সাধনায় তাঁর ভূমিকা অসাধারণ (দ্রঃ ঊনিশ শতকের বাঁকুড়ার সারস্বত সাধনা ও প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়'/ পুতুল চট্টোপাধ্যায়/বৃষ্টিকলম, বসন্ত সংখ্যা - ১৪১৪, ১১০-১১২)। প্রমথনাথের চতুর্থ পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৩-১৯৫৮) ও ছিলেন গান্ধীবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী। প্রমথনাথের দু-নাতি শান্তব্রত ও দেবব্রত জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের কারিগর ছিলেন।

অহীন্দ্রনাথ ঘোষদের পরিবার স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িত ছিল। তাঁর পিতা কালীকুমার বর্ধমান কোর্টে ওকালতি করে অনেক ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি সেখান থেকে বিষ্ণুপুরে উঠে এসেছিলেন। অহীন্দ্রনাথ ছিলেন বাঁকুড়া কোর্টের উকিল। তাঁর পরিবারের বীরেশ্বর, কন্যা উমা ছিলেন বৈপ্লবিক আন্দোলনের কর্মী। উদয়ভানু জেলার সমাজসেবায় নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। অহীন্দ্রনাথ ও তাঁর দু পুত্র মহীন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ কারাবরণ করেছিলেন।

কেন্দুয়াডিহির 'ঘড়িবাড়ি' খ্যাত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়দের পরিবার এসেছিলেন হুগলির পাতাগ্রাম থেকে। ভোলানাথ ইংরেজিতে এম.এ. পাস করে আই.পি.এস. হন এবং পুলিশের (অবিভক্ত বাংলার) আই.জি. (Inspector General of Police) হন। তিনি প্রথম বাঙালি যিনি ব্রিটিশ আমলে এ পদাধিকার হন। তাঁর পিতা ত্রিগুনাচরণ বাঁকুড়ার চকে গোলদারি দোকান করতেন। তিনি কেন্দুয়াডিহিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। বাঁকুড়ার দেবমন্দির বিখ্যাত 'ভৈরবস্থান' এর মন্দির প্রতিষ্ঠা-সংস্কার ভোলানাথবাবুর পরিবার করেছিলেন।

হদলনারায়ণপুরের মণ্ডল পরিবারের বিনোদবিহারী মণ্ডল ওকালতির সূত্রে বাঁকুড়া শহরের বাসিন্দা হয়েছিলেন। বাঁকুড়া পৌরসভার দীর্ঘদিন তিনি সদস্য ও চেয়ারম্যন ছিলেন। শিখরিয়া পাড়ার শিকদার পরিবারের রাসবিহারী শিকদার

সরকারি চাকরিসূত্রে আসেন বাঁকুড়ায়। আদি নিবাস ছিল পাবনায়। পরবর্তীকালে তাঁরা ভূস্বামী পরিবারে পরিণত হন। সেই সঙ্গে বিশিষ্টতা অর্জন করেন। তারাপ্রসাদ শিকদার এই বংশের সন্তান ছিলেন।

পাত্রসায়রের কাকটিয়া গ্রাম থেকে শহরে আসেন কানাইলাল দে (১৮৯৪-১৯৭৮)। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন গোপাললাল দে। কল্লোল-প্রবাসীর কবি - প্রাবন্ধিক গোপাললাল ছিলেন খ্রিশ্চান কলেজের বাংলার অধ্যাপক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলোনের ভক্ত। তাঁর পুত্র কন্যারাও যশস্বী হয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে তাঁর এক পুত্র। পাত্রসায়ের থেকেই শহরে আসেন স্বাধীনতা সংগ্রামী কমলকৃষ্ণ রায়ের (১৮৯৭-১৯৭০) পরিবার।

বিংশ শতকের গোড়ায় শহরে আসেন দানবীর নীলাম্বর ও ঋষিবর মুখোপাধ্যায়। তাঁরা কাশ্মীরের দেওয়ান ও বিচারপতি ছিলেন। তাঁদের দান করা জমিতেই বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও লোকপুর হাসপাতাল তৈরি হয়েছে।

সম্ভ্রান্ত মিত্র বংশের কালীকৃষ্ণ মিত্র (১৮৮৩-১৯৫৬) চিকিৎসা সূত্রে বাঁকুড়ায় এসেছিলেন। রামদাস চক্রবর্তী ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। বৈপ্লবিক আন্দোলন পরিচালনায় তিনি অগ্রণী ছিলেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ ভবানীকিঙ্কর চক্রবর্তী দীর্ঘকাল পৌরসভার দাতব্য চিকিৎসালয়ের সেবায় যুক্ত ছিলেন।

১৯২০ সাল থেকে শহরের বাসিন্দা হন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (১৮৫৯-১৯৫৬)। রামানন্দের পর দ্বিতীয় ব্যক্তি যাঁকে বিশ্বের মানুষ চেনেন। তাঁর পুত্ররা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। বড় ছেলে ছিলেন ডাঃ সত্যকুমার, মধ্যমপুত্র অনন্তকুমার কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুজনেই এ পরিবারে বাঁধা পড়েছিলেন। যোগেশচন্দ্রের প্রতিবেশী বৈদ্যনাথ ঘোষের পরিবার সাংস্কৃতিক ও শিক্ষিত ছিলেন। বৈদ্যনাথ ঘোষ 'লোকমত' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। যোগেশচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন রায়বাহাদুর সত্যকিঙ্কর সাহানা। বিহারে অভ্রখনি ছিল তাঁর। প্রচুর সম্পত্তির সাথে সাহিত্যসাধনাও তিনি করে গিয়েছিলেন সারাজীবন। 'চণ্ডীদাস সমস্যা'তে বাংলা সাহিত্যে তাঁর নাম মুদ্রিত হয়ে থাকবে গবেষক হিসেবে।

বাঁকুড়া সম্মিলনীর সম্পাদক ঋষীন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী। নতুনচটির বাসিন্দা কালীপদ রায় ছিলেন ঢাকা বিভাগের শিক্ষা পরিদর্শক। প্রচুর জমি ও সুদৃশ্য বাড়ি (বর্তমানে কৃষি অফিস) তিনি নির্মাণ করেছিলেন। 'কালীবাবুর বাগান' বাঁকুড়ায় বিখ্যাত ছিল। সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হয় অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি জেলার বহুকর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। আদি নিবাসী হল শানবান্দা গ্রাম। তাঁর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছি একটি প্রবন্ধে। তাঁর পুত্র ছিলেন ডাঃ পার্বতীচরণ। অন্য পুত্র পৌত্ররাও সুনাম অর্জন করেছেন।

ভূস্বামী ছিলেন না, ব্যবসায়ী ছিলেন শহরের মাড়োয়ারী সম্প্রদায়। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন রাঠী পরিবার। ১৮৮৫-১৮৯৫ নাগাদ এরা বাঁকুড়ায় এসেছিলেন। অন্যদের মধ্যে গোয়েঙ্কা ও বাজোরিয়া পরিবার। শিক্ষা বিস্তার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন মোহনলাল গোয়েঙ্কা। হরিকিষণ রাঠি গোশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কেঞ্জাকুড়া এলাকায় বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য রামানুজ করেরা। তাঁর দাদা ছিলেন ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য। রামানুজ নিজে প্রতিটি সামাজিক কর্মকাণ্ডের পুরোধা ছিলেন। কর বংশের আদি বাসস্থান ছিল হুগলির তেলকুপি গ্রামে। দুর্গাচরণ কর, বলাই কর এরা ছাত্না থানার আচুড়িবনা, আমাকুন্দা, পাল্লা, একাচালি প্রভৃতি মৌজা কিনেছিলেন। তাঁদের বংশধরেরা নব্য ভূস্বামীতে পরিণত হন। রামানুজের বাবা মহেশচন্দ্র জেলাবোর্ডের কাজের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তারাচাঁদ কর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ছিলেন রামানুজের পিতামহ। তারাচাঁদের আর এক পুত্র প্রতাপচন্দ্র। তাঁর পুত্র সারদাচরণ প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না কিন্তু পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর তেলেগু ভাষায় দক্ষতা ছিল।

মনোহরপুরে সত্যায়তন মহামন্দির প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী যোগজীবনানন্দ। ১৩৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমে বহু সমাজসেবামূলক কাজকর্ম চলত। এখান থেকেই স্বামীজী শুরু করেন বাউরি সমাজের উন্নতির জন্য ক্ষেত্রপাল আন্দোলন। গ্রামের পাৎসা পরিবার আশ্রমের জন্য ১৮$^{১}/_{২}$ বিঘা জমি দান করেছিলেন। গঙ্গাবিষ্ণু পাৎসা ভূস্বামী ছিলেন। ২০৫ বিঘা জমির তিনি মালিক ছিলেন তুলসী, কেশ্যাডোবা, ধুলকুমারী মৌজার। ভূষণ পাৎসা ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন।

কুলবনার ভূস্বামী ছিলেন বনবিহারী গোস্বামী। জমি ছিল ১৫০ বিঘার মতো। পাঁপুরডিহির ভূস্বামী ছিলেন গুরুপদ ও কুলদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোলবনার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে পুঁথির লিপিকর ও পাঠক ছিলেন বংশী ও মগন মুখুটি (পিতাপুত্র)। এছাড়া হরিনারায়ণ মুখুটি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়েছিলেন। রামনাথ তন্তুবায় স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। ১৯৭২ সালে ভারত সরকার তাঁকে তাম্রফলক প্রদান করেন। এ গ্রামের ভূস্বামীদের মধ্যে মহাদেব মণ্ডলের পরিবার উল্লেখযোগ্য। রাজারাম মণ্ডল জমি দিয়েছিলেন দুর্গামন্দির প্রতিষ্ঠায়।

আঁধারথোল গ্রামের ডাঃ বিজয় মণ্ডল সাংসদ হিসেবেও চিকিৎসক হিসেবে বিখ্যাত হন। কালপাথরের বাগ পরিবার জমিদার ছিলেন। লখ্যাসোলের জমিদার ছিলেন অন্নদাপ্রসাদ সেন। এ গ্রামের মহেন্দ্র গাঁতাইত সুপটু হস্তলেখা বিশারদ ছিলেন। কুমিদ্যার এল.এম.এফ. চিকিৎসক বেচারাম চৌধুরীর বংশ ভূস্বামী ও সমাজসেবী ছিলেন। কুমিদ্যা গ্রামের প্রচুর সম্পত্তি আজও এই বংশের রয়েছে।

হেলনা শুশুনিয়ার ডাঃ রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায় সাংসদ হয়েছিলেন। পরিশেষে বলতে হয় সানাবাঁধের কথা। ভূমি নয় শুধুমাত্র ইংরেজি শিক্ষাকে ধরে একটি মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ শ্রেণি সুস্থ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেছিল এখানে। সবাই ছিলেন সরকারি চাকুরে। নলিনাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় চাইবাসা হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। প্রভাকর, নবগোপাল, নিত্যগোপাল ব্যানার্জিরাও শিক্ষক ছিলেন। যদুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রিশ্চান কলেজের ইংরেজি অনার্সের প্রথম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন ১৯২২ সালে। পরবর্তীকালে গ্রামের আরও কিছু শিক্ষিত ও সমাজসেবায় উৎসর্গীকৃত যুবক প্রতিষ্ঠা করেন দুটি ক্লাব। এ ক্লাব দুটি বাঁকুড়া জেলার উল্লেখযোগ্য ক্লাবগুলির মধ্যে সম্ভবত প্রথম সারির। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জনকল্যাণ সংঘ। সদস্যদের মধ্যে তীর্থ মুখার্জি, পরিমল চ্যাটার্জি ও দেবব্রত ব্যানার্জির নাম উল্লেখ্য। ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'মডার্ণ ক্লাব'। প্রতিষ্ঠাতারা হলেন অধ্যাপক মলয় মুখোপাধ্যায়, কৃপাময় ব্যানার্জি, অমৃতলাল ব্যানার্জি, সমীর ব্যানার্জি, পান্নালাল ও বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জি, দিলীপ ব্যানার্জি, স্বপন গোস্বামী ও আশিস ব্যানার্জি। ১৯৭৪ সালে গৌরচন্দ্র মুখার্জির দান করা জমিতে তৈরি হয় মহিলা সমিতি। সদস্যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রীতা ব্যানার্জি, মুক্তা চ্যাটার্জি, স্বপ্না ব্যানার্জি, অরুণা মুখার্জি প্রভৃতি। সাতের দশকে এপার বাংলা, ওপার বাংলা যখন বিভ্রান্ত-চঞ্চল নকশাল আন্দোলন আর মুক্তিযুদ্ধে, তখন সানাবাঁধের যুবশক্তি জোট বেঁধেছে গড়ার পথে। জোটের নেপথ্যে যে মানুষটির ভূমিকা ছিল, তিনি মলয় মুখোপাধ্যায়। গোটা গ্রামটি তাঁর একটি পরিবার ছিল।

তথ্যসূত্র :

১। বাঙ্গাল পরিবারের ফার্সি সনদ (ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত)।

২। রামানুজ কর - 'বাঁকুড়া জেলার বিবরণ'।

৩। রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী - বাঁকুড়া জনের ইতিহাস সংস্কৃতি।

৪। শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় - বাঁকুড়া শহরের গোড়ার কথা।

সহযোগিতাঃ

ধীরেন্দ্রনাথ কর, মেঘদূত ভুঁইঞা, মণিময় ব্যানার্জি, দিলীপ ব্যানার্জি, সুজীব পাৎসা, অশোক উপাধ্যায় (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা) ও অধ্যাপক ডঃ স্বপন বসু।

অপরাধের সেকাল ও একাল ঃ প্রেক্ষাপট-বাঁকুড়া ১

দুর্গা চট্টোপাধ্যায়

জেলার চিত্র ও অপরাধের ইতিহাসের পশ্চাদপট ঃ

অপরাধ ও অপরাধিত্ব শব্দগুলি বড়ই আপেক্ষিক। আপেক্ষিকতা এই কারণেই যে সময় সমাজ, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দগুলির সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটে। ফলে এক যুগের অপরাধ বা অপরাধি ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সামাজিক বিবর্তনে রাষ্ট্রীক কাঠামোর পরিবর্তনে অন্যযুগে সম্মানীয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। বিশেষ কিছু অপরাধের ক্ষেত্রে তো বটেই এমনকি সে যুগে চুরি ডাকাতি ও যারা করতেন (স্বদেশীযুগে) এমনকি ব্যাঙ্ক ডাকাতি, মেল ডাকাতি শুরু করে বিভিন্ন অপরাধ (তৎকালীন প্রশাসনের চোখে) যারা সংগঠিত করতো তারাই পরবর্তীকালে সম্মানীয় হিসাবে গণ্য হয়েছেন। অতীতে দেখা গিয়েছে এই জঙ্গলমহলের রাজারাও ছিলেন চুরি ডাকাতিতে সিদ্ধহস্ত অর্থাৎ "রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি" — ঠিক ততখানি না হলেও রাজার হাতে ধনবাণের রোই ছিল না।[১] এজন্য তাদের মনে কোন অপরাধবোধও ছিল না। গহণ অরণ্যাবৃত উপজাতি অর্দ্ধ উপজাতি অধ্যুষিত এ অঞ্চলের মানুষের প্রথাগত উপজীব্য ছিল একদিন চুরি, ডাকাতি ও লুঠতরাজ। একথা আমরা বিভিন্ন লেখকের বর্ণনায় পাই। যেমন বীর হাম্বিরের দ্বারা বৃন্দাবন যাত্রা পথে পুঁথির গাড়ী লুঠ। সেকালে অপরাধ ছিল রাষ্ট্রীয় পেশা। কাজেই অপরাধ ও অপরাধিত্বের সংজ্ঞা নির্ণয়ের বিষয়টি বড়ই ঘোলাটে হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তি বিশেষের কৃত অপরাধের জন্য অপরাধ অপরাধিত্বের বিষয় বিচার করতে এবং অপরদিকে গোষ্ঠীবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ মানুষের একত্রে সংগঠিত অপরাধ ও অপরাধিত্বের বিচার কি একই সীমায়, একই মাপকাঠিতে করা যাবে? হরচন্দ্র ঘোষ[২] বলেছেন এ জেলার মানুষ ছিল একদিন বর্বর প্রকৃতির জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত। এদের আচার আচরণে ছিল রূঢ়তা এবং মানুষজন ছিল ব্যাপক অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমগ্ন। এদের মানবিক বিকাশ ঘটেনি। মল্ল ও অন্যান্য রাজপুত জনগোষ্ঠী সহ অধিকাংশ মানুষের মধ্যে ছিল লুঠতরাজের স্পৃহা। কোনরকম নৈতিকতা বা সামাজিক মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটেনি। তাই খুন খারাপি, দাঙ্গা, লুঠ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এখানের সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, বাগদী, ডোম, দিগার, কোড়া, মান ভুইএগ্রা, তাবেদার, সর্দার, পাইক, নোয়া, গড়াইত শবর খেড়িয়া প্রভৃতি উপজাতি ও অর্দ্ধ উপজাতি আদিম যে জনগোষ্ঠী যারা অদি বাসিন্দা তাদের জীবিকা ছিল চুরি, ডাকাতি, বন্য পশু শিকার। দেখা গিয়েছে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এই কৌম গোষ্ঠীগুলি কোন উন্নত সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মান অর্জন করতে পারেনি। ভবিষ্যপুরাণের বর্ণনায় আছে এই জীবিকার কথা। চণ্ডীমঙ্গলের ভাষায় "অতি নীচ কূলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়/ কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়"। ঐতরেয় আরণ্যকে এখানের মানুষদের অসুর বলা হয়েছে। আর্যরা তীর্থ যাত্রায় এই এলাকা এড়িয়ে চলতেন। আচারঙ্গ সূত্রের কাহিনী অনুযায়ী খৃঃপূঃ তিনশো বছর আগে তীর্থঙ্কর মহাবীর এ পথ দিয়ে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে ছিল জৈন সন্ন্যাসীরা। এদের অখাদ্য ভোজন করতে হয়েছিল। এখানের খাদ্যাভ্যাস ছিল আদিম, তার বিবরণ পাই, কাড়া কেটে করে ঝোল/তবে জানবি উপরশোল। প্রকৃতপক্ষে বাংলার কেন্দ্রীয় সভ্যতার সঙ্গে রাঢ়ের অনার্য সভ্যতার কোন যোগই ছিল না। ওম্যালি বলেছেন যে অনার্য রাজ্য রাজগ্রাম ছিল দস্যুতস্করের মৃগয়াক্ষেত্র। এই যে গোষ্ঠীগত সংগঠিত অপরাধ তার অপরাধিত্ব নির্ণয় কিভাবে করা সম্ভব। নানা প্রশ্ন থেকে যায়। সমস্ত সমাজ মিলে

যদি অপরাধ করে এবং সেই কাজে যদি সমাজের সমর্থন থেকে যায় তবে তাকে কি আদৌ অপরাধ বলা যাবে। সে যুগের সমাজের চোখে হয়তো এগুলো কোন অপরাধই গণ্য হত না। আজকেও এমন কিছু কিছু অপরাধ সংগঠিত হয়ে চলেছে যা ব্যক্তির পক্ষে জঘন্যতম অপরাধ বলে গণ্য হওয়া সমিচীন কিন্তু সামাজিকভাবে যদি সেইসব অপরাধ সংঘটিত হয় তবে সেগুলিকে কি অপরাধ বলে চিহ্নিত করে শাস্তিদানের কথা ভাবা যাবে? নাকি আমরা তেমন করে ভাবি কখনও। চিন্তা করার বিষয় অতীতের প্রসঙ্গ টেনেই যদি এ যুগের গণপিটুনিতে ডাকাতের মৃত্যু বা ধর্মঘটের জেরে ট্রাম বাস পোড়ানো, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ক্ষতিসাধন এগুলি কি অপরাধের পর্যায় পড়বে? নাকি পড়ে না অথচ এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নির্বিকার। অতীতে সমাজ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে অপরাধ করতো এতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন ও থাকতো আজকের দিনে বিচার করতে বসলে তারা অপরাধি। কিন্তু তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর দাঁড়িয়ে এটির মূল্যায়ন করা উচিত। দুঃখের বিষয় ইংরেজ গেজেটিয়ার লেখকগণ এবং এ দেশীয় কিছু পণ্ডিত আদিম জনগোষ্ঠীর সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর সেকালের নিরিখে রাঢ়ের মানুষের ওপর সুবিচার করেনি। অসভ্য বর্বর লুটেরা ও দস্যুরা দল বলে ব্রাত্য করে দিয়েছেন। এমনকি শোষণের বিরুদ্ধে, অন্যায় অসাম্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এইসব জনগোষ্ঠীর সংগ্রামকে ডাকাতি, চুরি, লুঠতরাজ প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করেছেন, ফলে ইতিহাস অনেকাংশে বিকৃত হয়েছে।

রাঢ় বাঁকুড়ার এই আদিম জনগোষ্ঠীকে অন্যান্যরা এড়িয়ে চলত। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে সভ্য সমাজ অর্থাৎ আর্যরা তীর্থ যাত্রায় এই অঞ্চলকে এড়িয়ে চলতেন। যোগসূত্র ছিল না রাঢ়ের কেন্দ্রীয় সভ্যতার সঙ্গে। অরণ্যাঞ্চলের এই কৌম জনগোষ্ঠী থাকত নিজেদের মত। এখানের সাঁওতাল মুণ্ডা বাগ্দী ডোম দিগার কোড়া লোহার মালেরা নিজেদের মত সমাজ তৈরী করে আপন সংস্কার নিয়ে, নিজেদের জীবন চর্যা রচিত করেছিল সভ্য মানুষের কাছে তা বিসদৃশ ঠেকেছে, অসংস্কৃত অরুচিকর মনে হয়েছে তাই তাদের অসুর, চোয়াড় প্রভৃতি নানা শব্দে আখ্যায়িত করেছে। বণিক সংস্কৃতির ধারক ব্রিটীশ প্রশাসক ও তাদের তাবেদার ইতিহাস রচয়িতারা 'চুয়াড়' শব্দ ব্যবহার করে এক বিকৃত ইতিহাসের দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। ডাকাত, দস্যু, নীচু সম্প্রদায়ের মানুষ, চোরেদের সর্দারকে 'চুয়াড়' বলা হত। রাঢ়েই সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শন মিলেছে। এই দ্বারকেশ্বরের তীরের গ্রামগুলিতে পাওয়া গিয়েছে নব্যপ্রস্তর যুগের নিদর্শন অর্থাৎ এখানেই প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে পণ্ডিতদের অভিমত তাহলে সভ্য, অসভ্য চুয়াড় এই শব্দগুলি কি আপেক্ষিকভাবে ব্যবহৃত হয়। ব্রিটীশ প্রশাসক হেস্টিংসও এই অঞ্চলের মানুষদের জন্মগত অপরাধি বলেছেন (Born Criminal) অথচ এরা ছিল স্বভাবগত দিক দিয়ে অরণ্যজীবি। এ.বি. বর্দ্ধন তার The insolved Problem এ বলেছেন No justice can be done to the tribal people, no appreciation can be made to their role in shaping Indian destiny. with out recalling the fact that the tribals were amongst the earliest contigents the common struggle against the alieve rulars and had made some of the greatest sacrifice. বলা যায় ইংরেজ কর্তৃক মল্লভূম অধিকারের আগে এদেশ চুয়াড়ের দেশ ছিল না যখন এদেশের অধিবাসীরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল তখন কি এদেশের জনগোষ্ঠী বর্বর ছিল? মুচি, হাড়ি, বাগদী, ডোম, বাউরী, খয়রা, হাড়িদের বাড়ীতেও ধর্মসঙ্গীত গীত হত। ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে জেলায় চুরি, ডাকাতি ততটা ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না। এই চুয়াড় বা বর্বর আখ্যা দেওয়ার পিছনে রয়েছে ইংরেজদের কূট মতলব ও চক্রান্ত।

রাঢ় চিরকালের বীরভূমি। এই বীরত্বের নিদর্শনও ছড়িয়ে রয়ে চতুর্দিকে। বহিরাগত বর্ণহিন্দুদের অনুপ্রবেশ একই দিকে সমন্বয় ও সংঘর্ষের পথ তৈরী করেছিল। বর্ণ হিন্দুদের বাসযোগ্য স্থান সন্ধান ও জীবিকা অর্জন জেলার কৌম জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষায় এক অনিবার্য সংকট আনে। জমি, অরণ্য হারানো এবং ক্রমেই পিছু হঠা এক সময় এই সরল জনজাতিকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। দেখা দেয় অপরাধ প্রবণতা। অপরাধ বিজ্ঞান বলে ইচ্ছা এবং পারিপার্শ্বিকতা যদি প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অতিক্রম করে তবেই অপরাধ সংঘটিত হয়। সংক্ষেপে $C = T + S > R$ Tendency এবং Situation এর সম্মিলিত শক্তি যদি প্রতিরোধ শক্তির বেশী হয় তবেই Crime। বর্ণ হিন্দুদের কাছে ক্রমে ক্রমে

সব কিছু হারাতে থাকায় বাড়ে অপরাধ প্রবণতা। এই দখলকার বা দিকুদের তারা ভাল চোখে দেখেনি। বর্ণ হিন্দুদের দাপটে এই অরণ্যচারী বিপন্ন হয়। আস্তে আস্তে চলে যেতে থাকে অরণ্যের দখল ফলে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংকটই অপরাধ প্রবণতা আনে। অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় 'দুই বিপরীত ধর্মী সংঘর্ষের ক্ষেত্র, আবার সমণ্বয়ের ক্ষেত্র হল এই অঞ্চল'।

বহিরাগত বর্ণহিন্দুরাই পরবর্তীকালে জমিদার ও ইজারাদার শ্রেণীতে উন্নীত হয়ে সামন্ততন্ত্রের সূচনা করে। আবার এই জনজাতি গোষ্ঠীকে শান্ত রাখার জন্যই নিজ গরজেই এইসব কৌম সর্দারদের নিস্কর জমি দিয়ে তুষ্ট করে তাদের দিয়ে স্থানীয়ভাবে পাহারা দেবার কাজে নিযুক্ত করার ভেতর দিয়ে ঘাটোয়ালী প্রথার উদ্ভব। এইসব জনজাতি গোষ্ঠী সর্দারগণ ছিলেন এলাকা ভিত্তিক একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। Resorted to violence and gang docioty to signify their disapproval of things not liked by them. জাতিগত ও গোষ্ঠীগত একাত্মতাবোধ ও ঐতিহ্যগত জীবনধারা এই জনগোষ্ঠীকে সহজেই এক সংহত ঐক্য গড়ে দিয়েছিল। ফলে পরবর্ত্তীকালে যে বিদ্রোহগুলি ঘটেছিল তাতে এর সম্যক চিত্র ফুটে উঠেছিল।

পাণ্ডববর্জিত এককালের জঙ্গলমহল বাঁকুড়া ছিল wide spreaded low scrub jungle with a dense thorny undergrowth .... in the west & south trees of larger growth are found. বর্ণহিন্দুদের আগমনে এখানকার জনজাতি গোষ্ঠীর সাধের অরণ্যাঞ্চল লুপ্ত হতে থাকে। O'malley তার বিবরণীতে লিখেছেন Nothing but stunted jungle now remains, all else have been cleared away by the wood man or charcoal burner. Even now the larger trees have been felled....... দ্বারকেশ্বরের দক্ষিণ তীর থেকে জঙ্গল সাফ হতে লাগল এবং একদিকে বর্ণহিন্দুদের যেমন বসতি ও আধিপত্য কায়েম হতে শুরু করল অন্যদিকে আদিম জনগোষ্ঠী পিছু হটতে শুরু করল। অরণ্য যাদের ছিল জীবনজীবিকা তাতেও সংকট দেখা দিল। ক্রমে প্রাণবন্ত সদা উজ্জ্বল শক্তিশালী কৌম গোষ্ঠীগুলি অস্তিত্ব রক্ষার সংকটে পড়ে দাসবৃত্তি করতে শুরু করল বর্ণহিন্দুদের আর বেশকিছু অংশের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হল এবং অপরাধিত্বের দিকে তাদের টেনে নিয়ে চলল — It is the situation & circumstances that leaded them to Crime'. দ্বারকেশ্বরের দক্ষিণ তীর থেকে যে গহণ অরণ্য ছিল (ভবিষ্যপূরাণ) তাতে একদা হিংস্র জন্তুদের ছিল অবাধ বিচরণক্ষেত্র। এই অরণ্যে কৌম জনগোষ্ঠীগুলি বিক্ষিপ্তভাবে বসতি গড়েছিল সুদূর অতীত থেকে। বর্ণহিন্দুদের বসতি গড়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ তীর থেকে বেশ কিছুটা অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠতে থাকে বর্ণহিন্দুদের গ্রাম। যে সমস্ত জনগোষ্ঠী এদের সঙ্গে আপস ও সমন্বয় সাধন করে কায়ক্লেশে থেকে গিয়েছিল তাদের কাজ ছিল Slavery. বর্ণহিন্দুদের কিছু কিছু হাসিল করা জমির বন্দোবস্ত পেয়ে, কেউবা শ্রম দিয়ে চাষে খেটে অস্তিত্ব রক্ষা করছিল বাকীরা সরে গিয়েছিল আরও দক্ষিণের অরণ্যে। অস্তিত্ব রক্ষার সংকটাবর্তে এই জনজাতিকে অপরাধি বানিয়েছিল। যদিও ইংরেজ লেখকরা এদের Born Criminal বলেছেন, কিন্তু অতীতের তাদের কার্যক্রম, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও সংগ্রাম অন্য কথা বলে। যাইহোক, বাঁকুড়ার দীর্ঘস্থায়ী খরা, মড়ক, শস্যহানি এবং মহামারী জাতীয় রোগের পুনঃপুনঃ আবির্ভাব এনেছিল প্রচণ্ড অভাব ও দারিদ্র্য। আমরা দেখি ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ সাধারণ মানুষের মধ্যে এনেছিল ব্যাপক অভাব ও দারিদ্র্য সেই সঙ্গে রাজস্ব দালালদের দ্বারা ভূমিচ্যুতি অনেক মানুষকে লুটেরা বানিয়েছিল। প্রধানতঃ বাঁচার তাগিদেই তারা চুরি ডাকাতি ও লুঠ করতে শুরু করে এবং গ্রামগুলিতে এক অরাজকতার সৃষ্টি হয়। হান্টার বলেছেন অরণ্যবাসী ছিল বণ্যপ্রকৃতির চোর, খুনী ও লুণ্ঠনকারী। কিন্তু ১৭৮১-৮২ খৃষ্টাব্দ নিম্নবর্গীয়দের বিদ্রোহ কিন্তু অন্য কথা বলে। নিদারুণ দারিদ্র্য, অন্নের সংস্থান নেই, জমি জিরেত সব কেড়ে নেওয়া হয়েছে এই অবস্থায় ইংরেজরা যদি আইনশঙ্খলা স্থাপনের প্রয়াস চালায়, নির্যাতন শুরু করে তবে বিদ্রোহ হতে বাধ্য। ইদানীংকালের লেখকেরা এটিকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততান্ত্রিক বিরোধীগণসংগ্রাম আখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন এগুলি বিক্ষিপ্ত হলেও মূলতঃ কৃষক বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ চলেছে ১৮৯১ পর্যন্ত। ইংরেজরা ঠিকই জানত এই বিদ্রোহ এবং চুরি, ডাকাতি, লুটের প্রকৃত কারণ তাই বিদ্রোহ প্রশমিত করতে ১৭৯০-৯২ এ নতুন গ্রাম বসতি

ও চাষবাসের জমির বন্দোবস্ত করতে শুরু করেছিলেন। দেখা গিয়েছে যে জীবিকার সংস্থান হওয়ার পর সেই অরাজকতা আর ততটা ছিল না। তবু এটা ঠিক যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পনর যোল বছর ধরে দুর্ভিক্ষ আর মণ্বন্তর মূর্তিমান বিভীষিকার মত আবির্ভূত হয়েছিল বাঁকুড়া জেলায়। অনাবৃষ্টি আর সেই সঙ্গে বসন্ত, প্লেগ কালাজ্বর আর ম্যালেরিয়া জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। ত্রাণ সাহায্য প্রায় ছিলই না যেটুকু বেসরকারী সংগঠন থেকে সাহায্য ও ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা সামান্য ফলে বহুলোক মারা যায় আর ইংরেজ সরকার মানুষকে নিরুপায় হয়ে অনাহারে দিন কাটাতে দেখেছে ধায় অখাদ্য খেতে দেখেছে সামান্যতম সাহায্যের ব্যবস্থা করেনি। এই দারুণ সংকটের দিনে মানুষ খাদ্যের জন্য হাহাকার করেছে, চুরি করেছে ডাকাতি করেছে, খাদ্যশস্য লুঠ করেছে — সেই সব দুস্কৃতিকেই ইংরেজ সরকার বড় করে ফলাও করে প্রচার করেছে। চোর, ডাকাত, লুঠেরা আখ্যায় ভূষিত করেছে নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতে। এমনকি ব্রিটীশ সরকারের ধামাধরা ইতিহাস লেখকেরা এইসব নির্যাতিত মানুষদের মূর্তিমান বিভীষিকা বলে বিশেষিত করেছে।

অপরাধ ও অপরাধিত্বের জন্য দায়ী করা হয়েছিল প্রধানতঃ নিম্নবর্গীয়দের। বলা হয় এই দুস্কর্মকে জীবিকা হিসাবে যারা গ্রহণ করেছিল তারা উপজাতি গোষ্ঠীর ভূমিজ খয়রা, বাউরী, লোহার, বাগদি ও মুসলমান সম্প্রদায় যারা এককালে তুঁতের চাষ করত। এইসব জাতির লোকজন জমিকারের অধীনে নানা কাজে নিয়োজিত ছিল লাঠিয়াল, দারোয়ান, বরকন্দাজ, পাইক থানাদার প্রভৃতি। এদের যেসব চাকরাণ জমি ভোগের অধিকার দেওয়া হয়েছিল সেগুলি ব্রিটীশ আমলে বাজেয়াপ্ত হয়। ব্রিটীশ ভূমি ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে ঘাটোযালী ব্যবস্থায় ভাঙন ধরে চৌকিদারীদের চাকরাণ জমি, সীমান্দারি জমির অধিকারের অবলুপ্তি ঘটানো হয়েছিল। এগুলি ছিল বংশানুক্রমিক বৃত্তি। এদের চাকরাণ জমি বাজেয়াপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে এক সামাজিক মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনা হয়েছিল। গভর্ণর জেনারেল হেস্টিংস ১৭৭৪ সালের ১৯শে এপ্রিল সিলেক্ট কমিটিকে পাঠানো নোটে বলেছিলেন যে প্রাক্ ব্রিটীশ আমলে চুরি ডাকাতি প্রতিরোধে গ্রাম ও জেলা পাহারা দেওয়ার জন্য থানাদার ও পাইকদের যে চাকরাণ জমি ভোগের অধিকার দেওয়া হয়েছিল সেগুলি ব্রিটীশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেওয়ায় তারা বৃত্তিচ্যুত হয়ে ডাকাতে পরিণত হয়েছে। পরিসংখ্যান বলে যে ১৭৮১ সালে নিম্নবর্গীয়দের বিদ্রোহ ১৭৮৯-৯১ প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহ এবং ১৭৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দের চুয়াড় বিদ্রোহ বা ১৮৩২ সারে গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামাতে সব চেয়ে বেশী খাদ্য দ্রব্য লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটেছে। যা সাধারণ মানুষের প্রবল অন্নাভাবেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। আরও দেখা যায় ১৮২১ এবং ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্রোহীরা বিকল্প জীবিকার সুযোগে আগের মতই পরম্পরাগতভাবে রাজভক্তি পরায়ণ হয়ে উঠেছে। তাই একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে প্রধানত অভাব বিশেষভাবে অন্নাভাব, যেটি হয়েছিল জীবিকা ও ভূমিচ্যুতির কারণে সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষ, চড়া হারে রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কারণে - নিম্নবর্গ অপরাধের পথে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এখানে situation তাদের বাধ্য করেছিল একমাত্র অস্তিত্ব রক্ষার সংকট মোকাবিলায় - সেই সঙ্গে যারা অপরাধি হিসাবে চিহ্নিত করে এক দীর্ঘ গল্প ফেঁদে গিয়েছেন ডাকাত, দাগী চোর শব্দে ভূষিত করেছেন তাদের প্রভু সরকার কিম্বা সরকারী দপ্তর এদের বিকল্প বাঁচার রাস্তা দেয়নি। ফলে নিতান্তভাবে প্রাণের দায়েই এই নিম্নবর্গীয়েরা চুরি ডাকাতি লুঠেরার পথ গ্রহণ করেছিল। জেলা গেজেটিয়ারে রয়েছে এক বড় গল্প — Organised bands of docuits, who commit numerous dacoities .... composed cheifly of Bhumijies formerly known locally as chuars or robbers committed crime not only in Bankura .... Among those who have acquired notoriety as docoits the Lohars and the Tuntia Musalmans may be mentioned. They are a Mahammadan Caste, whose traditional occupation is Cultivation of tunt for feeding silkworm. The occupation having become less profitable of late years..... While others are professional thieves and docoits". অপরাধিত্ব নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হওয়া বা অপরাধিত্বকে পেশা হিসাবে যারা গ্রহণ করেছিল আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তারা উপজাতীয় গোষ্ঠী ও তুঁতিয়া মুসলমান। সন্দেহ

করা যথেষ্ট স্বাভাবিক যে অপরাধ যতটুকু তার অনেকগুণ বেশী সরকারী প্রশাসনিক প্রচেষ্টা ও প্রচার পেয়েছে কিন্তু অপরাধিত্বের কারণ খোঁজা ও তার প্রতিকারের চেষ্টা সে তুলনায় একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। প্রথমতঃ নিম্নবর্গীয়দের ইংরেজরা মানুষ হিসাবেই গণ্য করত না। কালো চামড়ার নিম্নবর্গকে ঘৃনাই করত। কথায় বলে যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। অপরাধি ও অপরাধিত্ব দমনের নামে বহু নিরীহ মানুষকে দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে। এর উদাহরণ হিসাবে আমি দুটি বৎসরের খতিযান তুলে ধরে এটি পরিষ্কার করার চেষ্টা করবো। ১৮৪৫ ও ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ ডাকাতি ছিল ২৯টি ও ১৬টি চুরির সংখ্যা ছিল ২১৩ ও ৩৪৫, গরুচুরির সংখ্যা ছিল ১২ ও ৩৪। মোট সংখ্যার বিচারে দুবছরে অপরাধের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৩৫ ও ৮০৪। দণ্ডিতের সংখ্যা ছিল ৬৪০ ও ১৪৫০, বেকসুর খালাসের সংখ্যা ছিল ৫০৮ ও ৩৪৪। ইংরেজ পুলিশ যাকে তাকে যখন তখন চুরির কেসে চালান করত অপরাধি হোক বা না হোক নয়তো বছরে এত বেকসুর খালাসের সংখ্যা হয় কিভাবে। নানাভাবে নিম্নবর্গীয়দের ইংরেজ বিরূপতা বিশেষ করে নিম্নবর্গীয়দের গণ অভ্যুত্থানগুলির পর থেকে এদের ওপর অবিচার নির্যাতন ও নানাভাবে বিপর্যস্ত করে এদের মেরুদণ্ড ভেঙেদেবার জন্য নানা কৌশল নিয়েছিল প্রশাসন। চুয়াড়দের হাতে ইংরেজ পুলিশের হেনস্তা এরা সহজ মনে গ্রহণ করেনি। অপরাধ ও অপরাধিত্ব নির্ণয়ে বহু পক্ষপাতিত্বের ঘটনা ঘটেছে, বিনা অপরাধে ও অনেক মানুষকে চুরি ডাকাতির মামলায় ঝোলানো হয়েছে।

জেলার অপরাধের (সরকারী) খতিয়ান ঃ

বাঁকুড়া শহরকে কেন্দ্র করে জঙ্গলমহল জেলা গঠিত হওয়ার প্রারম্ভ থেকেই এখানের অপরাধিত্ব ব্রিটীশ প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছিল। ১৮০৮ সাল নাগাদ ফৌজদারী মামলার সংখ্যা ছিল চুয়ান্ন, গ্রেপ্তার হয়েছিল দুশোর বেশী অপরাধঘটিত কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল দুশো তেত্রিশ জন। এর ভেতর কিছু মানুষ বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে জানা যায়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি ৫০০ জনের ভেতর একজন গড়ে ছিল মারাত্মক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত (সরকারী তথ্য অনুযায়ী) বছরে খুনের ঘটনা ছিল গড়ে ত্রিশটিরও বেশী। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তা বেড়ে গিয়েছিল পঞ্চাশ শতাংশ। পরবর্তী দশ বছরে অপরাধিত্বের মাত্রা কমে যায়। ১৮২৩ থেকে ১৮২৬ পর্যন্ত অপরাধের বার্ষিক গড় ছিল দু'হাজারের সামান্য বেশী। এসব ঘটনায় জড়িত ছিল চার হাজার মানুষ। ১৯২৬ সালে শতকরা ৪২ শতাংশ অপরাধ ও অপরাধির সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল।

অপরাধিত্ব সম্পর্কে অপর একটি তথ্যে দেখা যায় যে জেলার চৌকিদার ও ঘাটওয়ালাদের একটি অংশ কম বেশী অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল নানা কারণে। কেননা দেখা যায় ১৮৩৫ তেকে ১৮৩৭ মোট তিন বছরে ২৩৪ জন চৌকিদারকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয় বিভিন্ন অপরাধের জন্য। যেমন অবাধ্যতার জন্য চারজন অর্থ তছরূপের দায়ে ষোল জন অপরাধমূলক কাজে উৎসাহ দান ও পরোক্ষে মদত দেওয়ার কারণে তেত্রিশ জন মিথ্যা ভাষনের জন্য দুজন মারধর করার জন্য ষোলজন চুরি বা ডাকাতিতে মদত দেওয়া বা নিষ্ক্রিয় থাকার কারণে একশো সাতজন সিঁধ কাটার জন্য নজন খনের অভিযোগে চৌদ্দ জন বরখাস্ত হয়েছিল। অপরদিকে ঘাটওয়ালারা ও ঠিকমত অপরাধিদের উপর নজর রাখত না এবং পুলিশকেও এ সম্পর্কে আগাম খবর পাঠাত না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জেলায় খাটওয়াল ছিল ৩,৮২৯ এবং চৌকিদার সীমাদ্দার অষ্টপ্রহরী মিলিয়ে ছিল ৩৬৩৯ জন। এদের জন্য চাকরাণ ভোগী জমির বরাদ্দ ছিল প্রায় কুড়ি হাজার বিঘা। গ্রামগুলিতে পাহারার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু চুরি প্রভৃতি অপরাধ বেড়ে চলছিল ডাকাতি ও সংঘটিত হত। যেমন ১৮৪৬ সালে ডাকাতির সংখ্যা ছিল ১৬। ১৮৪৫-৪৬ সালে অপরাধের সংখ্যা ছিল দু বছরে ৭৩৫ ও ৮০৪। গরু চুরির সংখ্যা ১২ ও ৩৪। সাধারণ চুরির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২১৩ ও ৩৪৫। জেলা গেজেটিয়ারে ও'ম্যালী এ জেলায় ৮টি ডাকাত দলের তৎপরতার কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু এই ডাকাত দলগুলির প্রধান কেন্দ্র বাঁকুড়া ছিল না। দেখা যায় ১৮৯০ থেকে ১৮৯১ পর্যন্ত জেলায় ২২টি ডাকাতি ও ৫০টি সিঁধকাটা চুরি সংঘটিত হয়। তবে ডাকাতির তুলনায় ছিঁচকে চুরির সংখ্যা বেশী ছিল।

বেশীরভাগ বাড়ী মাটির হওয়ায় সিঁধ কেটে চুরির একটা হিড়িক ছিল। এই সিঁধ হল লোহার তৈরী একটি যন্ত্র। রাত্রে চোর কর্মকার বাড়ীতে ফেলে যেত এবং সঙ্গে এক টাকা চার আনা থাকত। কর্মকার সিঁধকাঠি তৈরী করে যথাস্থানে রেখে দিত। কর্মকারে চোরে দেখা হওয়ার সুযোগ ছিল না। এই সিঁধ কাঠি মাটির দেওয়ালে লাগিয়ে বড় গর্ত করে চোর অনায়াসে ঘরে ঢোকায় অভ্যস্ত ছিল। আর ছিল রণ-পা। রণ-পার সাহায্যে বহু দূর থেকে এসে চুরি করা যেত। দুটি লম্বা বাঁশের সাহায্যে চলা। এই রণ-পা দিয়ে মাঠে, গোঠেও অনায়াসে যাওয়ায় অভ্যস্ত ছিল চোরেরা। রণপার ব্যবহার বেশী ছিল গ্রামাঞ্চলে। রণ-পাতে পথ চলায় এতখানি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল অপরাধির দল যে দূর-দূরান্তর থেকে অতি দ্রুত লক্ষ্যস্থানে পৌছানো যেত।

১৮৫৭ থেকে ১৮৭১ পযন্ত জেলে আটক কয়েদীদের পরিসংখ্যা থেকে দেখা যায় যে ১৮৫৭ সালে ছিল ৩৬৯ জন, ১৮৫৮ তে ৪৭৬ জন, ১৮৫৯ এ ৪৮৩ জন, ১৮৬০ এ ৩৬০ জন, ১৮৬১ তে ৩২১ জন, ১৮৬২ তে ৩৮২ জন, ১৮৬৩ তে ৪২৮ জন, ১৮৬৪ তে ৪০৯ জন, ১৮৬৫ তে ৪৯৭ জন, ১৮৬৬ তে ৬৫০ জন, ১৮৬৭ তে ৫৫৭ জন, ১৮৬৮ তে ৫৩২ জন, ১৮৬৯ এ ৪২২ জন, ১৮৭০ এ ৩৬৯ জন, ১৮৭১ এ ২৮৭ জন এই অপরাধিত্ব ছিল নিম্নবর্গীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মুসলমানদের একাংশও অপরাধি হিসাবে ছিল চিহ্নিত।

বাঁকুড়া জেলা বা জঙ্গলমহল চিরকালের দূর্ভিক্ষ প্রপীড়িত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের আগে ও পরে ও দুর্ভিক্ষ লেগেই ছিল, অবশ্য ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মত অত ব্যাপক না হলেও ক্ষয়ক্ষতি বড় কম ছিল না। ১৮৭৪ সাল থেকে শতাব্দীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক কমবেশী খরা ও দুর্ভিক্ষ লেগেই ছিল। গ্রাম প্রধান বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দুর্ভিক্ষের দুর্ভাগ্যে আবর্তিত মানুষদের রক্ষা করতে ইংরেজ সরকারের ঔদাসীন্য ও অনীহা দারুণ বিপর্যয় ডেকে এনেছিল সামাজিক জীবনে। ফলে বহু মানুষকে চোর লুটেরা তৈরী করে দেয় এই পরিস্থিতি। এরই ভেতর বাঁকুড়ায় এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় ব্যক্তি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল আঞ্চলিকভাবে নিপীড়িত মানুষদের বাঁচানোর ভার। এরা ধনী বাড়ীতে ডাকাতি করতো আর সেই অর্থ গরীব না খেতে পাওয়া মানুষজনকে বন্টিত করার কাজে নিয়োজিত ছিল। বেশ কয়েকজন এধরণের ডাকাতের কথা মুখে মুখে শোনা যায় আজও। এরা চিঠি দিয়ে জানিয়ে ডাকাতি করতো। এই অপরাধীদের কিন্তু সামাজিকভাবে একটা বিশেষ স্থান ছিল সর্বহারা মানুষজনের মধ্যে। শোনা যায় ধনীগৃহে দোতলা বাড়ীতে বড় পেরেক লাগিয়ে অনায়াসে উঠে যেত ডাকাত আর রাত্রির যে ঘন্টা ব্যবহার করা হত বনেদী বসতিগুলিতে সেই ঘন্টার শব্দের আড়ালে এই পেরেক গাঁথার শব্দকে তারা আড়াল করে রাখতে পারতো। ফলে কেউই জানতে পারতেন না। যেন ঠিক রূপকথার মত। এই দুর্ধর্ষ ডাকাতের কথা আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ইনি পাঞ্চাব খাঁ। তেমনি আরও কিছু সেকালের কুখ্যাত ডাকাতের কথা দীর্ঘকাল মানুষ মনে রেখেছে তাদের বিচিত্র সব রোমহর্ষক ঘটনার জন্য। নতুনগ্রামের শেখ শোবান এইরকমই একটি নাম। দামোদরপুরের অমূল্য রায় এক বিচিত্র কৌশল জানত। চুরিতে সিদ্ধহস্ত অমূল্য জমিদার বাড়ীতে চুরি করা মোহর গিনি সহজেই গলার ভেতর রেখে দিতে সমর্থ হত। সন্দেহ করা হয় যে ওর গলার ভেতর নাকি এক বিচিত্র জায়গা তৈরী করে নিয়েছিল যেখানে অলঙ্কার গিনি মোহর লুকিয়ে রাখা যেত। রণ-পাতে অভ্যস্ত ছিল দুর্ধর্ষ চোর ডাকাতেরা, সহজ সোজা রাস্তায় এরা চলত না। মাঠে গোঠে নদীতে দ্রুত চলতে সক্ষম হত এরা। রণ-পা দিয়ে অতি দ্রুত পৌছে যেত এরা অকুস্থলে আবার অপরাধ সংঘটিত করে দ্রুত সরে আসতো। বাস্তবিকই রণ-পাতে এত দক্ষ ছিল এরা। তখনকার প্রায় অধিকাংশ অপরাধিই দূরে যাবার জন্য রণ-পা ব্যবহার করতো। শোনা যায় বেশ কয়েক ক্রোশ রাস্তা এরা অতিক্রম করতো অত্যন্ত কম সময়ে।

জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত অপরাধি ঃ

ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনের ঢেউ অন্যান্য স্থানের মত এই জেলাতেও আছড়ে পড়েছিল। দুটি ধারায় এই আন্দোলন সংঘটিত হয়। অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন। এখানে

বিপ্লবী আন্দোলনের ছিল একটি গুপ্ত ঘাঁটি। অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল দুটি শাখারই কর্মপ্রয়াস ছিল উল্লেখযোগ্য। বাঁকুড়া জেলার ঘন অরণ্যাবৃত অঞ্চল ছিল যোগাযোগহীন। সড়ক পথ ভাল ছিল না তাই পুলিশ বা গোয়েন্দাদের পক্ষে রাজদ্রোহীদের গতিবিধি লক্ষ্য করা বা খোঁজ খবর রাখা ছিল কষ্টসাধ্য। এমনিতেই এই জেলা ছিল আপাত শান্ত, এখানে তেমন কোন আন্দোলন বড় একটা সংঘটিত হত না। বিপ্লবীরাও এখানে তাদের কোনরকম কর্মসূচী জেলায় রাখতেন না। জনসাধারণ ছিল শান্ত নিরীহ এবং অশিক্ষিত তাই এখানে পর্যাপ্ত গোয়েন্দা বা পুলিশ রাখা হত না। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছিল বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলি এবং বাঁকুড়াকে তারা একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। এখানে বসে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হত। অস্ত্রশস্ত্র মজুত করা হত লাইব্রেরীগুলি ও আখড়াগুলির ভেতর। বাঁকুড়া শহর থেকে তো বটেই এমনকি অরণ্য সংলগ্ন গ্রামগুলির অন্তরালে বসে বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো। বিপ্লবীরা ছিল রাজদ্রোহী তাই ব্রিটীশ প্রশাসনের চোখে তারা ছিলেন কুখ্যাত ক্রিমিন্যাল।

বাঁকুড়ার অরণ্য পথ ধরে ছেন্দাপাথর অম্বিকানগর এবং জঙ্গলের করিডোর দিয়ে সরাসরি মেদিনীপুরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল খুব সুবিধাজনক। দরিদ্র জেলা বলে বহু স্থানের বড় বড় বিপ্লবী নেতারা এখানে আসতেন সাংগঠনিক কাজে। ওয়েলেসলিয়ান কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবী মন্ত্রে এরাই জ্বালিয়েছিলেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ। বিষ্ণুপুরের আগ্নেয়াস্ত্র তৈরীর কারখানা এবং সিমলাপালের গুলি বন্দুক কার্তুজ তৈরীর কারখানার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখতো ছাত্ররা। এরা বিপ্লবী বুলেটিন প্রচার পত্র বিলি করত। ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বিপ্লবীরা গ্রামাঞ্চলে বক্তৃতা দিতেন। ১নং ব্লকের সম্ভ্রান্ত জনপদগুলি যেমন হেলনা শুশুনিয়া, সানাবাঁধ, কেঞ্জাকুড়া, উড়িয়ামা, কুমিদ্যা প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল। হেলনা শুশুনিযার অনেক যুবক বিপ্লববাদে দীক্ষিত হন। সিমলাপালের অস্ত্র কারখানা তল্লাসীর সূত্র ধরে বহু বিপ্লবী ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। কুমিদ্যা গ্রামের যামিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বহু তরুণ ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। ইনি ১৯৩৩ সালে গ্রেপ্তার হন। তেমনি গ্রেপ্তার হন শুশুনিয়ার ব্যানার্জী পরিবারের গৌরীপদ সহ বেশ কিছু তরুণ ছাত্র। বিপ্লবী নেতা ও অনুশীলন সমিতির বাঁকুড়ার সংগঠক প্রফুল্ল কুণ্ডু বিভিন্ন গ্রামে সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৩০ সালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সত্যাগ্রহে এই ব্লকের অসংখ্য মানুষ যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের কর্মীরা মিলিতভাবে বাংলার ছোটলাট জন অ্যান্ডারসনকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। এই কাজে সমৃদ্ধ গ্রামগুলির কিছু বাছাই তরুণ ছাত্রকে যুক্ত করা হয়। নানা কারণে এই পরিকল্পনা কার্যকর হয়নি। যামিনীকান্তকে পরে নজরবন্দী করা হয়। অন্যান্য অনেকে গ্রেপ্তারের পর প্রমানাভাবে মুক্তি লাভ করেন। বিপ্লবী কাজের উন্মাদনায় অনেকেই বিপ্লবী গোষ্ঠীতে নানা কাজ যেমন ডাক লুঠ, ট্রেন ডাকাতি প্রভৃতিতে অংশ নেন, কিন্তু সেইসব নাম আজও অজ্ঞাত থেকে গিয়েছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং তার পরের অবস্থা ঃ

প্রবাসী ১৩৩০ এর চৈত্র সংখ্যায় 'বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা' প্রবন্ধে রামানন্দ চট্টোপাদ্যায় ১৯২১ সালের গণনা অনুসারে দেখিয়েছেন বাঁকুড়া জেলাতেই বেশী লোকসংখ্যা কমে যাচ্ছে কারণ বাঁকুড়ায় মোট যত জমি আছে তার শতকরা ৩৩ ভাগ চাষ হয়ে থাকে। রামানুজ করের 'বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষের বিবরণ', 'কেঞ্জাকুড়ায় অন্নক্লিস্ট স্বজাতিদের তালিকা' বা 'বাঁকুড়ায় ভীষণ অন্নকষ্ট' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে বাঁকুড়া শহর-লাগোয়া সমৃদ্ধ জনপদগুলির হতশ্রী রূপ ফুটে উঠেছে। বাঁকুড়া ১নং ব্লকের অধীন গ্রামগুলির বেশীরভাগ গ্রামেরই মানুষ চাষবাসের সঙ্গে কোন না কোনভাবে যুক্ত এমনকি বড় গ্রামগুলিতেও মূল জীবিকা ছিল চাষ। এক বিশাল সংখ্যক মানুষ জমিহীন কৃষিমজুর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে এদের জমি ছিল। জমিদারের প্রজারা ছিল একরকম স্বাধীন। এই বন্দোবস্তে কৃষকদের স্বার্থ ও স্বত্ব রক্ষার ব্যবস্থা না নিয়ে জমিদার ও পত্তনীদারদের স্বার্থ রক্ষা করে কৃষকদের জমিদারদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল করা হয়েছিল। পুরানো জমিদারগণ জমির অধিকার হারানোতে কৃষকরা সর্বশান্ত হল। পটনীদার প্রথা জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে দিল। জমিদার রক্ষক না হয়ে ভক্ষকে পরিণত হয়ে রায়তদের চরম সর্বনাশ ডেকে আনে। জমির বে-আইনী খাজনা

ও করের বোঝা বইতে না পেরে বহু কৃষককে কৃষি মজুরে পরিণত করল। Poverty is the cause of crimes. রমেশচন্দ্র দত্তের The peasant of Bengal এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষকদের দুঃসহ অবস্থার চিত্র পরিস্ফুট। ১নং ব্লকের প্রায় দেড়শত গ্রামের অধিকাংশ গ্রামের মানুষের এভাবেই জমি হারিয়ে গিয়েছে। কৃষক কৃষি মজুরে পরিণত হয়েছে। অন্নসংস্থানের জন্য তাদের বিগত দিনে দুয়ারে দুয়ারে ফিরতে হয়েছে, এক এলাকা থেকে অন্যত্র গিয়ে ঠিকে কাজে বহাল হতে হয়েছে। মৌজার পর মৌজার হাত বদল হয়েছে সূর্যাস্ত আইনে বার বার। নতুন নতুন ইজারাদার জমিদার পত্তনীদারের ভাগ্য খুলেছে আর জমির সঙ্গে যাদের প্রাণের সম্পর্ক তারা সর্বস্ব হারিয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছে। পেটের দায়ে চুরি, লুঠতরাজ, রাহাজানি করতে বাধ্য হয়েছে। ইংরেজ সরকারের কৃষি ব্যবস্থা তাদের অপরাধি করে তুলেছে। এক একটি ক্ষুদ্র জমিদারের হাতে দু'চারশো মৌজা থাকলেও সেইসব জমিতে সবার কাজ জুটেনি। যাদের জুটলো তাদেরও নিরাপত্তা নেই। নয় আনা পাঁচ আনা ভাগে কোথাও দশ আনা ছয় আনা ভাগে এরা পত্তনিদারের কাছ থেকে চাষ করার মৌখিক অনুমতি পেলেও তা অস্থায়ী। কোথাও আবার সাজা গুনতে হয় উৎপাদন হোক বা না হোক। দুর্ভিক্ষের অশনি সংকেত, খরা, বৃষ্টির অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হলেও সাজা ঠিকই আদায় দিতে হত। দেরী হলে সুদ গুণতে হত। চাষে তাই বেশীর ভাগ ছোট কৃষকের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠত। সারা বছর পরিশ্রম করেও দুবেলা খাবার জুটত না, এদের রোগে চিকিৎসা হত না পরণের কাপড় কেনার অর্থ ছিল না - লেখাপড়া করানো তো দূর অস্ত।

ব্রিটিশ আমল থেকে যে ঐতিহাসিক ভৌগোলিক ও আর্থসামাজিক কারণে অপরাধিত্বের শুরু প্রধানতঃ নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে তার কিন্তু মূলোচ্ছেদ করা যায়নি। দারিদ্র্য, কর্ম-সংস্থানের অভাব, শস্যহানি, খাদ্যাভাব একদিকে অন্যদিকে সরকারী ভাবে এইসব দরিদ্র কর্মহীন মানুষের জন্য তেমন করে ভাবনা হয়নি বহুকাল। ১নং ব্লকের আর্থ সামাজিক অবস্থা জেলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে কিছুটা পৃথক। গ্রামগুলিতে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ, সুঁড়ি, গোয়ালা প্রধান কয়েকটি মুসলমান প্রধান গ্রামও রয়েছে। এখানের অপরাধ প্রবণতা প্রথম দিক থেকেই সামান্য কয়েকটি সীমিত গ্রামের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত। বাকী জনপদ শান্ত, কষ্ট সহিষ্ণু সরল মানুষের জীবনযাত্রা সমৃদ্ধ। চাষবাসই মূলতঃ এইসব গ্রামের প্রধান জীবিকা। বর্দ্ধিষ্ণু কয়েকটি জনপদে চাকুরীজীবি আছেন বরাবরই। নিম্নবর্গীয়দের ভেতর সুদূর অতীত থেকেই রয়ে গিয়েছে ধর্মচেতনা, সংকীর্তন নামগান ও ভক্তিভাবের পরম্পরা। মুসলমান প্রধান গ্রামগুলি বাদ দিলে তেমন অপরাধিত্ব খুব কমই পরিলক্ষিত হয়েছে। একেবারে স্বাধীনতার কাল ও তার পরবর্তীকাল পর্যন্ত জেলার অপরাধ প্রবণতার সঙ্গে তুলনা করতে বসলে দেখা যায় অন্যান্য স্থানের তুলনায় এই অঞ্চলটি অনেকাংশেই কম অপরাধ প্রবণ। দু'চারটি পকেট বাদ দিলে বাকী সমস্ত ব্লকটিই অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্ত। শান্তিপূর্ণ অঞ্চল বলা যেতে পারে। অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন "As regards incidents of Crime Bankura may be considered a normal District." বাঁকুড়া জেলা যদি Normal হয় তবে ১নং ব্লককে বলা যায় অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ অঞ্চল।

স্বাধীনতার এক যুগ পরে বাঁকুড়া জেলার অপরাধিত্বের চিত্র ঠিক একই রকম ঃ-

	ডাকাতি	রাবারি	বার্গলারি	চুরি	পশুচুরি	খুন
১৯৬০	১৬	২১	২৭২	৪০৮	১০	৭
১৯৬১	১৫	১২	২৩৫	৪৮৭	১৮	২৩
১৯৬২	৩৮	১৫	২৯৬	৫০৭	১৩	২৬
১৯৬৩	২৮	১৭	২০১	৫৪৫	১৮	১৪
১৯৬৪	২৫	১৩	২০১	৪১৯	২২	২৯
১৯৬৫	১৯	১০	২৮১	৪৪৩	১৭	২৪

স্বাধীনতার সময় থেকে পরবর্তী পনের বছরের অপরাধিত্বের কারণে মামলার খতিয়ান ঃ-

	রেফার কেস	ক্রিমিন্যাল কেস	ক্রাইম মোটিভ
১৯৪০	৫৭	৯১	৪১
১৯৫০	২৯	৩৮	২৬
১৯৫৫	৩৭	৯৬	৩৬
১৯৬০	৩২	১২০	৫৮

* Contrasting the total no. of cases lodged against the population of 1872 we find that the ratio between population and crime was 118% while the same in the year 1961 was 117%. Overall decrease in the crime figure only 1%. প্রায় ৯০ বছরে জেলার অপরাধিত্ব হ্রাস পেয়েছে শতকরা মাত্র একভাগ। জেলা গেজেটিয়ারে (১৯৬২) রাজ্যের অপরাধিত্বের সঙ্গে তুলনা করে জেলাকে Normal বলা হয়েছে।

	ডাকাতি	বার্গলারী	পশুচুরি	চুরি	খুন	সেক্স ক্রাইম
পশ্চিমবঙ্গ	১.৭৮	৩০.৯৪	২.৩৮	৫৯.০৮	১.৩৭	৪.৪৫
বাঁকুড়া	৩.০৭	২৯.৯০	২.১৭	৫৯.১৪	২.৮৬	২.৮৬

তুলনামূলক ১নং ব্লকের অবস্থা very normal । দু'চারটে যে বিশেষ অপরাধিত্বের spot রয়েছে সেখানে অপরাধের মধ্যে বেশীর ভাগটাই চুরি, ছিনতাই, অবশ্য রাহাজানির ঘটনাও ঘটেছে কিন্তু খুন ও ডাকাতি অত্যন্ত কম। পশুচুরির ঘটনা ঘটেছে কিছু ক্ষেত্রে। তবে জেলার অপরাধিত্বের তুলনায় তা অনেকখানি কম সংখ্যার দিক দিয়ে। নতুন গ্রাম বনকাটি, কাপিষ্টা, কেঞ্জাকুড়া প্রভৃতির মত কিছু কিছু স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে অপরাধ সংঘটিত করার জন্য অপরাধি রয়েছে বহুকাল থেকেই। এগুলি অনেক ক্ষেত্রেই উত্তরাধিকার সূত্রে অপরাধকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ঃ স্বাধীনতার পূর্বের থেকেই গ্রামগুলি ছিল অবহেলিত। গ্রাম স্বরাজের কথা বারবার উচ্চারিত হলেও তেমন করে গ্রামের দিকে নজর দেওয়া হয়নি এমনকি স্বাধীনতার পরের তিনটি দশক ধরে অবহেলিত হয়েছে গ্রাম। গ্রামীন মানুষের সংখ্যা বেশী - অনেক বেশী কিন্তু তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মসংস্থান এর বিষয়টির দিকে মোটেই নজর দেওয়া হয়নি। অভাব আর দারিদ্রের নিস্পেষনে জর্জরিত এই ১নং ব্লকের মানুষজনও। মজুরী নেই, ব্যাপক কাজও নেই। মুনিষ মাহিন্দার খেটে জীবিকা অর্জনের জন্য তাদের দূরে দূরান্তরেও যেতে হয়েছে। ছয়ের দশকে প্রচণ্ড খরায় এদের লঙ্গর খানায় লাইন দিতে হয়েছে - এক কিলো মাইলো বাজরার জন্য হাত পাততে হয়েছে। নিদারুণ দারিদ্র্যের তাড়নায় এদের শিক্ষা স্বাস্থ্যও হয়েছে চরম অবহেলিত অপুষ্টি অনাহার নিত্যসঙ্গী হয়েছে তিনটি দশক জুড়ে। ফলে Situation তাদের কিছু কিছু অংশকে বাধ্য করেছে ছোটখাট অপরাধ কর্ম করতে। বঙ্কিমবাবুর ভাষায় "খাইতে পাইলে কি কেউ চুরি করে? কিন্তু খাবে কি? সারা বছরের কাজ নেই। বছরের সামান্য দিন টেষ্ট রিলিফের কাজ সরকারী দাদন ও নামমাত্র রুজি রোজগার। কেউ কেউ শাকশব্জী ফলাবেন তো নিদারুণ খরা। এই সময় বৃত্তিচ্যুতির ঘটনা ব্যাপক ঘটেছে। চাষের সময় কিছু কিছু কাজের সংস্থান হলেও বাকী সময় বনের কাঠ সংগ্রহ পাথর খাদানের কাজ, তাঁত, বিড়ি বাঁধাই এর কাজ বনজ কেন্দু বহেড়া আমলকি সংগ্রহ করে বিক্রি, মুড়ি ভেজে বিক্রি করা প্রভৃতি নানা কাজে লিপ্ত থেকেও পেট ভরতো না। চুরি ছিনতাই, রাহাজানি নিত্য লেগে থাকত। দু-একটি স্পট ছিল চিহ্নিত অপরাধ সংঘটিত করার জন্য। এর ভেতর অন্যতম হল পোয়াবাগানের পরে উজানী জোড় নামে স্থানটি, গোলামীর তড়া ইত্যাদি।

খাদ্য সংকট তৈরী হয়। ভেজাল চোরাকারবারে ছেয়ে যায় চতুর্দিক। খাদ্য আন্দোলনও হয় চরম বিশৃঙ্খলার এক অধ্যায় গিয়েছে ষাটের দশকের শেষ থেকে সত্তরের প্রথম দিক পর্যন্ত। এর পর সর্বত্র এক পরিবর্তন সূচীত হয়।

পঞ্চায়েতী রাজ কায়েম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলার অন্যান্য ব্লকের সঙ্গে ১নং ব্লকের আর্থসামাজিক পটভূমি বদলাতে থাকে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ফলে গ্রামীণ উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতির পট বদলাতে শুরু করে। পঞ্চায়েত নির্ণায়ক ভূমিকায় আসার সঙ্গে সঙ্গে এবং সেই সঙ্গে ভূমি সংস্কার বর্গা এবং ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বন্টিত হওয়ায় এক নতুন দিশা খুঁজে পায় এতদিনের অবহেলিত গ্রামের মানুষ। কৃষির ওপর গুরুত্ব আরোপিত হওয়া পঞ্চায়েতের বহুমুখী কর্মপ্রয়াসের সঙ্গে গ্রামীণ মানুষকে যুক্ত করার ফলে, উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত শস্যের ন্যাহ্য মূল্য প্রাপ্তি, কর্মসংস্থানের নানা দিক উন্মোচিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে মজুরী বৃদ্ধি পাওয়ায় এতদিনের ন্যুব্জ গ্রামীণ অর্থনীতি ধীরে ধীরে চাঙ্গা হয়ে উঠতে থাকে। কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ করে জলসেচের জন্য চেকড্যাম তৈরী উৎপাদনমুখী কর্মসূচীতে বাগান তৈরী, মাছ চাষের জন্য পুকুর খনন বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষের পুঁজির জন্য ব্যাঙ্কের সহায়তায় বিনিয়োগ, গৃহপালিত জন্তু সরবরাহ করে জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে, নানা ধরণের বৃত্তি ঋণ ও ভাতার ব্যবস্থা প্রভৃতি বহুমুখী কর্মসূচীর মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মানকে উন্নীত করতে, দারিদ্র্য-দূরীকরণে পঞ্চায়েত বিশেষ ভূমিকা নেওয়ায় সর্বত্র সুফল পরিলক্ষিত হচ্ছে। শুধু ব্লক-১ নয় এই ধারা অব্যাহত সারা জেলায়।

মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই অপরাধ ও অপরাধিত্ব হ্রাস পেয়েছে জেলার তথ্যে তার প্রমাণ মেলে —

	ডাকাতি	রাবারি	বার্গলারি	চুরি	খুন
২০০২	১২	৯	৬	২১৫	৩৯
২০০৩	১১	৯	১১	২৪২	৪১
২০০৪	১০	২১	১০	৩৭৪	৩৭
২০০৫	২৫	২৮	১৩	২১৯	৫৩
২০০৬	৯	১৬	৬	৩৩০	৫৪

সারা জেলার চিত্র এই রকম। বাঁকুড়া ব্লক ১ এ মাত্র কয়েকটি Crime pocket ছিল। সেগুলির মধ্যে যে অপরাধ প্রবণতা তা অনেকটাই উত্তরাধিকার সূত্রে। দারিদ্র্য দূর হওয়ায় অপরাধ একেবারে কমে গেলেও পরম্পরাগত অপরাধ রয়ে গিয়েছে নূতন গ্রাম, বনকাটি প্রভৃতি স্থানে। এটিকে নির্মূল করতে জেলা প্রশাসনও যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছেন। কুখ্যাত অপরাধী শেখ ইস্রাফিলকে ইতিমধ্যেই সমাজের মূল স্রোতে ফেরানো হয়েছে। প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত একযোগে কাজ করছেন। শেখ ইস্রাফিল বর্তমানে দোকান দিয়েছেন এবং সুস্থ জীবনযাপন করছেন। কেঞ্জাকুড়ার সমাজবিরোধী জীবন কর্মকারকে মূলস্রোতে ফেরাতে উদ্যোগী হয়েছে পুলিশ প্রশাসন। তেমনি শেখ খোকন জেলে থাকলেও তার পরিবারের ওপর নজর রয়েছে। পলাতক লাল মহম্মদ, শেখ মীনারুল বনকাটির মধু বাউরী প্রভৃতি অপরাধীদের সমাজের মূল স্রোতে ফেরাতে উদগ্রীব প্রশাসন। এদের বিরুদ্ধে একাধিক ডাকাতির অভিযোগ রয়েছে। অনেকে আন্তঃজেলা অপরাধী। এরা যাতে সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারে সে ব্যাপারে পঞ্চায়েতের সঙ্গে একযোগে প্রশাসন কাজ করতে উদ্যোগী হয়েছে, যাতে পুরো ব্লকটিকে অপরাধ ও অপরাধী শূন্য করা যায়। ইতিমধ্যেই প্রশাসন এ বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছেন। ব্লক ১ এ অপরাধ বলতে বাকী থাকে দেশী মদ, বে-আইনী ভাবে তৈরী করার বিষয়টি।

মদ তৈরী করার ব্যবসা চলে আসছে বহু যুগ থেকেই। বাঁকুড়া জেলায় মহুয়া গাছের প্রাচুর্য রয়েছে এই মহুয়া ফুল বা মোল নামে পরিচিত। মোল থেকে নানা ধরণের খাবার তৈরী হয় আবার এই মোল থেকে মদ তৈরী করার

প্রক্রিয়া বহুকাল ধরে চলে আসছে কিন্তু কখনই এটিকে বে-আইনী বলা হত না। পরে ভাত থেকেও মদ তৈরী করা শুরু হয় এটিকে 'পচাই' বলে। ১৯০৯ সালে সবতপ্রথম এই দেশী মদ তৈরী করা বে-আইনী ঘোষণা করে একটি আইন তৈরী হল। দেশী মদ সরকার ছাড়া অন্য কেউ তৈরী বা বিক্রী করতে পারবে না। বাঁকুড়ার শুঁড়ি জাতি এই ব্যবসায় ছিল সিদ্ধহস্ত। এই ব্যবসা ছিল তাদের পরম্পরাগত। আইন তৈরী হলেও লুকিয়ে চুরিয়ে এই মদ তৈরী করা চলতে লাগল। সরকারীভাবে মাঝে মাঝে এই মদ তৈরীর কেন্দ্রগুলি Reid করা হত।

ষাটের দশকের একটি পরিসংখ্যান থেকে জেলার অপরাধীদের তথ্য পাওয়া যায় এই দেশীমদ তৈরী করা ও সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের কতজনকে ধরা হয়েছে বা Conviction করা হয়েছে। এই ব্লকে আগয়া, গোঁসাইডিহি, দেবীপুর, ভাতুড়ী, কাশীবেদ্যা প্রভৃতি মদ উৎপাদনের কেন্দ্র রয়েছে।

	Excise cases Lodged	No. of Conviction
1960-61	2981	2626
1961-62	3011	2658
1962-63	3077	2448
1963-64	3378	3010
1964-65	3641	3372

এই পরিসংখ্যান এর সঙ্গে বর্তমানকালের অপরাধের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে একটা জিনিষ স্পষ্ট যে মাদক (মদ) অপরাধীদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমানে হ্রাস পেয়েছে। নিচের তথ্য থেকেই তা সহজেই অনুমেয়।

	Excise cases	No. of Conviction	
2004-05	364	140	Pending in Court, Rest are departmentally Compound
2005-06	454	228	Pending in Court, Rest are departmentally Compound
2006-07	453	269	Pending in Court, Rest are departmentally Compound

১৯৮৫ সালে সংজ্ঞাহরণকারী দ্রব্য সরবরাহ ও গ্রহণের অপরাধ দমনের জন্য N.D.P.S. Act. চালু হয়। তাতে ২০০৪-০৫ সালে ৬টি কেস বর্তমানে বিচারাধীন ২০০৫-০৬ সালে ২টিকেস বিচারাধীন এবং ২০০৬-০৭ সালে কোন কেস হয়নি।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সুফল ইতিমধ্যেই গ্রামীণ বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বস্তরে পৌছে গিয়েছে। ব্লকটির মধ্যেকার গ্রামগুলির মানুষের জীবনযাত্রার মান কিছুটা হলেও বেড়েছে ফলে অপরাধবোধ ও শূন্যে এসে পৌছানোর স্তরে। স্বনির্ভরতার বিভিন্ন কর্মসূচী, বিভিন্ন যোজনার কাজ গোষ্ঠীগত কর্মধারা একশো দিনের কাজের কর্মসূচী, সেইসঙ্গে দৈনিক মজুরীর হার জীবিকা ও জীবনের সঙ্গে সেই সঙ্গে জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য হওয়ায় মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আর গ্রামগুলিতে ব্যাপক সংখ্যায় ভিখারী দেখা যায় না। দেখা যায়না অলস শ্রমহীন কর্মহীন মানুষের শুষ্ক মুখ। কোন না কোন কাজে অধিক সংখ্যক মানুষকে সংযুক্ত করার ভেতর দিয়ে গ্রামীণ উন্নতি অর্থনতিকভাবে উর্দ্ধগতি সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ব্যাপক উন্নতির সম্ভাবনা সূচিত করেছে। 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা' — পঞ্চায়েত

রাজ কায়েম হওয়ায় মানুষের কাজ বেড়েছে, কর্মসংস্থানের জন্য নানা কর্মসূচীগ্রহণ করা হচ্ছে। সাধারণ অপরাধগুলিও অনেক হ্রাস পেয়েছে বড় বড় অপরাধ এখানে আর সংঘটিত হয়না। মানুষের চিন্তা চেতনার অনেকখানি বিকাশ ঘটিয়েছে সাক্ষরতা এবং সর্বশিক্ষার কর্মসূচী। যে শিক্ষার সুযোগ একদিন ছিল না তা আজ ব্যাপ্ত। শিক্ষা আনে চেতনা, তাই চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ প্রবণতা দুর হওয়ার সম্ভাবনাকে দৃঢ় করেছে।

উত্তরাধিকার সূত্রে অপরাধ যা বংশ পরম্পরাগত এখন সেগুলির দিকে নজর রয়েছে প্রশাসন ও পঞ্চায়েতের। এইসব বংশগত অপরাধ প্রবণতাকে দূর করার জন্য পঞ্চায়েত প্রশাসনের সঙ্গে এক যোগে কাজ করছেন। সমাজের মূলস্রোতে তাদের ফিরিয়ে সুস্থ জীবন যাতে তারা যাপন করতে পারে তার জন্য তাদের সংস্থান করে দিতে, যে কোনভাবে তাদের কর্মমুখী করে তুলতে প্রশাসন চেষ্টা করছেন। তাদের কাজের সুফল ইতিমধ্যেই ফলেছে। এখনো যারা অপরাধের সঙ্গে যুক্ত তাদের সাহায্য করার জন্য প্রশাসনের ইচ্ছা রয়েছে সেই সমস্ত পরিবারগুলির ওপর নজর রাখা হয়েছে। সুযোগ এলে তাদেরও একে একে মূল স্রোতে ফিরিয়ে দিতে প্রশাসন ও পঞ্চায়েত বদ্ধ পরিকর। এভাবেই ব্লকটির সমস্ত স্থান থেকেই অপরাধ ও অপরাধিত্বের অবসান ঘটানো যাবে। এটা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষামাত্র।

অপরদিকে গ্রামে মদ্যপায়ীদের সংখ্যাও হ্রাস পাচ্ছে। নানা পরিবারের ভেতরই উঠছে প্রবল প্রতিরোধ। স্থানে স্থানে গৃহবধুরাও সংগঠিতভাবে, স্বনির্ভর দলগুলি এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন এবং তারা লাঠি নিয়ে মিছিল করে মদ তৈরীর সরঞ্জাম ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছেন; সঞ্চিত করে রাখা মদ তারা ফেলে দিচ্ছেন এভাবেই দেশী মদের যোগান ও পানের বিরুদ্ধে গড়ে উঠছে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ। যার ফলে মদ সংক্রান্ত অপরাধ ও অপরাধিত্বের সংখ্যা বহুল পরিমাণে কমে গিয়েছে পূর্বের চেয়ে।

সাধারণ অপরাধগুলিও হ্রাস পাওয়ার মুখে। সাধারণ চুরির সংখ্যাও কমের দিকে। ফলতঃ ১নং ব্লকের চিহ্নিত অপরাধ প্রবণ গ্রামগুলির অপরধিত্ব হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাটো অপরাধের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাওয়ার মুখে। আর এই সুফল এসেছে গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও বিকাশের হাত ধরে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

তথ্যসূত্র ঃ

১। বাঁকুড়া জনের ইতিহাস ও সংস্কৃতি - অধ্যাপক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী।
২। The Anuals of Rural Bengal – Hunter
৩। Bankura Gazetter – O'Malley.
৪। Bankura Gazetter – A. K. Bandyopadhyay
৫। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা।
৬। দক্ষিণপশ্চিম বাংলার ইতিহাস - ডাঃ গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায়।
৭। বাংলার মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস - ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।
৮। বাঁকুড়া জেলার বিবরণ - রামানুজ কর।
৯। বাঁকুড়া জেলা পুলিশ প্রশাসন।
১০। বাঁকুড়া জেলা আবগারী প্রশাসন।

ব্যক্তিঋণ ঃ

অধ্যাপক অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও বাঁকুড়া ব্লক - ১

রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী

১৯১৯ সাল বাঁকুড়া জেলার ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর। কারণ এ বছর 'Bengal Act V of 1919 অনুযায়ী বাংলার অন্যান্য জেলার মত এ জেলাতেও ইউনিয়ন বোর্ডে গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এভাবে গ্রামান্তর পর্যন্ত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়। ইউনিয়ন বোর্ডগুলি ছিল পরবর্তীকালের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পঞ্চায়েত সমিতির অধীন অঞ্চলসমূহের পূর্বসুরি।

বাঁকুড়া ব্লক-১ এর ইউনিয়ন বোর্ড সংবাদ ঃ

১৯১৯ সালের আইনে ১০ থেকে ২০টি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন বোর্ড এলাকা নির্দিষ্ট হবে বলে বলা হয়েছিল। আইন মোতাবেক বর্তমানে বাঁকুড়া ব্লক-১ বলে চিহ্নিত প্রশাসনিক খণ্ডে পাঁচটি ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়েছিল। এ ইউনিয়ন বোর্ডগুলি ছিল জগদল্লা ইউনিয়ন বোর্ড, আঁধারথোল ইউনিয়ন বোর্ড, কালপাথর ইউনিয়ন বোর্ড, আচুড়ি ইউনিয়ন বোর্ড ও কেঞ্জেকুড়া ইউনিয়ন বোর্ড।

ইউনিয়ন বোর্ডে প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটাধিকার ছিল নানা মাপকাঠি-বিড়ম্বিত। অতএব ভোটরদের সংখ্যা ছিল সীমিত। ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত সদস্যগণ ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিন করতেন। সাধারণতঃ প্রেসিডেন্টের বাসগৃহের বৈঠকখানা হতো ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যালয়। পৃথক কার্যালয়ও থাকত। ১৯৪০ এর দশকের গোড়া থেকে মনোহরপুরের ভূষণচন্দ্র পাৎসা সুদীর্ঘকাল ছিলেন কেঞ্জেকুড়া ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি। এজন্য মনোহরপুরে দীর্ঘকাল কেঞ্জেকুড়া ইউনিয়ন বোর্ডের দপ্তর অবস্থিত ছিল। উপরোক্ত সময়ে আঁচুড়ি ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতিপদে যে দুজন আসীন ছিলেন তাঁরা ছিলেন সানাবাঁধ গ্রামের বাসিন্দা। সুতরাং এ সময়ে আচুড়ি ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যালয় ছিল সানাবাঁধ গ্রামে অবস্থিত।

ইউনিয়ন বোর্ডগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায় না। বাংলা ১৩৩০ সনে অর্থাৎ ১৯২৩ সালে রামানুজ কর কেঞ্জেকুড়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪০-এর দশকের গোড়াকার দিকে ভূষণচন্দ্র পাৎসার পরিচালনাধীন এ ইউনিয়ন বোর্ডের সদর দপ্তর মনোহরপুরে স্থানান্তরিত হয়েছিল। গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সময় এ কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল। ১৯৫৯ নাগাদ ভূষণ পাৎসার মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন কেঞ্জেকুড়ার অরুণ কর্মকার। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্ববর্তী ত্রিশ বছর সময়কালে আচুড়ি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন প্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর উত্তরসুরি কুলদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমাবধি জগদল্লা ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতির কাজ পরিচালনা করেছেন পরপর জগদল্লার মন্মথনাথ চৌধুরী, গোরাবাড়ীর নলিনাক্ষ মুখোপাধ্যায় ও জগদল্লার ফকিরচন্দ্র চৌধুরী। ১৯৪৬ থেকে দীর্ঘকাল আঁধারথোল ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন প্রহ্লাদ চন্দ্র মণ্ডল। এ পদে তাঁর পূর্বসুরি ছিলেন বগলা চৌধুরী। কালপাথর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রথমাবধি প্রেসিডেন্ট ছিলেন ছেন্দুয়া গ্রামের বিভূতিভূষণ সাহানা। এ পদে তাঁর উত্তরসুরি ছিলেন কালপাথর গ্রামের জগদীশ বাগ।

ইউনিয়ন বোর্ড কয়েকজন বেতনভুক চৌকিদার ও চৌকিদারদের উপরওয়ালা হিসাবে বেতনভুক দফাদার নিয়োগ করত। চৌকিদারের কাজ ছিল রাতে গ্রাম পাহারা দেওয়া, গ্রামের জন্ম-মৃত্যুর খবর ও অন্যান্য খবরাখবর সংগ্রহ করে দফাদারকে জানানো। দফাদারের কাজ ছিল সপ্তাহে একদিন থানায় গিয়ে চৌকিদারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খবরাখবর থানা কর্তৃপক্ষকে জানানো। তাছাড়া বিভিন্ন পালা-পার্বণ উপলক্ষে গ্রামে যে মেলা বসত বা লোকসমাবেশ ঘটত তার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল দফাদার - চৌকিদারের। ইউনিয়ন বোর্ডের যুগে বর্তমান বাঁকুড়া ব্লক-১ এলাকার পাঁচটি ইউনিয়ন বোর্ডের চৌকিদার-দফাদারদের মাত্র কয়েকটি নাম পাওয়া যায়। যেমন, কেঞ্জেকুড়া ইউনিয়ন বোর্ডের একজন চৌকিদার ছিলেন মনোহরপুর গ্রামের রজনী বাউরি। তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে শারীরিক অক্ষমতাগ্রস্ত হয়ে পড়লে তাঁর পুত্র ক্ষুদিরাম বাউরি পিতার স্থলে চৌকিদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। দফাদার ছিলেন উরিয়ামা গ্রামের নিমাই দেওঘরিয়া। তিনি চৌকিদারি ট্যাক্সও আদায় করতেন। আচুড়ি ইউনিয়ন বোর্ডের চৌকিদারের কাজ করেছেন পচাই বাউরি ও ফকির বাউরি, দফাদার ছিলেন গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও অনিল মুখোপাধ্যায়। জগদল্লা ইউনিয়ন বোর্ডের চৌকিদারদের মধ্যে গোরাবাড়ীর দশরথ বাউরি, বাঁশির শ্রীপতি বাউরি, জগদল্লার রতন মাল, জামবনির গেরু মাল, ধলডাঙ্গার অলক মাল ও ডাবড়ার তোতারাম মালের নাম জানা যায়। দফাদারের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন জগদল্লার হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (মিশ্র) ও ডাবড়ার হরেকৃষ্ণ চৌধুরী। আঁধারথোল অঞ্চলের চৌকিদার ছিলেন গোবিন্দ রায় (ধোবারগ্রাম), চারু বাউরি, গৌর সর্দ্দার, জ্যোতি বাউরি, নিতাই লোহার, চৈতন্য লোহার, বাবুলাল বাউরি, গোরাচাঁদ মাল, কুমারী মাল এবং দফাদার গোলক পাত্র। কালপাথর অঞ্চলে চৌকীদার ছিলেন প্রহ্লাদ মাল (কালপাথর) বিমল বাউরি (জুনকানালী)। দফাদার ছিলেন মিতুন (মৃত্যুঞ্জয় ?) মুখার্জী।

গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচী ইউনিয়ন বোর্ডের ছিল। তবে এক্ষেত্রে বাঁকুড়া ব্লক-১ এলাকার তদানীন্তন ইউনিয়ন বোর্ডগুলি তেমন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেনি। জলকষ্ট নিবারণের জন্য আচুড়ি ইউনিয়ন বোর্ড সানাবাঁধ ও বাদুলাড়ায় দুটি কূপ খনন করেছিল; আর কেঞ্জেকুড়া ইউনিয়ন বোর্ড মনাহরপুরে ইউনিয়ন বোর্ড কার্যালয়ের কাছে ও গ্রামের বটতলায় দুটি কূপ খনন করেছিল। তাছাড়া কেঞ্জেকুড়ায় একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করত। জগদল্লা ইউনিয়ন বোর্ড গোরাবাড়ীতে চতুর্থ শ্রেণী মান পর্যন্ত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করত। ১৯৩৬ সালে বাঁকুড়ায় Leprosy Investigation Centre-এর একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। আচুড়ি ইউনিয়ন বোর্ডের কিছু অংশ এ প্রতিষ্ঠানটির অনুসন্ধান কার্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে এ ব্যাপারে আচুড়ি ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষের ভূমিকা কি ছিল তা বলা কঠিন। ইউনিয়ন বোর্ড গ্রামবাসীদের বিনোদনের ব্যবস্থা করেছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। ১৯৫০ সাল নাগাদ কেঞ্জেকুড়া ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ গ্রামবাসীরা যাতে রেডিও প্রোগ্রাম শুনতে পারে সেজন্য মনোহরপুর কার্যালয়ে একটি রেডিওর ব্যবস্থা করেছিল।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আগমন ঃ

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রবর্তিত হয়। এ সংবিধানে ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যবস্থা থাকায় ঔপনিবেশিক আমলের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। তাছাড়া জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন মহাত্মা গান্ধী গ্রাম স্বরাজের যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন পূর্বতন স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থায় সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার কোন প্রত্যাশাও ছিল না। তাই গ্রামীণ উন্নয়নকল্পে জনগণকে অর্থবহরূপে যুক্ত করার ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে সংবিধান রচয়িতাগণ সংবিধানের ৪০নং ধারায় ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অঙ্গরাজ্যগুলিকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তনের আবেদন রেখেছিলেন। এ সাংবিধানিক ধারা মোতাবেক ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিধান সভায় একটি পঞ্চায়েত বিল আনয়ন করে এবং তা পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৫৭ নামে বিধানসভায় পাশ হয়। এ আইন অনুযায়ী গ্রামসভা বা গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের ব্যবস্থা হলে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা ঘটে। ১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ আইন

পাশ হয়। এ আইনের দ্বারা পূর্বতন জেলা বোর্ড জেলা পরিষদে রূপান্তরিত হয় এবং ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় ১৯৬২ সালে যে সব সমষ্টি উন্নয়ন এলাকা সৃষ্টি করা হয়েছিল সেগুলিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠে আঞ্চলিক পরিষদ। এভাবে গ্রামসংসদ বা গ্রাম পঞ্চায়েত, তার উপর অঞ্চল পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি ও সর্বোচ্চ স্তরে জেলা পরিষদ নিয়ে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে উঠে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ১৯৬৪ সালের ২রা অক্টোবর অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ আইন ১৯৬৩ কার্যকর করা হয়েছিল। এ পর্যায়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল চার স্তরীয়।

১৯৬২ সালে বাঁকুড়া জেলার ১৯টি থানাকে ভিত্তি করে ব্লক বা সমষ্টি উন্নয়ন এলাকা সৃষ্টি করা হয়েছিল তখন বাঁকুড়া, খাতড়া ও রাইপুর থানা তিনটিকে ভাগ করে প্রতিটিতে দুটি করে ব্লক তৈরী করা হয়েছিল। ফলে বাঁকুড়া থানা, বাঁকুড়া ব্লক-১ ও বাঁকুড়া ব্লক-২ নামে দুটি সমষ্টি উন্নয়ন এলাকায় পরিণত হয়। বাঁকুড়া ব্লক-১ এর অন্তর্ভুক্ত হয় জগদল্লা, আঁধারথোল, কালপাথর, আঁচুড়ি ও কেঞ্জেকুড়া ইউনিয়ন বোর্ড। ১৯৭৩ সালের সংশোধিত পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে বাঁকুড়া ব্লক-১ এর এ পাঁচটি পূর্বতন ইউনিয়ন বোর্ড এলাকা বাঁকুড়া ব্লক-১ পঞ্চায়েত সমিতির পাঁচটি অঞ্চলে পরিণত হয়। ১৯৭৮ সালে জগদল্লা অঞ্চল জগদল্লা-১ ও জগদল্লা-২ নামে দ্বিধাবিভক্ত হলে বাঁকুড়া ব্লক-১ এর অঞ্চলসমূহের সংখ্যা বেড়ে হয় ছয়। বাঁকুড়া ব্লক-১ এর পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার আগে সূচনাপর্ব থেকে এ ব্লকের আধিকারিকদের নামের তালিকা কার্যকালসহ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

(১) কে. বি. চৌধুরী, WBJCS, ১৫.২.১৯৬৩ থেকে ৩১.১০.১৯৬৬ পর্যন্ত; (২) আর. এন. সাহা, WBJCS, ৩১.১০.১৯৬৬ থেকে ২২.৮.১৯৬৭ পর্যন্ত; (৩) এম. রায়, WBJCS, ২২.৮.১৯৬৭ থেকে ৩০.৬.১৯৭৫ পর্যন্ত; (৪) যুগ্ম ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (অস্থায়ীভাবে), ৩০.৬.১৯৭৫ থেকে ৩০.৯.১৯৭৫ পর্যন্ত; (৫) এস. কে. মজুমদার, WBCS (Exe), ৩০.৯.১৯৭৫ থেকে ৮.৮.১৯৭৯ পর্যন্ত; (৬) এ. কে. মুখার্জী, WBCS (Exe), ৮.৮.১৯৭৯ থেকে ৪.৮.১৯৮৪ পর্যন্ত; (৭) এস. কে. মল্লিক, WBCS (Exe), ৪.৮.১৯৮৪ থেকে ৪.৩.১৯৮৬ পর্যন্ত; (৮) আর. ডি. মীনা, আই.এ.এস, ৪.৩.১৯৮৬ থেকে ২৯.৪.১৯৮৬ পর্যন্ত; (৯) এস. কে. মল্লিক, WBCS (Exe), ২৯.৪.১৯৮৬ থেকে ১৩.৯.১৯৮৮ পর্যন্ত; (১০) এস. চৌধুরী, WBCS (Exe), ১৩.৯.১৯৮৮ থেকে ২৬.৬.১৯৮৯; (১১) যুগ্ম ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (অস্থায়ীভাবে) ২৬.৬.১৯৮৯ থেকে ২৯.৭.১৯৮৯; (১২) মহম্মদ কে.কে.বি.এন. ইসলাম, WBCS (Exe), ২৯.৭.১৯৮৯ থেকে ১৮.৯.১৯৮৯ পর্যন্ত; (১৩) এম. সুরেশ কুমার, আই.এ.এস, ১৮.৯.১৯৮৯ থেকে ৮.১২.১৯৮৯ পর্যন্ত; (১৪) মহম্মদ কে.বি.কে.বি.এন. ইসলাম, WBCS (Exe), ৮.১২.১৯৮৯ থেকে ৩০.৬.১৯৯৩ পর্যন্ত; (১৫) এ. সন্ননাথ, WBCS (Exe), ৩০.৬.১৯৯৩ থেকে ২৬.৯.১৯৯৭; (১৬) এ. সেনগুপ্ত, WBCS (Exe), ২৬.৯.১৯৯৭ থেকে ১৬.৩.২০০০ পর্যন্ত; (১৭) জে. চৌধুরী, WBCS (Exe), ১৬.৩.২০০০ থেকে ৭.৪.২০০০ পর্যন্ত; (১৮) এস.এস. মণ্ডল, WBCS (Exe), ৭.৪.২০০০ থেকে ২২.১২.২০০০; (১৯) জে. চৌধুরী, WBCS (Exe), ২২.১২.২০০০ থেকে ১২.১.২০০১; (২০) এস. কে. দত্ত, WBCS (Exe), ১২.১.২০০১ থেকে ৮.৯.২০০৩ পর্যন্ত; (২১) এ. কে. পাল, জয়েন্ট বিডিও, ৮.৯.২০০৩ তেকে ২২.৯.২০০৩ পর্যন্ত; (২২) আর. ব্যানার্জী, WBCS (Exe), ২২.৯.২০০৩ থেকে ১.৩.২০০৪ পর্যন্ত; (২৩) এ. কে. পাল (জয়েন্ট বি.ডি.ও.) ১.৩.২০০৪ থেকে ২২.৩.২০০৪; (২৪) শ্রীসুদীপ্ত পোড়েল, WBCS (Exe), ২২শে মার্চ ২০০৪ থেকে এখনো ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক পদে আসীন।

১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে মোটামুটি ১৩০০ লোকবসতিপূর্ণ এলাকা নিয়ে একটি গ্রামসভা (পরবর্তীকালীন গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম সংসদ) ও ১০,০০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট এলাকা বা ৮ থেকে দশটি গ্রামসভা নিয়ে একটি অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠনের বিধান ছিল। এ বিধান অনুযায়ী বাঁকুড়া ব্লক-১ এলাকার অঞ্চল পঞ্চায়েতের সংখ্যা ছিল পাঁচ। যথা জগদল্লা, আঁধারথোল, কালপাথর, আঁচুড়ি ও কেঞ্জেকুড়া। আর গ্রাম সংসদের সংখ্যা ছিল ৪৫।

যেমন, ধলডাঙ্গা, শুনুকপাহাড়ী, পুয়াবাগান, বাদুলাড়া, কেঞ্জেকুড়া, কালপাথর ইত্যাদি। পরবর্তীকালে জগদল্লা অঞ্চল জগদল্লা-১ ও জগদল্লা-২ এ দুটি অঞ্চলে বিভক্ত হলে বাঁকুড়া ব্লক-১ এলাকার অঞ্চল সমূহের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬টিতে। লোকসংখ্যা ও নির্বাচক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামসংসদের সংখ্যা হয় ৭৯। জগদল্লা-১ অঞ্চলে ১১টি, জগদল্লা-২ অঞ্চলে ১০টি, আঁধারথোল অঞ্চলে ১৫টি, কালপাথর অঞ্চলে ১১টি, আচুড়ি অঞ্চলে ১৬টি ও কেঞ্জেকুড়া অঞ্চলে ১৬টি। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্যগণ। বর্তমানে জগদল্লা-১ অঞ্চলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ২জন, জগদল্লা-২ এর ২ জন, আঁধারথোলের ৩জন, কালপাথরের ২জন, আচুড়ির ৩জন ও কেঞ্জেকুড়ার ৩জন; মোট ১৫ জন। ২০০৬ সালে প্রতি গ্রামসংসদে ১৫জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়েছে।

পূর্বতন গ্রামসভা বা বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি ও সহঃসভাপতি যথাক্রমে প্রধান ও উপ-প্রধান হিসাবে অভিহিত। বাঁকুড়া ব্লক-১ এলাকার অন্তর্গত বিভিন্ন সময়ে যাঁরা প্রধান ও উপপ্রধান পদে আসীন ছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম জানা যায়। আঁধারথোল গ্রামসভা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন বরদাকান্ত চৌধুরী (১৯৬১-৭৮) আব্দুল করিম খান (১৯৭৮-১৯৩১), দুর্গাদাস সাঁতরা (১৯৮৩-৮৮), সুদর্শন চ্যাটার্জী (১৯৮৮-৯৩) এবং উপপ্রধান ছিলেন আজিজুল হক খান (১৯৬১-১৯৭৮), গোবর্ধন মই (১৯৭৮-৮৩), সুদর্শন চ্যাটার্জী (১৯৮৩-৮৮), আব্দুল করিম মোল্লা (১৯৮৮-৯৩)। আচুড়ি গ্রামসভা / গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন প্রভাকর ব্যানার্জী (১৯৬১-৭৮), মহম্মদ সরিফ মিদ্যা (১৯৭৮-৮৩), হারুণ অল রশীদ খান (১৯৮৩-৯৩)। উপপ্রধান ছিলেন নলিনী চক্রবর্তী (১৯৬১-৭৮), বৈদ্যনাথ মণ্ডল (১৯৭৮-৮৩), মনসারাম চক্রবর্তী (১৯৮৩-৮৮), দুর্গাদাস ব্যানার্জী (১৯৮৮-৯৩)। কালপাথর গ্রামসভা/গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন জগদীশ বাগ (১৯৬১-৭৮, কালীপদ সাহানা (১৯৭৮-৮৩), রবি বেসরা (১৯৮৩-৯৩) এবং উপপ্রধান ছিলেন নলিনাক্ষ সাহানা (১৯৬১-৭৮), দ্বিজপদ মণ্ডল (১৯৭৮-৮৩),, কালীপদ মণ্ডল (১৯৮৩-৮৮), মাণিক রজক (১৯৮৮-৯৩)। কেঞ্জেকুড়া গ্রামসভা/গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন অরুণচন্দ্র কর্মকার (১৯৬১-৭৮), মথুরানাথ পাল (১৯৭৮-৮৩), শম্ভুনাথ মুখার্জী (১৯৮৩-৮৮), নন্দলাল লোহার (১৯৮৮-৯৩) এবং উপপ্রধান ছিলেন প্রমোদ মণ্ডল (১৯৬১-৭৮), পঞ্চানন কারক (১৯৭৮-৮৩), দিলীপ ব্যানার্জী (১৯৮৩-৯৩)। জগদল্লা-১ গ্রামসভা/গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন ফণিভূষণ চৌধুরী, (১৯৬১-৭৮), কল্যাণময় চৌধুরী (১৯৭৮-৮৩), নিত্যানন্দ চৌধুরী (১৯৮৩-৮৮), হরিদাস চ্যাটার্জী (১৯৮৮-৯০), সুধাংশু কোঙার (১৯৯০-৯৩) এবং উপপ্রধান ছিলেন কমলাকান্ত মণ্ডল (১৯৬১-৭৮), অনাদিনাথ মহন্ত (১৯৭৮-৮৩), মন্মথ আচার্য (১৯৮৩-৯৩)। জগদল্লা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন মথুর ঘোষ (১৯৭৮-৮৩), অনিল বাউরি (১৯৮৩-৮৮), মোহন মণ্ডল (১৯৮৮-৯৩) ও উপপ্রধান ছিলেন মোহন মণ্ডল (১৯৭৮-৮৮), নেপাল বাউরি (১৯৮৮-৯৩)।

১৯৯৩ এর পরবর্তীকালীন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণ হলেন জগদল্লা-১ এর সুদর্শন ঘোষাল (১৯৯৩-৯৮), সঞ্জীব বাউরি (১৯৯৮-২০০৩), অমিয় রায় (২০০৩ -), আচুড়ির অমিতা ধুয়া (১৯৯৩-৯৮), আব্দুল ঘোষ (১৯৯৮-২০০৩), চন্দনা বাউরি, কবিতা মণ্ডল (২০০৩ -)। আঁধারথোলের রামপদ মাল (১৯৯৩-৯৮), চিত্তরঞ্জন মণ্ডল (১৯৯৮-২০০৩), পশুপতি বাউরি (২০০৩ -), কালপাধরের রবি বেসরা (১৯৯৩-৯৮), কালীপদ মণ্ডল (১৯৯৮-২০০৩), গোপাল সাহানা (২০০৩ -)।

১৯৭৮ সাল থেকে ব্লক পর্যায়ে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচন আরম্ভ হলে বাঁকুড়া ব্লক-১ পঞ্চায়েতে সমিতির সভাপতিপদে নির্বাচিতগণ হলেন সুখময় ব্যানার্জী (১৯৭৮-৮৩), ফটিক গোস্বামী (১৯৮৩-৮৬), সুখময় ব্যানার্জী (১৯৮৬-৮৮), নিত্যানন্দ চৌধুরী (১৯৮৮-৯৩), শিশির গোস্বামী (১৯৯৩-৯৮), পদ্মা মণ্ডল (১৯৯৮-২০০৩)। ২০০৩ থেকে এ পদে অধিষ্ঠিতা আছেন শ্রীমতী লতা মণ্ডল।

বাঁকুড়া ব্লক-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য গ্রাম সংসদসমূহ হলো বাঁশী, গোড়াবাড়ী, আগয়া, পাতালকুড়ি, মৌলবনা, গোঁসাইডিহি, বাদুলাড়া, কাপিষ্টা, পুরুণ্ডি, নূতনগ্রাম, কাশিবেদিয়া, চিংড়া।

উন্নয়নমূলক কার্যাবলী ঃ

সাম্প্রতিককালে বাঁকুড়া ব্লক-১ পঞ্চায়েত সমিতির নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হলো। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচী অনুযায়ী একটি পরিসংখ্যানমূলক আলেখ্য নিম্নে প্রদত্ত সারণি থেকে পাওয়া যায়।

প্রকল্পের নাম	অঞ্চলের নাম ও উপকৃতের সংখ্যা					
	জগদল্লা-১	জগদল্লা-২	আচুড়ি	কেঞ্জেকুড়া	আঁধারথোল	কালপাথর
বার্ধক্য ভাতা	১৬৬	১৪৮	২৫৯	২৭২	২৪৬	১৭৩
অন্ত্যোদয় যোজনা	৪০৪	৪১৪	৬৫১	৬৯৫	৭৭৮	৫৩০
অন্নপূর্ণা যোজনা	১৪	১৪	১৩	১৬	১৫	১৪
নিয়মিত ত্রাণ খয়রাতি সাহায্য	৪০	৩৪	৫৬	৫৭	৫১	৪২
২০০৬-০৭ অর্থবর্ষে ইন্দিরা আবাস যোজনা	১৮	১৭	২৫	২৭	২৬	২১

উপরোক্ত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর গুরুত্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, দারিদ্র সীমার নিম্নবর্তী তালিকাভুক্ত ৬৫ বছরের বেশী বয়স্ক ব্যক্তিদের এ যোজনা অনুযায়ী মাসে ৪০০ টাকা বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হয়। অন্ত্যোদয় যোজনায় দারিদ্র্য সীমার নিম্নবর্তী তালিকাভুক্ত প্রাপকের মাসিক প্রাপ্য পরিবার পিছু ৩ টাকা কেজি দরে চাল ও ২ টাকা কেজি দরে গম মোট ৩২ কেজি। অন্নপূর্ণা অন্ন যোজনায় দারিদ্র সীমার নিম্নবর্তী তালিকাভূক্ত ৫৩বছরের বেশি বয়স্ক প্রাপকের মাসিক প্রাপ্য ১০ কেজি চাল বা গম। নিয়মিত ত্রাণ-খয়রাতি সাহায্য যোজনায় দারিদ্র সীমার নিম্নবর্তী তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি মাসে মাথাপিছু বিনামূল্যে চাল বা গম প্রাপ্য। ইন্দিরা আবাস যোজনা অনুযায়ী দারিদ্র্য সীমার নিম্নবর্তী তালিকাভুক্তদের প্রাপ্য আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ হলো পূর্ণগৃহের জন্য ২৫০০০ টাকা ও অর্ধগৃহের জন্য ১২৫০০ টাকা।

শিশু-নারী স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্য কর্মসূচী অনুযায়ী ০-৬ বছরের শিশুদের পুষ্টির জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিচালনা ও বালিকা সমৃদ্ধি যোজনার বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণে সমাজ কল্যাণ দপ্তর ও পঞ্চায়েতের যৌথ ভূমিকা প্রশংসনীয়। পঞ্চায়েতের সাহায্যে দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত গর্ভবতী মায়েদের অর্থ সাহায্য দিচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর, জননী সুরক্ষা যোজনায় পঞ্চায়ের সহযোগিতায়। তাছাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ও উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে টীকাকরণ, মা-শিশুর স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় পঞ্চায়েতের বড় ভূমিকা আছে। পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে সাক্ষরতা আন্দোলন ও স্বনির্ভর দলের আন্দোলন শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন এনেছে।

জলসংরক্ষণ ও সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে বাঁকুড়া ব্লক-১ এর পঞ্চায়েতগুলির সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জলসংরক্ষণ ও সেচের সুবিধার জন্য বাঁকুড়া ব্লক-১ গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহ ও পঞ্চায়েত সমিতি কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে, জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে (REGS), রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনা (RSVY) ও নাবার্ডের সহযোগিতায় জলবিভাজিকা উন্নয়ন কর্মসূচীতে একশর বেশী জলাশয় সংস্কার করেছে, চল্লিশটি প্রতিরোধ বাঁধ (Checkdam) নির্মাণ করেছে। জগদল্লা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত জগদল্লা-পাতাকলা জোড়ে তিনটি চেকড্যাম তৈরি করেছে। তাছাড়া বহু মাঠকূয়ো ও সেচ নালাও খনন করা হয়েছে।

পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এ ব্লকের বিভিন্ন অংশে রাস্তা-সেতু পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজও সন্তোষজনকভাবে

এগিয়েছে। জগদল্লা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের হেলনা-বাইন্দকা নতুন রাস্তা ও সেঁতু, নন্দীগ্রাম-রাজগ্রাম নতুন রাস্তা ও সেঁতু, আগয়া আঙ্গারিয়া নূতন রাস্তা ও সেঁতু, আঁধারথোল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নূতন গ্রাম থেকে জাতীয় সড়ক সংযোগকারী নূতন রাস্তা নির্মান ছাড়াও পঞ্চায়েতের পরিচালনায় অনেক পুরনো রাস্তার সংস্কার সাধন হয়েছে। বাঁকুড়া ব্লক-১ পঞ্চায়েত সমিতির সক্রিয় ভূমিকায় কেঞ্জেকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোসাইডিহি ও ছাত্নার সংযোগকারী সড়কে গোসাইডিহি জোড়ের উপর নির্মিত হয়েছে একটি বড় সেতু। তাছাড়া সম্প্রতি তৈরী হয়েছে কুস্তরা-ধবন নূতন রাস্তা ও রাজগ্রাম - মানুষমুড়া - বাঁশী রাস্তার সেতু।

বনসৃজনের ক্ষেত্রেও পঞ্চায়েতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা (SGRY) ও জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প (REGS বা বছরে ১০০ দিনের কাজ) কাজে লাগিয়ে ২০০৫-০৬ বর্ষে বাঁকুড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতি ৩ লক্ষের বেশী বৃক্ষরোপন করে সামাজিক বনসৃজন এবং পঞ্চাশ হাজারের বেশী আমচারা রোপন করে ফলের বাগান তৈরি করেছে।

পেনশন স্কিম অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতি সমাজ কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় বাঁকুড়া-১ ব্লকে ৭৭জনকে ৫০০টাকা করে বার্ধক্যভাতা দেয়। এ সংখ্যা উপরোক্ত মাসিক ৪০০ টাকা করে বার্ধক্য ভাতা প্রদানের পরিসংখ্যানের অতিরিক্ত। ৩১ জনকে প্রতি মাসে দেওয়া হয় বিধবা ভাতা, ১৭ জনকে প্রতিবন্ধীভাতা। তাছাড়া আছেন বেশ কিছু পেনশনভোগী। বৃদ্ধ, অক্ষম কৃষক, মৎস্যজীবী ও শিল্পীরা ভাল সংখ্যায় কৃষিদপ্তর, মৎস্য দপ্তর ও শিল্প দপ্তরের কাছ থেকে ভাতা পান। তাঁদের চিহ্নিত করে এ প্রকল্পের আওতায় আনার দায়িত্ব পালন করে থাকে পঞ্চায়েত।

মন্তব্য ঃ বাঁকুড়া ব্লক-১ এলাকা ঔপনিবেশিক আমলেও ছিল পশ্চাদ্‌বর্তিতা বিহ্বল। কিন্তু পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। ১৯৭৮ সাল থেকে পঞ্চায়েতের নির্বাচন নিয়মিত হওয়ায় ও পঞ্চায়েতের কাজে বর্ণ-লিঙ্গ-নির্বিশেষে সব শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার জাদুদণ্ডের স্পর্শে বাঁকুড়া-১ ব্লক পূর্বতন পশ্চাদ্‌বর্তিতা কাটিয়ে উঠে বাঁকুড়া জীবনের বৃহত্তর স্রোতের অঙ্গীভূত হতে পেরেছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১) Bankura District Gazetteer : Ed. A. K. Bandyopadhyay, 1968

২) পঞ্চায়েত পরিক্রমা ঃ বাঁকুড়া ঃ অধ্যাপক ডঃ হিমাংশু ঘোষ, বাঁকুড়া ইনস্টিটিউট, প্রতাপবাগান, বাঁকুড়া, ১৯৯৫

৩) শ্রী সুদীপ্ত পোড়েল, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, বাঁকুড়া ব্লক - ১

৪) শ্রীকল্যাণময় চৌধুরী, জগদল্লা।

৫) শ্রীপ্রদোষ কুমার পাৎসা, নূতনচটি, বাঁকুড়া

৬) শ্রী নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়, সানাবাঁধ

বাঁকুড়া-১ ব্লকে জলবিভাজিকা উন্নয়নের আলোকে কৃষি ও সেচ

সুদীপ্ত পোড়েল

পূর্বকথা

১৮৬৬ সালে ডব্লু.ডব্লু. হান্টারের বীরভূম থেকে মেদিনীপুর যাত্রাপথের বিবরণে জঙ্গলমহল বাঁকুড়ার অষ্টাদশ শতাব্দীর চেহারা অনেকটাই ধরা পড়ে। ঘন জঙ্গলে ঢাকা বাঁকুড়ার তরঙ্গায়িত লাল মাটির উপর কিছু বিচ্ছিন্ন জনপদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে ছিল তাঁর বিবরণে।

৮৬°৯৫/ পূর্ব - ৮৭°০৫/ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা ২৩°১০/ উঃ - ২৩°২০/ উঃ অক্ষাংশ বিধৃত ১৬৭.৬৪ বর্গকিমি ভূমিখণ্ডের প্রশাসনিক নাম বাঁকুড়া-১ নং ব্লক। এই ব্লকের মাঝ বরাবর প্রবাহিত হয়েছে দ্বারকেশ্বর নদ। ব্লকের সীমান্ত অঞ্চলের উচ্চ বনভূমি থেকে সৃষ্টি কয়েকটি জোড় এই দ্বারকেশ্বর নদে মিলেছে। সময়ের বিবর্তনে এই জোড় ও নদী নাব্যতা হারিয়ে ক্ষীণ স্রোতা বালিরেখায় পরিণত হয়েছে। ১৮৮১ সালে সেনসাস প্রতিবেদনে এই নদীর দীর্ঘসময়ের বিপুল জলরাশি, নৌকা ও নৌ-পরিবহনের বিবরণ পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে ৮৭ জন নৌবাসীর বিবরণ পাওয়া যায়। ১৯১৮ সালে জেলা বোর্ডের বিজ্ঞাপিত ফেরীঘাটের মধ্যে বাঁকুড়া-১ ব্লকের পাতাকোলা অন্যতম। ১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথের 'পল্লীপ্রকৃতি'তে বাঁকুড়ার বর্ষাঋতুতে জলপূর্ণ নদীর বিবরণ পাওয়া যায়। সময়ের দীর্ঘ ক্যানভাসে অতীত নদীর পূর্ণ রূপ ও বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে বর্ষার দু-চারদিনের জলস্ফীতি আর বনহীন বিস্তীর্ণ ক্ষয়িত পতিত ভূমি, কৃষি ও কৃষিজ অর্থনীতির এই আলোচনার প্রচ্ছদ হয়ে থাকবে।

জলবায়ু

বাঁকুড়া সদর ব্লকের জলবায়ু উপক্রান্তীয় উপআর্দ্র (সাব হিউমিড)। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১২০০-১৪০০ মিমি। এর ৭৫% - ৮৫% হয় জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অক্টোবর থেকে জানুয়ারী পর্যন্ত ৫-১৫ শতাংশ ও ফেব্রুয়ারী থেকে মে পর্যন্ত ১০-১৫ শতাংশ। কখনও কখনও বর্ষা আগেই আসে, কখনও বর্ষা আসে দেরীতে। কোন কোন বর্ষায় দুটি বৃষ্টিপাতের মধ্যে ৭-২০ দিনের অবকাশ ঘটে যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর চরিত্রের উপর বর্ষার প্রকৃতি নির্ভর করে। গ্রীষ্মকালের তাপমাত্রা ৪৫° সি. পৌঁছে যায় এবং শীতকালীন তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ৭-৮° সি. এ নেমে আসে। সাধারণত ডিসেম্বর থেকে এপ্রিলের আকাশ মেঘমুক্ত রৌদ্রোজ্বল থাকে। জুন থেকে সেপ্টেম্বরের আকাশে থাকে মেঘের ঘনঘটা।

এপ্রিল ও মে মাসে মাঝে মধ্যে ঝড়বৃষ্টি হয়। প্রায়ই বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত হয়। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা এপ্রিল মাসে সবচেয়ে কম (৪০%), জুলাই-আগস্টে সর্বাধিক আর্দ্রতা অনুভূত হয় (৯৪%)। অত্যধিক তাপমাত্রার জন্য বাষ্পীভবনের প্রবণতাও বেশী। গড় বার্ষিক সম্ভাব্য বাষ্পীভবন-বাষ্পমোচনের পরিমাণ ১৪০০ মিমি এর কাছাকাছি। জুন-সেপ্টেম্বরের বর্ষাকাল ছাড়া এই হার অন্য সময়ে, বৃষ্টিপাতের চেয়ে বেশী থাকে। ফলে ভূমিরসের অভাব

(ময়শ্চার ট্রেস) দেখা দেয় ও শষ্য বিপর্যয় (ক্রপ ফেলিওর) ঘটে। মে থেকে সেপ্টেম্বরে মূলত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাব দেখা যায়, আর অক্টোবর থেকে উত্তুরে বাতাস লক্ষিত হয় যার অভিমুখ থাকে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বাতাসের গতিবেগ সবচেয়ে কম থাকে। প্রাক্ বর্ষা ঋতুতে কখনও কখনও নিম্নচাপ জনিত ঝঞ্ঝা, জীবন ও সম্পত্তি হানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাঁকুড়া-১ ব্লকে মোট বৃষ্টিপাত ও বৃষ্টিস্নাত দিনের সংখ্যা এইরূপ - ২০০০ সালে ১২৩৫ মিমি ও ৯২, ২০০১ সালে ১৩২৩ মিমি ও ৯৯, ২০০২ সালে ১৪৩৭ মিমি ও ১০৩, ২০০৩ সালে ১২৭৩ মিমি ও ১০১, ২০০৪ সালে ১৩৭৬ মিমি ও ১০৩। একদিনে সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের খতিয়ান এইরূপ - ২০০০ সনে ৫৪.২ মিমি (২৭জুলাই), ২০০১ সালে ১১৬.৬ মিমি (৪ জুন), ২০০২ সালে ১২৪.২ মিমি (২৫ সেপ্টেম্বর) ২০০৩ সালে ৫৬ মিমি (১৪ জুলাই) ২০০৪ সালে ১৫০.৪ মিমি (১৩ আগষ্ট), ২০০৫ সালে ৭৬.৬ মিমি (৩রা আগষ্ট)।

মৃত্তিকা ও ভূপ্রকৃতি

বাঁকুড়া-১ ব্লক লাল-কাঁকুরে মৃত্তিকাঞ্চলে পড়ে (রেড-ল্যাটেরাইট জোন)। ছোটোনাগপুর মালভূমির আর্চিয়ান-ধর্মবীয়ান প্রস্তর স্তর বাঁকুড়া-১ এর বর্তমান মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয়েছে হাজার বছরের দীর্ঘ ইতিহাস পেরিয়ে। সেই ইতিহাসের শুরু গন্ডোয়ানাল্যান্ডের ধারণা পর্বে, মোট ভৌগোলিক এলাকা ১৮১৩০ হেঃ মধ্যে ১২১৬০ হেঃ চাষযোগ্য এলাকা। ভূতাত্ত্বিক তথ্যানুসারে এই ব্লকে নিস ও এনথ্রোসিস সৃষ্ট মাটি ৯০ শতাংশ, ১০ শতাংশ এ্যলুভিয়াল-ল্যাটেরাইট সৃষ্ট।

বাঁকুড়া-১ ব্লকের তরঙ্গায়িত ভূ-পৃষ্ঠের ৫২ শতাংশ টাঁড় বাইদ জমি (উচ্চ অঞ্চলের জমি), ২০ শতাংশ কানালী জমি (মধ্য অঞ্চলের জমি), ১৮ শতাংশ সোল বা বহাল জমি (নিম্ন অঞ্চলের জমি)।

মাটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট (টেক্সচার) অনুসারে হাল্কা ঘনত্বের বেলে প্রকৃতির মাটি মোট কৃষি এলাকার ৩০ শতাংশ আর ২৮ শতাংশ বেলে দোঁয়াশ, মধ্যম ঘনত্বের বালি-পলি-দোঁয়াশ মাটি ১৮ শতাংশ, অতি ঘনত্বের এঁটেল দোঁয়াশ ১৫ শতাংশ ও এঁটেল ৯ শতাংশ।

মাটির স্তরবিন্যাস (প্রফাইল) বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন। গড়পড়তা স্তর বিন্যাস এইরূপ-মাটি ০.৪ মি., চুন বা বালি মিশ্রিত শক্ত মাটি ১.৪ মি, ফেরাগেনাস কনেরেশান ০.১ মি, ঘনীভূত নুড়িপাথর, নুড়িপাথর-বোল্ডার মিশ্রিত শক্তমাটি ০.৪২ মি, লালমাটির মোট স্তর, সর্ব নিম্নে ভিত্তি পাথর।

বাঁকুড়া-১ ব্লক ৭টি শ্রেণীভূক্ত মাটির (সয়েল সিরিজ এসোসিয়েশন) সন্ধান পাওয়া গেছে। (১) কাঁটাবন-দয়ালপুর পর্যায়ভূক্ত মাটির সন্ধান পাওয়া যায় চকজগদল্লা ও রসুনকুর সন্নিহিত অংশে। আঁচুড়ি মৌজার পূর্বাংশ ও সন্নিহিত দক্ষিণ-পূর্ব অংশে এই মাটির সন্ধান মেলে। এই মাটি এঁটেল-দোঁয়াশ প্রকৃতির, অগভীর, ০-৫% ঢাল, হেপ্লাকোয়েপ্ট স্ প্রকৃতির। (২) রঙ্গ-তালডাংরা শৃঙ্খলাভূক্ত মাটি আছে পশ্চিম আঁচুড়ি থেকে উত্তরপাপুরডি, পূর্ব হরেকৃষ্ণপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায়, মধ্যম গভীরতার এই মাটি কাঁকর বালুময় এঁটেল, এঁটেল-দোঁয়াশ প্রকৃতির। ঢাল ১-৫% প্লিন্থাসস্টালিফ্ প্রকৃতির। কোন জায়গায় ঢাল ৩-১০%, লিথিক উসটোক্রেপ্ট প্রকৃতির। (৩) দেউলি-দুলাডি শৃঙ্খলাবদ্ধ মাটির অস্তিত্ব দ্বারকেশ্বর নদীর ১.৫ কিমি পর্যন্ত দুই প্রান্তদেশে, জোড়সমূহের নিম্নাংশে। অতি গভীর বেলে বা দোঁয়াশ এই মাটি ০-৩% ঢালের উস্টিপসামেন্ট প্রকৃতির। কোন কোন অংশে ঢাল ১-৫%, উস্টিফ্লুভেন্ট প্রকৃতির। (৪) লোহামারা-রঙ্গ পর্যায়ভূক্ত মাটির ব্যাপ্তি কেঞ্জাকুড়া ও আঁচুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাকী অংশ জুড়ে। অগভীর, কাঁকর-বালি মিশ্রিত এই দোঁআশ ভূমিভাগের ঢাল ৩-১০%, লিথিক-উস্ট্রোচেপ্ট স্ প্রকৃতির। (৫) ফুলকুসমা-ভুলানপুর পর্যায়ভূক্ত মাটি সমগ্র কালপাথর গ্রাম পঞ্চায়েত জুড়ে, নদী ও জোড় তীরবর্তী অংশ বাদে। গভীর থেকে মাঝারি গভীর এই মাটি মূলত ল্যাটেরাইট ক্ষয়িত বেলে এঁটেল-দোঁয়াশ শ্রেণীর। কোথাও কোথাও এঁটেল-দোঁয়াশ, বেলে-এঁটেল দোঁয়াশের দেখা মেলে। ১-৫% ভূমি ঢালের এই মাটি উদিকহে প্লাসঢাক প্রকৃতির, কোথাও ১-৫% ঢালের মাটি প্লিন্থাসটাল্ক প্রকৃতির।

(৬) ভুলানপুর তালডাংরা শৃঙ্খলাভুক্ত মৃত্তিকা শ্রেণী আছে দধিমুখা, ঝরিয়া, মাকড়কেন্দি, কেন্দখুন্যা আগয়ার সীমানা ও ভাতুড়ির কিছু অংশে। আঁধারথোল অঞ্চলের উত্তরাংশে যা কিছুটা নতুনগ্রাম-ভিকুরডি পর্যন্ত বিস্তৃত, সেই অঞ্চলে এই মাটির অবস্থান ল্যাটেরাইটের উপর। ঘন বেলে এঁটেল-দোঁয়াশের এই আস্তরণের ঢাল ১-৫%, উদিক ফেপ্লাস্টাফ প্রকৃতির। কোথাও কোথাও মাঝারি গভীরতার এঁটেল দোঁয়াশ, বেলে এঁটেল দোঁয়াশ এই ভূমির ঢাল ১-৫%, প্লিন্থাসটালফ্ প্রকৃতির। (৭) কেসে-রামসাগর শৃঙ্খলার মাটি দেখা যায় জগদল্লা-১, জগদল্লা-২ ও আন্দারথোল গ্রাম পঞ্চায়েতের বাকি অংশে। অতি গভীর বেলে, এঁটেল, দোঁয়াশ এই মাটির ভূমির ঢাল ৩-৫%। উদিক হেপ্লাসটাল্ফ প্রকৃতির। কিছু অংশে ভূমির ঢাল ১-৫%, ভার্টিক হাপ্লাকোয়েপ্লস্ প্রকৃতির।

গড় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই ভূমি ভাগ ৭৫০ ফুট উপরে। এই তরঙ্গায়িত ভূ-পৃষ্ঠের সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব ১০০-১৫০ ফুট।

গড়পড়তা মাটির চরিত্র আম্লিক (পি.এইচ. ৫ থেকে ৬.৫ পর্যন্ত)। আয়ন পরিবহন ক্ষমতা স্বাভাবিক (০.১-০.৪ মোহ)। উর্বরতার মাপে খারাপ থেকে মাঝারি। মাটিতে নাইট্রোজেনের উপস্থিতি কম থেকে মাঝারি (০.০৩ - ০.০৬ শতাংশ)। ফসফেটের স্বল্পতাও লক্ষনীয় (২০-৫০ কেজি/হেঃ)। পটাসিয়ামের উপস্থিতি মাঝারি (২০০-২৫০কেজি/হেঃ)। অন্যান্য খনিজের উপস্থিতি নগন্য। টাঁড়-বাইদ অঞ্চল অপেক্ষা, কানালী-সোল জমিতে এই সূচকগুলির অবস্থান অপেক্ষাকৃত ভাল। টাঁড়-বাইদ এলাকার ক্ষয়িত মাটি ও মাটির উর্বরতার কিয়দংশ কানালী-বহাল অঞ্চলে অবস্থান করে।

মাটির আম্লিক চরিত্র পরিবর্তনে কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে কিছু জমিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে (সয়েল এ্যমুলিওরেন্ট প্রয়োগে)। এই ব্লকে ২০০৬-২০০৭ অর্থবর্ষে কৃষিতে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ ছিল প্রায় ১৮০০ মেট্রিকটন। কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে কেঞ্জাকুড়ার রামনগর গ্রামকে জৈব গ্রাম হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

ভূমি ব্যবহার চিত্র

হান্টার ও ও'ম্যালি চিত্রিত জঙ্গলমহল বাঁকুড়ার ভূমি চিত্রপট ইংরেজ প্রবর্তিত বিবিধ ভূমি ব্যবস্থার সাথে পরিবর্তিত হয়েছে দ্রুত। বনাঞ্চল ধংস করে কৃষি এলাকা সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার জোরালো শরিক ছিলেন ইংরেজ আশ্রিত ভূস্বামীরা। স্বাধীনোত্তর বাঁকুড়ায় জন ও জনপদ বিস্তারের সাথে কৃষি জমির পরিমাণ ক্রমশ নিম্নগামী হতে থাকে। বাঁকুড়া-১ ব্লকের ১৮১৩০ হেক্টর মোট এলাকার মধ্যে, কৃষি দপ্তরের হিসাব মতো ১৯৪৪-৪৫ এ ধানী (আমন) জমির পরিমান ছিল ১৬০৭৫.৩৮ হেক্টর, সেখানে ১৯০৬-০৭ সালে এর পরিমান দাঁড়িয়েছে মাত্র ৯৭০০ হেক্টর। তৎকালীন বনভূমির ২৩৭৯.৪ হেক্টর বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে ১২৯৯ হেক্টরে। বর্তমানে অবশিষ্ট ভূমির মধ্যে অকৃষি জমি ১০৬৬ হেক্টর, চাষঅযোগ্য পতিত ১১২২ হেক্টর, স্থায়ী চারণভূমি ৪০৪ হেক্টর, চাষযোগ্য পতিত ৮০০ হেক্টর, হাল পতিত ৬৭৪ হেক্টর, হাল পতিত নয় এমন ৪৮৫ হেক্টর, চাষযোগ্য এলাকা ১২১৬০ হেক্টর।

১৯৪৪-৪৫ এ বাঁকুড়া - ১ ব্লকের বিভিন্ন ফসল এলাকার হিসাব এইরূপ, আমন ১৬০৭৫.৩৮ হেক্টর, আউস ১৯৮.৯৫ হেক্টর, কলাই ৩৩.০১ হেক্টর, গম ১০৩.১ হেক্টর, বার্লি ৭.৫৮ হেক্টর, মুসুর ০.২৪ হেক্টর, খেসারী ৪৫.৫৫ হেক্টর, অড়হর ০.১৯ হেক্টর, ভূট্টা ৫.০২ হেক্টর, আখ ৩২.৬৭ হেক্টর, সরিষা ১২.৭৯ হেক্টর, তিল ১৬.২২ হেক্টর, লঙ্কা ১১.০২ হেক্টর, আলু ১৮.৭৭ হেক্টর, পিঁয়াজ-রসুন ৬৩.৬১ হেক্টর, সব্জি ৯০১.৬৩ হেক্টর, পাট ৩.২৮ হেক্টর, শন ৬৬.৯৪ হেক্টর, আম ২০২.২২ হেক্টর, খেজুর ০.২৬ হেক্টর, অন্য ফল ৯৮.৯৭ হেক্টর, পান ১.৯৪ হেক্টর, বাঁশ ১১.০৪ হেক্টর, তামাক ৫.৪১ হেক্টর।

২০০৬-০৭ সালে এই ব্লকের বিভিন্ন ফসল চাষের এলাকা এইরূপ, আউস (উন্নত বীজ) ৫০০ হেক্টর, আউস (স্থানীয় বীজ) ৫০ হেক্টর, আমন (উন্নত বীজ) ৯০০০ হেক্টর, আমন (স্থানীয় বীজ) ২০০ হেক্টর, ভূট্টা ৯০ হেক্টর, ভাদু ঘাস ২ হেক্টর, মাস কলাই ৩৫ হেক্টর, ভাদু তিল ১০ হেক্টর, ভাদু বাদাম ৩ হেক্টর, শীত তিল ১০ হেক্টর, পাট ১ হেক্টর, মেস্তা ১ হেক্টর, ভাদু লঙ্কা ১১ হেক্টর, ভাদু সব্জি ৩৩৬ হেক্টর, হলুদ ৩ হেক্টর, নারকেল ২১ হেক্টর,

বোরোধান ৬৫ হেক্টর, গম ২২৫ হেক্টর, অড়হর ৬০ হেক্টর, কলাই ৩৫ হেক্টর, মুসুর ২৫ হেক্টর, মটর ১৫ হেক্টর, খেসারী ২১ হেক্টর, কুলথি ১ হেক্টর, গ্রীষ্ম তিল ১০৮ হেক্টর, তিসি ৬ হেক্টর, সরিষা ৩৯০ হেক্টর, সূর্যমুখী ১৫ হেক্টর, বাদাম ১ হেক্টর, শন ৫ হেক্টর, তুলা ৮ হেক্টর, আখ ৬ হেক্টর, আলু ৬০ হেক্টর, আদা ২ হেক্টর, শীত লঙ্কা ১৫ হেক্টর, গ্রীষ্ম ভুট্টা ১.৫ হেক্টর, গ্রীষ্ম মুঘ ৬ হেক্টর, শীত সব্জি ৪৮০ হেক্টর, গ্রীষ্ম বাদাম ১ হেক্টর, গ্রীষ্ম সব্জি ১৮০ হেক্টর।

ছয় দশক ব্যবধানের এই দুই কৃষি মানচিত্র কৃষি নির্ভর জন জীবন ও অর্থনীতির চাহিদা ও বিবর্তনকে স্পষ্ট করে।

গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক কৃষির ধরণ - একালের ও সেকালের, নিম্নে দেখানো হল

গ্রাম পঞ্চায়েত	আউস ধান (হেক্টর)		আমন ধান (হেক্টর)		বোরো ধান (হেক্টর)		গম (হেক্টর)		ভুট্টা (হেক্টর)	
	৪৪-৪৫ সন	২০০৬-০৭ সন	৪৪-৪৫ সন	২০০৬-০৭ সন	৪৪-৪৫ সন	২০০৬-০৭ সন	৪৪-৪৫ সন	২০০৬-০৭ সন	৪৪-৪৫ সন	২০০৬-০৭ সন
জগদল্লা - ১	৮.৮৩	৭৫০	৩৫৫.৮৭	৭৫০	০	৩	৭.৬৯	২২	০	৭
জগদল্লা - ২		১৫০০		১৫০০		৭		২৮		১৭
আঁচুড়ী	১৭৯.২২	১০৮	২৩৩৫.৭২	২০০০	০	৫	৪.৫৩	৪৩	০.২৪	৬
কেঞ্জাকুড়া	১২	৩০৮	৩১৪২.৫৩	১৫৫০	০	৭	০.৩২	৫২	১.৫৬	৮
আন্দারথোল	০	৮৩	২৩৬৩.০৪	১৯০০	০	২	৩০.৯২	৩৮	০	১৫
কালপাথর	০	৩০৮	৪৬৮২.২২	২০০০	০	৬	৫১৬১	৩২	৫.৭৮	১৭
মোট	১৯৮.৯৫	২৬৫৭	১৬০৭৫.৩৮	৯৭০০	০	৩০	৯৯.২	২১৫	৭.৫৮	৭০

এই তালিকা থেকে বোঝা যায় আউস ধানের প্রবণতা ও এলাকা ছয় দশকে বৃদ্ধি পেলেও কৃষি জমির পরিমাণ সঙ্কোচনে, আমন ধানের ফলন ৪০% হ্রাস পেয়েছে। সেচের সুযোগ বৃদ্ধিতে ১৩৪৪ হেক্টর জমি দুফসলি, ৭৫০ হেক্টর তিন ফসলি করা সম্ভব হয়েছে। ১৮৪৪ হেক্টর সেচ-সেবিত এলাকা ছাড়াও সম্প্রতি কয়েক হাজার হেক্টর জমিতে ইন-সি-টু জল সংরক্ষণ ও সেচ সম্ভব হয়েছে ক্ষুদ্র জলবিভাজিকা কর্মসূচী রূপায়ণে। মূলত সেচের উৎসের পাশাপাশি জমি সমূহে সব্জি চাষ হয়। সূর্যমুখী, ভুট্টা, তিল-সরিষা এলাকা সম্প্রতি অনেক বেড়েছে। বাঁশী, পোড়ামৌলী, গোঁসাইডিহি এলাকায় ব্যাপক সব্জি চাষ হয় যা কলকাতা, বিহার, ঝাড়খণ্ডকেও প্রত্যহ সরবরাহ করা হয়। মানুষমুড়া এলাকায় বহু কৃষক পানের চাষের সঙ্গে জড়িত। কুস্তরা, ধগড়িয়ার বিস্তৃত এলাকায় ওল, কচু ইত্যাদির চাষ হয়। সম্প্রতি সমগ্র ব্লক জুড়ে আদা, হলুদ, ওল চাষের সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে। সোল-কানালী জমিতে দীর্ঘ সময়ের (৪-৬ মাস) ধান ও বাইদ উঁচু কানালী জমিতে কম সময়ের (৩-৫ মাস) ধান লাগানো হয়। মোট খারিফ শস্যের ৯৪% ই ধান, ৩% সব্জি, অড়হর ১%, ভুট্টা ১%, দানাশস্য ইত্যাদি ১%। সম্প্রতি টাঁড় জমিতে তুলা চাষ জনপ্রিয় করার চেষ্টায় আছে কৃষি দপ্তর, এই চাষের প্রসারের সাথে উৎপাদিত তুলার সঠিক দাম ও বিপণণ সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

কৃষি সমাজ ঃ জোত ও জাতি ভিত্তিক অনুপাত

ইংরেজ প্রবর্তিত বিভিন্ন ভূমি বন্দোবস্ত নীতি কৃষি, কৃষি অর্থনীতি ও কৃষকের অর্থনীতি ও কৃষকের জীবন প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করেছে ঘনিষ্টভাবে। কৃষিজমির উপর কৃষকের অধিকার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এইসব আইন - নীতি ও আইনসিদ্ধ ভূমি ব্যাপারীদের দ্বারা। ইংরাজশাসিত সময়ে রায়, বাউরী, আদিবাসী প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে কৃষি জমির পরিমাণ ও কৃষি ফসল বহু গুনিত হলেও, জমির উপরে কৃষকের স্বত্ত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া অবহেলিতই থেকেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, প্রজাস্বত্ত্ব আইন, স্বাধীনোত্তর কালে ভূমি সংস্কার আইনের হাত ধরে কৃষকের অধিকার অনেকটাই সুরক্ষিত হয়।

বাঁকুড়া - ১ ব্লকে মোট পরিবার ১৭৬৫০ ও মোট জনসংখ্যা ৮৪৮৭৬। জনসংখ্যার ৩১৪৫২ জন তপশীলি জাতি ও ৪৯৪৩ জন উপজাতি যা শতাংশের হিসাবে যথাক্রমে ৩৭.১% ও ৫.৮৪%।

ক্ষুদ্র চাষী (২.৫-৫ একর জমি) আছেন ৪৬১৫, প্রান্তিক চাষী (২.৫ একর পর্যন্ত) ৭৪৫৫ জন, ৩৪৫ বড় চাষী (২.৫ একরের বেশী), বর্গাদার ৩১৩১ জন, পাট্টাদার ১৮২৫ জন, ভূমিহীন শ্রমিক ৯৭৩০ জন।

বৃহৎ জোতগুলি মূলত সাধারণ ও তপশীলি জাতিভূক্ত একাংশের দখলে। সোল-বহাল এলাকার উর্বর জমির বেশীরভাগই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ চাষীদের মালিকাধীন। খুব কম প্রান্তিক চাষীরই সোল-বহাল বা নিম্নকানালী এলাকায় জমি আছে। তাদের বেশীরভাগ জমিই বাইদ শ্রেণীভুক্ত। পাট্টা জমির অধিকাংশই বাইদ শ্রেণীর। উপজাতিদের দখলে জমির পরিমাণ কম।

ব্যাঙ্ক, কৃষি সমবায় - অভিবাসনতত্ত্ব ও বাজার অর্থনীতি

কৃষিকাজের জন্য কৃষকের কাছে প্রাথমিক চাহিদা অর্থ। এর বেশিরভাগটাই আসে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে। নিজস্ব সঞ্চয় ছাড়া মূলত কৃষকরা হাত পাতেন স্থানীয় মহাজনদের কাছে। প্রায়শই তাদের সুদের হার ১২০ শতাংশ। সহজ শর্তে; অর্থের যোগানের অভাবই কৃষকের কৃষিকাজ ও আর্থিক উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। সমবায় সমিতিগুলির নিষ্ক্রিয়তা ও অপ্রতুল আর্থিক সংগতি এর একটি বড় কারণ। কালপাথর গ্রামপঞ্চায়েতে একটিও সক্রিয় সমবায় নেই। কেঞ্জেকুড়ায় ১টি মাত্র সমবায় সমিতি সক্রিয়। জগদল্লাহ-২ এ ২টি ও জগদল্লাহ-১ এ ৩টি, আঁচুড়িতে ২টি, আঁধারথোল গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪টি সমবায় সমিতি সক্রিয় আছে। ২০০৫-০৬ অর্থবর্ষে কৃষকদের খরিফে প্রয়োজনীয় পুঁজির মাত্র ৯% যোগান দিতে পেরেছে সমবায় সমিতি। টাকার অঙ্কে যা মাত্র ৮৮০০০০০ টাকার মত। তাও ১২০০ কৃষকের মধ্যে ঋণদান সীমাবদ্ধ ছিল।

ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে আর্থিক প্রাপ্তি ছিল এসময় ২৫০০০০০০/- টাকার মত যা প্রয়োজনীয় পুঁজির ২১%। বাঁকুড়া-১ ব্লকে ৭টি জাতীয় ব্যাঙ্ক ও একটি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কাজ করে। বাকী ৭০ শতাংশ পুঁজি আসে নিজস্ব সঞ্চয় বা মহাজনী ঋণ থেকে। কিশান ক্রেডিট কার্ডের সুযোগ আঁধারথোল গ্রামপঞ্চায়েতের কিছু কৃষক পেলেও, সামগ্রিকভাবে তা আশাব্যঞ্জক নয়। জোরালো সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে কৃষকদের পুঁজির সংকট ও মহাজনী বন্ধন থেকে মুক্ত করা যাবে না।

উন্নত বীজ, কীটনাশক সার, কৃষি উপকরণ ও শ্রমের যোগান কৃষিক্ষেত্রে আর এক প্রয়োজনীয় শর্ত। জেলা সংখ্যাতত্ত্বের পুস্তিকা (হ্যান্ডবুক) থেকে জানা যায় বাঁকুড়া-১ ব্লকে সার বিক্রয় কেন্দ্র ৭০টি এবং বীজ বিক্রয় কেন্দ্র ২৫টি। বেশ কিছু সমবায় সমিতি সার বিক্রয় কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। কখনও কখনও সার, কীটনাশক ও বীজের সরবরাহ অপ্রতুল হলেও, তা গুরুতর সংকটের কারণ হয়নি। কৃষি কাজে লাঙ্গল বলদের ব্যবহার থাকলেও ট্রাক্টর-পাম্পসেট, ঝাড়াই মেসিনের সংখ্যা ও ব্যবহার অনেক বেড়েছে। তবে সীডড্রিলার ইত্যাদি উপকরণের চল প্রায় নেই।

এই অঞ্চলে শ্রম ও শ্রমিকের সংখ্যাধিক্য একটি ঐতিহাসিক সত্য। বিভিন্ন সেচ কর্মসূচী, জলবিভাজিকা উন্নয়ণ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে শস্য নিবিড়তা ১১২ শতাংশ থেকে অনেকটাই বৃদ্ধি পেলেও সারা বছরের কর্মসংস্থান ও কর্মদিবস

সৃষ্টি করা যায়নি। যার ফলে কাজের সন্ধানে মানুষ পূবদেশে যাত্রা করে। সাধারণত ডিসেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে দেশান্তর গমন করে, বর্ষার আগে এরা দেশে ফিরে আসেন। এই অভিবাসনের ঘটনা অভিবাসিতের জমিতে একবারমাত্র ফসল ফলানোর অন্যতম কারণ। সেনসাস প্রতিবেদন অনুসারে ১৮৯১ সনে বাঁকুড়া জেলা থেকে দেশান্তরগামীর সংখ্যা ৬৮০৭৫। ১৯০১ সনে অভিবাসিতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০০০০। ১৯১১ এই সংখ্যা সর্বাধিক হয়ে দাঁড়ায় ৩২১৯০২। কম মজুরি প্রদানের ঘটনা এর অন্যতম কারণ হতে পারে। এই সময়েই ভূস্বামীরা ৩ আনা মজুরি বাড়াতে বাধ্য হন (সূত্র : বি.ফোলির বাংলার শ্রম প্রতিবেদন)। ১৯২০ সালে অভিবাসিতের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১৫১০৬৩।

বাঁকুড়া-১ ব্লকেও আনুপাতিক হারে পূবে যাওয়ার ঘটনা ঘটে থাকে। মূলত কালপাথর গ্রামপঞ্চায়েত, আঁধারথোল গ্রামপঞ্চায়েত, কেঞ্জাকুড়া গ্রামপঞ্চায়েত ও আঁচুড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের কেঞ্জাকুড়া গ্রামপঞ্চায়েত সন্নিহিত গ্রামের বাউরি সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু পরিবার পূবে খাটতে যান। আদিবাসীদের মধ্যে বর্তমানে এই প্রবণতা কম। ২০০৬-০৭ অর্থবর্ষে কালপাথরের ধুলাডি, মুন্যাডি, রাঙ্গামেট্যা, কাশিবেদ্যা, আঁধারথোলের সেগুনসারা, শুনুকপাহাড়ী, কেঞ্জাকুড়ার বদরা-মেটাকোলা, আঁচুড়ির পাপুরডি প্রভৃতি গ্রামের হাতে গোনা কয়েকটি বাউরী পরিবার ছাড়া কেউ পূবে যাননি। কৃষি উন্নয়ন, জলবিভাজিকা উন্নয়ন, ১০০ দিনের কাজের কর্মসূচীই এর কারণ।

ব্যক্তি উদ্যোগে ও সম্প্রতি স্বনির্ভর দলের দ্বারা কৃষিপণ্যজাত দ্রব্যাদি উৎপন্নের চল থাকলেও (যেমন ভাতাচি, মুড়ি-মশলা), কৃষকেরা নিজ প্রয়োজনীয় পণ্যের অতিরিক্ত অংশ সরাসরি বিক্রয়েই বেশী আগ্রহী। স্থানীয় সব্জি ও খুচরা কৃষিপণ্যের বাজার, স্বল্পাকারে কেঞ্জাকুড়া, বাদুলাড়া, আঁচুড়ি, ধলডাঙ্গা, শুনুকপাহাড়ী, পোয়াবাগান, কাশিবেদিয়াতে থাকলেও কৃষিপণ্যের সন্নিহিত শহরে এবং সব্জির ক্ষেত্রে ঝাড়খণ্ড-বিহারে বড় বাজার আছে। ২০০৬-০৭ অর্থবর্ষে সমবায় সমিতি কর্তৃক ধান ক্রয়ের পরিমাণ প্রায় ১৫০০০ মেট্রিকটন। ব্লকে উৎপাদিত সূর্যমুখী বীজের তেমন ক্রেতার সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। কোন কোন সময়, বিশেষত ভাদ্রমাসে কৃষি পণ্যের কম দামে অভাবী বিক্রয়ের ঘটনা ঘটে থাকে (ডিসট্রেস সেল)। এই সময় কাজের সুযোগও খুব কম থাকে। সম্প্রতি ইলামী বায়োটেক সহ বিভিন্ন কোম্পানীর সহযোগিতায় তোড়া জমিতে ভেরেন্ডা, করঞ্জি, আঙ্গুর প্রভৃতি চাষে কৃষকেরা উৎসাহ দেখাচ্ছেন।

সেচের উৎস ও কৃষিসেচ

এই ব্লকের মাঝখান দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে গেছে দ্বারকেশ্বর নদ। ব্লকের মধ্যে এর দৈর্ঘ্য ১৬.২ কিমি। বর্ষার কয়েকদিন মাত্র নদী জলপূর্ণ থাকে, বাকী সময়ে ক্ষীণ জলরেখা খুঁজে নিতে হয়। কেঞ্জাকুড়া ও আঁচুড়ি গ্রামপঞ্চায়েত দুটি এই নদীর উত্তরে অবস্থান করে। কালপাথর, আঁধারথোল, জগদল্লা-২, জগদল্লা-১ - গ্রামপঞ্চায়েত চারটি নদীর দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত। ব্লকের মধ্যাঞ্চলের এই নদীপথ সবচেয়ে নিচু এলাকায় হওয়ায় এবং ব্লকের সীমান্ত অঞ্চল উঁচু ও বনভূমি হওয়ায়, সীমান্ত এলাকা থেকে বৃষ্টির জল বিভিন্ন জোড়, উপজোড়, সোল জমি বেয়ে নদীতে পড়ে।

সবচেয়ে বড় জোড় মাতলাজোড়ের (১০ কিমি) উৎপত্তি কালপাথরের বনচিংড়ার বনভূমি ও উঁচু এলাকা থেকে। ধগড়িয়া, নাঙ্গলবেড়া, ছেন্দুয়া হয়ে এই জোড় আঁধারথোল গ্রামপঞ্চায়েতের রামজীবনপুর-শ্যামডাঙ্গা, দেবগ্রাম হয়ে দ্বারকেশ্বরে মিশেছে। চিকচিকা বনাঞ্চল থেকে একটি উপজোড় ও শুনুকপাহাড়ী টিলার পাদদেশ থেকে সুতিজোড়, মাতলাতে রামজীবনপুর শ্যামডাঙ্গার নিচে এসে মিশেছে। আঁচুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সবচেয়ে বড়জোড় যমুনা বা যোগিনী (৮.৩ কিমি) গৌরীপুর সন্নিহিত বনাঞ্চল থেকে বেরিয়ে আঁচুড়ি, আইলাকুন্দি প্রভৃতি মৌজা পেরিয়ে দ্বারকেশ্বরে এসে মিশেছে। এই পঞ্চায়েতের দামড়াগোড়িয়া জোড় (২.৬ কিমি) হীর বনাঞ্চল থেকে নির্গত হয়ে জলহরি, উত্তর বনকাটা হয়ে দ্বারকেশ্বর নদীতে মিশেছে। বরুট পার্শ্ববর্তী এলাকার জল ১.৫ কিমি সোল এলাকা বেয়ে নদীতে মিশেছে। জগদল্লা-২ গ্রামপঞ্চায়েত ঝড়িয়া-আঙ্গাড়িয়া বনাঞ্চল, মাকরকেন্দি উচ্চভূমির জল আঙ্গারিয়া জোড় (৫.৮ কিমি) বেয়ে আগয়া, আড়ালবাঁশি, মানুষমুড়া মৌজা হয়ে দ্বারকেশ্বরে পড়ে। জগদল্লা-১ গ্রামপঞ্চায়েতের ওন্দা সীমান্তবর্তী তোড়া

ও বনভূমির জল পাঁচামীসিনি (৩.৩ কিমি) মত ছোট জোড়-উপজোড় (কুদ্রাসিনি, ফুলবাগী) ও সোল হয়ে দ্বারকেশ্বরে প্রবাহিত হয়। ইন্দপুর ব্লকের সীমান্তবর্তী পোড়ামৌলি বনাঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে অন্যতম দীর্ঘ জোড়, উজানি জোড় (৮ কিমি) ধোবাগ্রাম, নয়াবাদি, হেলনা-শুশুনিয়া, বাইন্দকা, উপাড়সোল, কৃষ্ণনগর হয়ে দ্বারকেশ্বরে মিশেছে। হেলনা-শুশুনিয়ার অন্যপ্রান্তে একটি উপজোড় ওন্দার ডিকশুলি মৌজা থেকে বের হয়ে বাইন্দকার কাছে উজানী জোড়ে মিশেছে। জগদল্লা মৌজার উচ্চ এলাকার জল ১ কিমি সোল হয়ে পাতাকোলার কাছে দ্বারকেশ্বরে মিশেছে।

কেঞ্জাকুড়া গ্রামপঞ্চায়েতের ধুলকুমারী-নিদয়া বনাঞ্চলের জল মাঝকানালী জোড় (৫.১ কিমি) দিয়ে উরিয়ামা, বনকাটা, পচিরডাঙ্গা হয়ে দ্বারকেশ্বরে পড়ে। গোঁসাইডি সন্নিহিত ছাত্‌নার উঁচু এলাকা ও বনভূমির জল গোঁসাইডি জোড় (২.৩ কিমি) দিয়ে গোঁসাইডি, ভালাইডির মধ্য দিয়ে দ্বারকেশ্বরে পড়েছে।

কালপাথর অঞ্চলের কুস্তরা বনাঞ্চলের জল ভালুকসুন্দা জোড় (৫.৪ কিমি) দিয়ে কুস্তরা, নেকরাগড়া, কালপাথর, বড়বাগান, ভালুকসুন্দা হয়ে দ্বারকেশ্বর নদীতে প্রবাহিত হয়। তাছাড়া ছাত্‌না ব্লকের সীমান্তবর্তী ছাগলকুটা জোড় (৩.৬ কিমি) কাশিবেদ্যা, বড়বেদ্যা, জামবেদ্যা, বেলিয়া, বাসুলিতোড়া স্পর্শ করে দ্বারকেশ্বরে মিশেছে। দিনারগ্রাম, ধুলাডি এলাকার জল একটি ৩ কিমি সোল দিয়ে প্রবাহিত হয়।

এইসব জোড়ে কৃষকেরা বর্ষা পরবর্তী সময়ে মাটির বাঁধন দিয়ে জল আটকে সেচের ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক কিছু পাকা বাঁধনও তৈরী করা হয়। যেমন কেঞ্জাকুড়া গ্রামপঞ্চায়েতের গোঁসাইডি, মাঝকানালী, পচিরডাঙ্গায় ৩টি চেকড্যাম নির্মিত হয়। আঁধারথোল পঞ্চায়েতের মাতলা জোড়ে দেবগ্রামে একটি ও কালপাথরের ছেন্দুয়াতে একটি চেকড্যাম তৈরী হয়। এই সমস্ত চেকড্যাম ও কালপাথরের ভালুকসুন্ধায় একটি পুরান চেকড্যাম থেকে খরিফ শস্যে শুখাসময়ের জরুরি সেচ ছাড়া ও রবি ফসলও হয়, পার্শ্ববর্তী জমিগুলিতে। তাছাড়া আঁচুড়ি গ্রামে যমুনা জোড়ে ও উঃ বনকাটি গ্রামে দামড়গোড়া জোড়ে দুটি চেকড্যাম করা হয়েছিল।

বর্তমানে চেকড্যামের মাধ্যমে সোল এলাকায় জলসংরক্ষণের পরিমান বাড়াতে ব্লকের জোড়গুলিতে ২০০৬-০৭-এ বহুসংখ্যক চেকড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। উজানী জোড়ের উপর সেগুনসাড়া ও নয়াবাদী মৌজায় দুটি ও নিম্ন অববাহিকায় হেলনা-শুশুনিয়া মৌজার দুইদিকের জোড়ে ৬ খানি চেকড্যাম হয়েছে। ধোবারগ্রামে আরোও দুটি চেকড্যামের প্রস্তুতি চলছে। আঙ্গারিয়া জোড়ের উপর পরপর ৮টি চেকড্যাম নির্মিত হয়েছে।

মাতলা জোড়ের উপর চিংড়া, ধগড়িয়া, নাঙ্গলবেড়ায় একটি করে ও রামজীবনপুর-শ্যামডাঙ্গায় ২টি চেকড্যাম করা হয়েছে। তাছাড়া চিকচিকা উপজোড়ের উপর ৬টি ছোট চেকড্যাম তৈরী করা হয়েছে। কালপাথর গ্রামপঞ্চায়েতর ভালুকসুন্ধায় ৩টি (নেকড়াগড়া, বড়বাগান, বেলিয়া) চেকড্যাম তৈরী করা হয়েছে। ছাগলকুটা জোড়ে আরো ৩টি (চিংড়া, কাশিবেদ্যা, জামবেদ্যা) চেকবাঁধন দেওয়া হয়েছে।

আঁচুড়ি গ্রামপঞ্চায়েতে দামড়াগোড়া জোড়ের উঃ বনকাঠিতে একটি চেকড্যাম তৈরী করা হয়েছে। গোঁসাইডি জোড়ের ভালাইডিতে একটি চেকড্যাম ছাড়াও যমুনাজোড়ে একটি, মাঝকানালী জোড়ে ২টি চেকড্যামের প্রস্তুতি চলছে।

জগদল্লা-১ পঞ্চায়েতের পাঁচামীজোড়ে ধলডাঙ্গায় ১টি চেকড্যাম ছাড়াও জগদল্লাহ সোলের উপর ছোট ৩টি চেকড্যাম নির্মিত হয়েছে। এই চেকড্যামগুলির সাহায্যে কয়েকশ হেক্টর জমিকে ক্ষুদ্রসেচের আওতায় আনা গেছে। কুদ্রাসিনি ও ফুলবাগী উপজোড়ে তিনটি চেকড্যাম তৈরীর প্রস্তুতি চলছে।

কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে ও রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনায় বিভিন্ন জলাশয়ের সংযোগকারী মাঠনালা (১-২ কিমি) তৈরী করে সেচের সুযোগ বাড়ান হচ্ছে। যেমন পহীবাঁধের (চিংড়া), শ্যামপুর, বড়পুকুর, খাপ মাঝের বাঁধ, ধোবার গ্রাম উপরবাঁধ, জগদল্লা-১ ও ২ এর বিভিন্ন জলাশয়ের সংযোগকারী নালা। ডিকশুলি-হেলনাশুশুনিয়া খাল খনন সম্পূর্ণ হলে কংসাবতী প্রকল্পের অতিরিক্ত জলে এই মৌজার কয়েকশ একর জমিতে সেচ হবে।

দ্বারকেশ্বর নদীর জল উত্তোলন করে (আর.এল.আই) নদী তীরবর্তী ৩৭০ হেক্টর জমিকে সেচ সেবিত করা

গেছে। এই আর.এল.আই গুলি হলো, (১) মোলবনা, (২) কাপিষ্ঠা, (৩) বরুট, (৪) কলাবতী, (৫) নন্দীগ্রাম, (৬) ছাতারডি। শেষোক্ত আর.এল.আই. দুটি গান্ধীবিচার পরিষদ পরিচালিত ছিল এবং পরিচালনার সমস্যাজনিত কারণে প্রকল্প দুটি বন্ধ আছে। তাছাড়া কয়েকটি মিনি আর.এল.আই. (১) নবোদয় (২) বদরা (৩) ভোলা (৪) বাঁশী (৫) বড়দৌলি প্রকল্প থেকে ১৫০ হেঃ কৃষিজমি সেচ পেয়ে থাকে। রাঙ্গামেটা সহ আরো কয়েকটি গ্রামে মিনি আর.এল.আই. তৈরীর প্রস্তুতি চলেছে। বাঁকুড়া-১ ব্লক জুড়ে ৮২৫টি পুকুর-বাঁধ জলাশয় থেকে ৪২৫ হেক্টর কৃষিজমিতে সেচের কাজ হয়। জলাশয়গুলির অধিকাংশই বাইদ এলাকায় অবস্থিত। কম সংখ্যক জলাশয়ই কানালী-বহাল অঞ্চলে অবস্থিত। পুকুরগুলির অবস্থান সাধারণভাবে এমন স্থানে যাতে উচ্চ এলাকার জল বর্ষায় পুকুরে ঢুকতে পারে এবং সেচের প্রয়োজনে এই জলাশয়ের জলে নিচের এলাকার জমিতে সেচ হতে পারে। বিভিন্ন জলবিভাজিকা এলাকার ফলের বনে কলস সেচের প্রচলন করা হয়েছে। তাছাড়া বড়বাগান মৌজার আমবনে ক্ষুদ্রসেচ দপ্তর থেকে ঝর্ণা (স্পিংলার) সেচের ব্যবস্থা হচ্ছে।

কংসাবতী সেচপ্রকল্পের সেচনালা দিয়ে জগদল্লা-১ ও জগদল্লা-২ কিছু কৃষি এলাকায় সেচকাজ হয়। জগদল্লা-১ পঞ্চায়েতের ডাবরা-আড়ালবাঁশী সন্নিহিত এলাকা জগদল্লা-২ এর ভাতুড়ি, উপারশোল, দঃ বনকাটি সন্নিহিত ৬২৫ হেঃ এলাকা এই প্রকল্পে সেচ সেবিত। ছাত্‌নার ছাগলকুটা জলাধার থেকে একটি সেচনালা চিংড়া, কাশিবেদ্যা, বড়বেদ্যা ও জামবেদ্যা মৌজা পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই সেচ নালা থেকে কয়েকশ একর জমিতে চাষ হয়ে থাকে।

পোড়ামৌলি গ্রামে অগভীর নলকূপ সেচ থাকলেও, গভীর নলকূপ সেচ বাঁকুড়া-১ ব্লকে নেই। ৬০৫টি নলকূপ থেকে ৪৩৮ হেঃ কৃষিজমি সেচ পেয়ে থাকে। পোড়ামৌলি গ্রামের অনতিদূরের কংসাবতী ক্যানেল থেকে জল উত্তোলন করে এই গ্রামে সেচের একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

ব্যক্তিগত ও সরকারী উদ্যোগে কৃষিজমিতে সেচের জন্য বহু সেচকূয়া তৈরী করা হয়। সাত-এর দশকে এমন বহুকুয়োর সাথে ছেলেবাখরা, সোনামেলা ও বরুটে তিনটি বৃহৎ মাঠকূয়ো তৈরী করা হয়। বর্তমানে কেবল ছেলেবাখরার বৃহৎ ইন্দারাটি অক্ষত আছে। এছাড়া গান্ধী বিচার পরিষদ কিছু মাঠ-ইন্দারা খনন করে। এধরনের বিভিন্ন সেচ উৎস থেকে ১৭৯ হেক্টর জমিকে সেচ সেবিত করে গেছে। কোন কোন স্থানে ঝর্না (অটো ফ্লো) থেকে সন্নিহিত এলাকায় সেচ হয়। যেমন - মোলবনা গ্রামের উষ্ণ প্রস্রবণ ও শুনুকপাহাড়ী টিলার পাদদেশের ঝর্না। ১৮টি জলবিভাজিকা উন্নয়ন কর্মসূচী দ্বারা হাজার হেক্টরের বেশী চাষজমি ইন-সি-টু জলসংরক্ষণের মাধ্যমে বহুফসলি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

গ্রামপঞ্চায়েতওয়ারী কৃষিজমি ও বিজ্ঞাপিত সেচ সেবিত জমির খতিয়ান নিম্নরূপ -

গ্রাম পঞ্চায়েত	মোট চাষ এলাকা (হেক্টর)	মোট সেচ এলাকা (হেক্টর)	সেচ এলাকা (শতাংশে)
জগদল্লা-১	৭৫৯.৯	২২৫.৬৬	২৯.৭০
জগদল্লা-২	১৬৭৫.৯৭	৪১৮.৮৮	২৪.৯৭
আঁধারথোল	২৬২২.৯	৪৫০.৪৯	১৭.১৮
কালপাথর	২২৯৮.১৩	৪৩১.৪৩	১৮.৭৭
আঁচুড়ি	২২৫৬.২৫	৫৬৯.৭৬	২৫.২৫
কেঞ্জাকুড়া	১৮৩৯.৭২	৩২৪.৫০	১৭.৬৪
মোট	১১৪৫২.৮৭	২৪২০.৩২	২১.১৩

জলবিভাজিকা ধারণায় উন্নয়ন ঃ নতুন পথের খোঁজে

জলবিভাজিকা ধারণায় বাঁকুড়া-১ ব্লকের মিল গাছের পাতার সাথে, দ্বারকেশ্বর নদ সেই পাতার শিরা আর জোড়গুলি উপশিরা। পাতার প্রান্তদেশ থেকে যেমন সব জলবিন্দু উপশিরা বরাবর নেমে মূলশিরা দিয়ে পাতার বাইরে যায় তেমনই, ব্লকের উঁচু সীমান্তদেশ থেকে উৎপন্ন জোড়গুলির মধ্য দিয়ে প্রায় সব বৃষ্টির জল নদীপ্রবাহে মিশে যায়। এই ব্লকে মোট বৃষ্টিজলের পরিমাণ সারাবছরে ১.৫ হেক্টরমিটার অর্থাৎ বছরের মোট বৃষ্টিজল ভূপৃষ্ঠে অক্ষয়ভাবে সঞ্চিত হলে ১.৫মি/৪.৫ ফুট জল দাঁড়িয়ে থাকত। এই বিপুল জলরাশির বেশীর ভাগই পৃষ্ঠপ্রবাহ (রানঅফ), বাষ্পীভবন-বাষ্পমোচন, মাটি চুঁইয়ে ব্লক এলাকার বাইরে চলে যায়। অথচ ১.৫ হেক্টরমিটার জলের প্রায় অর্ধেক আটকে রাখতে পারলে সমগ্র কৃষিজমিকে ২-৩ ফসলি করে তোলা সম্ভব। আর সম্ভব জলপ্রবাহের সাথে চিরাচরিত ভূমিক্ষয় ও উর্বরতাক্ষয় রোধ করা। এই লক্ষ্যেই জলবিভাজিকা উন্নয়ন কর্মসূচী। একটি সাধারণ নিকাশী নালা দিয়ে যে এলাকার জল বেরিয়ে যায়, সেই অঞ্চলটিকে চিহ্নিত করে বলা হয় ক্ষুদ্র জলবিভাজিকা অঞ্চল। সমগ্র ব্লককে এরূপ ৩৮টি জলবিভাজিকা অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে (এই ক্ষুদ্র জলবিভাজিকা ৩০০-১০০০ হেক্টরের)। যেহেতু এই ক্ষুদ্র জলবিভাজিকার ১.৫ হেক্টর মিটার বাৎসরিক বৃষ্টির জলের অধিকাংশই এই অংশের উর্বর মাটি ধুয়ে নিয়ে যায়, জলবিভাজিকা পরিকল্পনায় এই জল-মাটি-উর্বরতা ক্ষয়রোধের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হয়।

যেহেতু ক্ষুদ্র জলবিভাজিকা উচ্চ অঞ্চলের মাটি ও মাটির উর্বরতা বৃষ্টির জলে ক্ষয়িত হয়ে নিচু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়, জলবিভাজিকা পরিকল্পনায় জলবিভাজিকা অঞ্চলের সীমান্ত সংলগ্ন উঁচু অঞ্চলের জল ও মাটি সংরক্ষণের কাজ প্রথম শুরু করা হয়। যেহেতু এই অংশের টাঁড়-বাইদ-তোড়া জমির ভূমিক্ষয় সর্বাধিক এই অংশে ফিল্ডবাইন্ডিং ও নালা (ট্রেঞ্চ) কেটে মাটি মিশ্রিত জলপ্রবাহ রোধ করা হয়। এই বাঁধন বা নালা জলপ্রবাহের ৯০ ডিগ্রি কোণে দেওয়া হয়। ভূমির প্রকৃতি ও ঢালের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রকমের বাঁধন ও নালা (ফিল্ড বান্ডিং, কন্টুর বান্ড, টানা কন্টুর বান্ড, বিচ্ছিন্ন কন্টুর বান্ড, ভিট্রেঞ্চ, ভেজিটেটিভ হেজ, ট্রেঞ্চ উইথ হেজ ইত্যাদি) দেওয়া হয়। তাছাড়া ভূমিক্ষয়রোধে উপযুক্ত ফলবন, বন ও ঘাসবনের চাষ বা ফসলের সাথে এগুলি মিলিয়ে মিশিয়ে চাষ করা হয়। এতে মাটির ক্ষয়রোধ হয় ও জলভরণ (রিচার্জিং) বাড়ে। জলের পৃষ্ঠপ্রবাহের গতি হ্রাস পেয়ে (নালা বা বাঁধনে বা গাছের দ্বারা) জল ভূ-মধ্য প্রবেশ করে। টাঁড়-বাইদ এলাকার জলাশয়গুলি সংস্কারের মাধ্যমে, উপরিভূমির জল ভূস্তরে প্রবেশের ব্যবস্থা করে জলসংরক্ষণ বাড়ান হয়। এই অংশে ৩০-৪০ মডেলের ফিল্ড-বাইন্ডিং ও গাড্ডার মাধ্যমে মাটি-জল সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হয়। কানালী অঞ্চলে জমির ৫% হাপায় পরিণত করে জলসংরক্ষণ ও সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জমির আইলে নিম-করঞ্জ প্রভৃতি গাছ লাগান হয়। সোল এলাকায় জলক্ষরণ গাড্ডা খনন করে সেচের কাজ করা হয়। বনকাটা গ্রামের তোড়াতে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে, কেঞ্জাকুড়া বাঁশ শিল্পোপযোগী বাঁশী প্রজাতির বাঁশ চাষ করা হচ্ছে। বনকাটা, চিংড়া, কালপাথরের তোড়া এলাকায় সৃষ্ট অর্জুন বনে রেশমগুটি প্রকল্প চালু হয়েছে। ব্লকে বহুসংখ্যক লাক্ষা উৎপাদক পলাশ গাছ, গুড় উৎপাদনকারী খেজুর গাছ, ফাইবার ব্রাস উৎপাদনকারী তালগাছ আছে। বাইন্দকা, চতুরডি, সুপুরডি প্রভৃতি গ্রামে মহলদাররা বাণিজ্যিকভাবে খেজুর গুড় তৈরী করেন। বাদুল্লাড়া-নিদয়ার কিছু স্বনির্ভর দলকে তালডাঁটা থেকে ফাইবার ব্রাস তৈরীর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। চিংড়া-বনচিংড়া এলাকায় লাক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

সোল এলাকায় জল সংরক্ষণ ও জলপ্রবাহের গতি হ্রাসের উদ্দেশ্যে জোড়ে একাধিক চেকড্যাম নির্মাণ করা হয়। সকল কৃষিজমির উর্বরতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ব্যাপক জৈব-কেঁচো সার ব্যবহার করা হচ্ছে। জলবিভাজিকা এলাকার উপযুক্ত শস্যের ও শস্যপর্যায় অনুসরণ করার জন্যে চাষীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। সূর্যমুখী, ভুট্টা, কলাইয়ের, সরিষার চাষ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বিভিন্ন শস্য পদ্ধতি (মিক্সড ক্রপ, ইন্টার ক্রপ) জনপ্রিয় করা হয়েছে। ৯০ দিনের খরা সহনশীল বাইদ এলাকার বন্দনা ধানের প্রচলন করা হয়েছে। যেহেতু বর্ষাঋতুতে প্রায়শই ৭-২০ দিনের অনাবৃষ্টি দেখা দেয়, ফলন অক্ষত রাখার জন্য বাঁকুড়ায় এই ধান খুবই উপযোগী। বাইদ জমিতে ধানের ফলন অপেক্ষাকৃত কম বলে, ধানের পরিবর্তে ভুট্টা, সূর্যমুখী, বিভিন্ন ডাল-দানা-তেল শস্যের প্রসার ঘটান হয়েছে। কানালী-সোলে দ্বিতীয়-

ভূগর্ভস্থ জলস্তর মানচিত্র ঃ বাঁকুড়া

Soil Series Association
Bankura-I Block

Contour (interval 20 m)
Drainage
Mouza Boundary
Deuli-Dulaid
Kantaban-Dayalpur
Ranga-Taldangra
Phulkusma-Bhulanpur
Bhulanpur-Taldangra
Kese-Ramsagar
Lohamara-Ranga
Settlement
Water Body
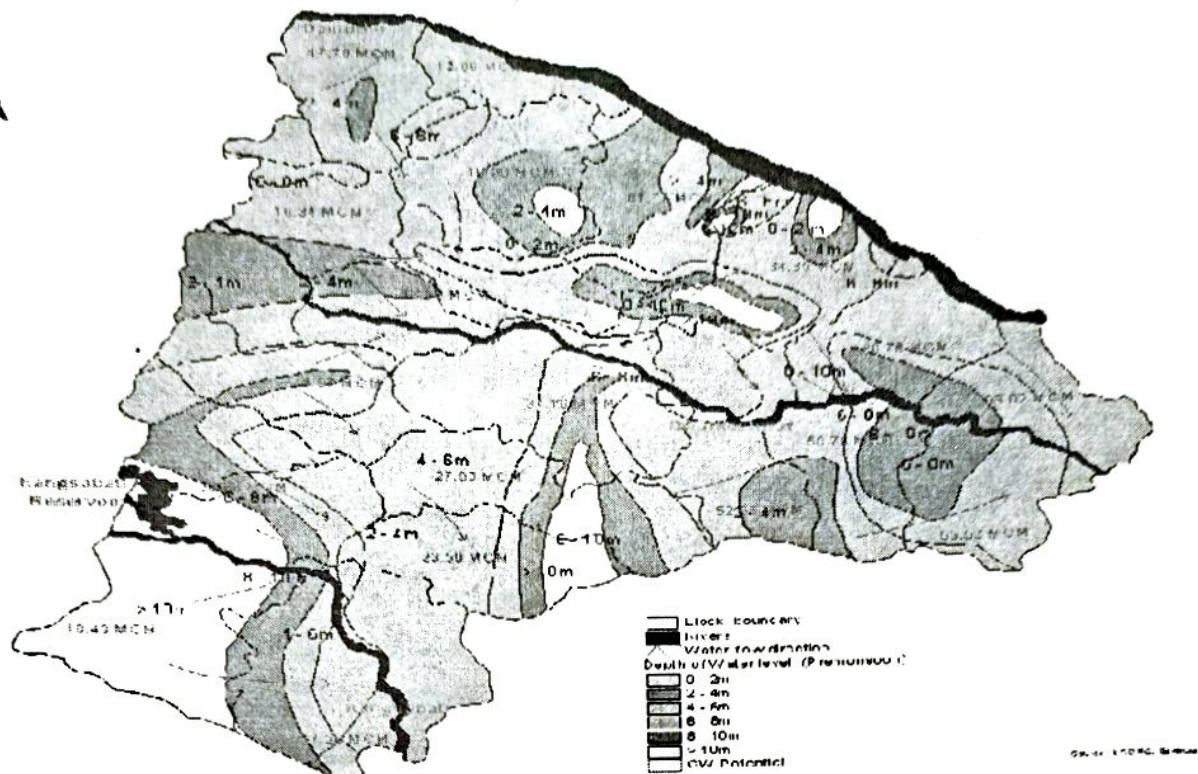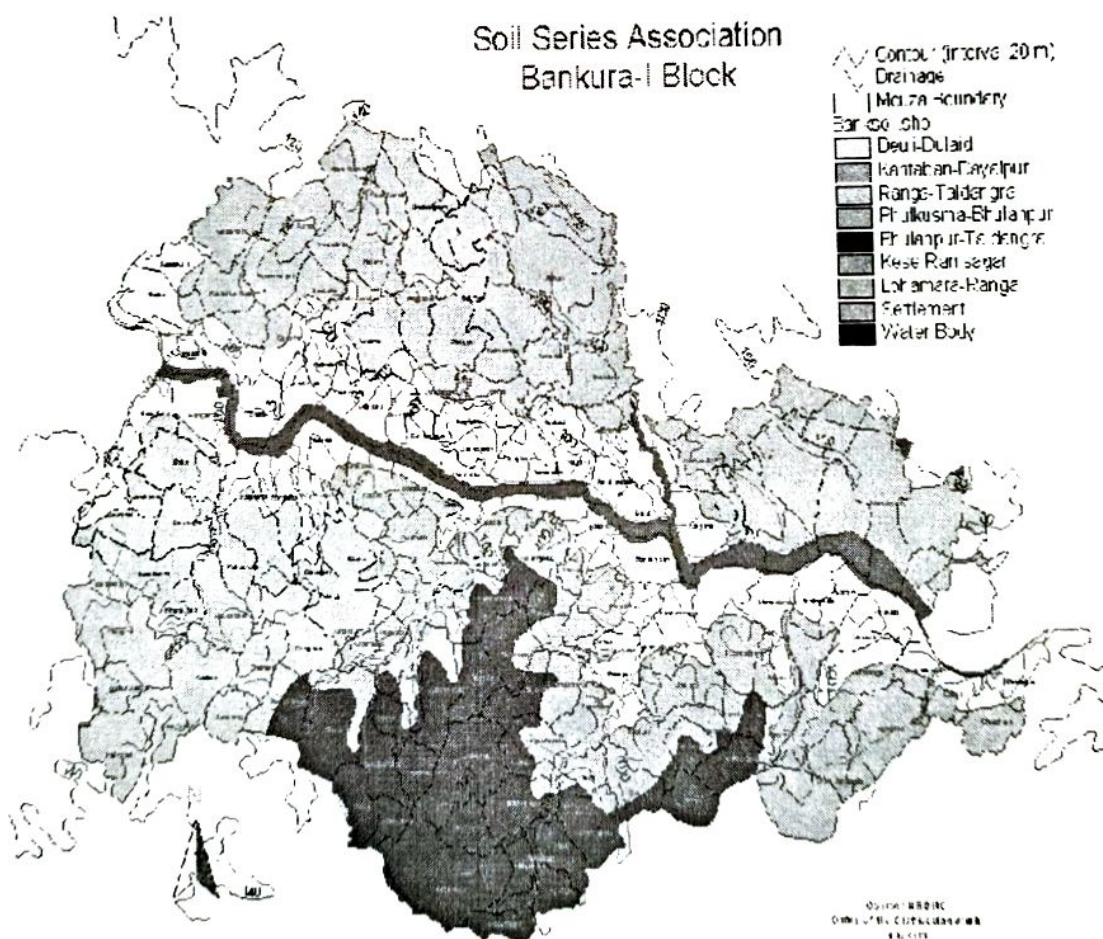
মৃত্তিকা শৃঙ্খল মানচিত্র ঃ বাঁকুড়া-১

তৃতীয় ফসল হিসাবে তেল-শষ্য, ডাল ও দানা শস্যের চাষ বাড়ছে। সব্জি চাষেও চাষীদের উৎসাহ বাড়ছে। ২০০৪-২০০৬ বর্ষে বেলিয়া, কুমিদ্যা, আঁচুড়ি, বরুট, মোলবোনা, দামোদরপুর, জগদল্লা প্রভৃতি মৌজায় ব্যাপক সূর্যমুখীর চাষ হয়। ছেলেবাখরা, খাপ, শ্যামপুর, আঁধারথোল সহ বিভিন্ন মৌজায় ব্যাপক তিল সরিষার চাষ হয়। কৃষি দপ্তর চিংড়া, আঁধারথোল, পোড়ামৌলি, মোলবনা, রামনগর, বাঁশী প্রভৃতি এলাকা জৈব সার ও জৈব চাষ (সুসংহত পোকা দমন) শুরু করেছে। কোথাও কোথাও (সালুনী ইত্যাদি) এস.আর.আই. পদ্ধতিতে ধানচাষ শুরু হয়েছে। সালুনী-কালপাথর প্রভৃতি এলাকায় ভুট্টা-বিউলি ইন্টারক্রপিং, গাঁদা-সব্জি মিক্সক্রপিং ইত্যাদি শুরু হয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের "আত্মা" কর্মসূচীতে এই প্রক্রিয়া জোরালো হয়েছে। জলবিভাজিকা অঞ্চলে তরল সারের চল বেড়েছে (জৈব কীটনাশক)।

বাঁকুড়া-১ ব্লকের ক্ষুদ্র জলবিভাজিকা বিডি- ১, ৫, ৭, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ২০ তে রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনা, বিডি-৩, ৪, ৮, ৯, ১০, ৩২, ৩৩ এ নাবার্ডের সহায়তায় "জলবিভাজিকা উন্নয়ন প্রকল্পে" বিডি- ১১,১২ তে এন.ডব্লুউ. ডি পি আর এ কর্মসূচীর আওতায় কাজ হচ্ছে। বাকী জলবিভাজিকাগুলিতে জাতীয় কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে জল ও ভূমি সংরক্ষণের বিভিন্ন কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। আর.এস.ভি.ওয়াই ও নাবার্ড জলবিভাজিকা অঞ্চলে শষ্য নিবিড়তা ১১৯ থেকে ১৭৫ এর মত করা সম্ভব হয়েছে।

২০০৬-২০০৭ অর্থবর্ষে বাঁকুড়া-১ ব্লকে ৭০-এর বেশী পুকুর সংস্কার করা হয়েছে। নতুন চেকড্যাম নির্মিত হয়েছে ৪০টির মতো। সামাজিক বনসৃজনে ৫ লক্ষের মতো গাছ বসান হয়েছে, বিভিন্ন ফলের গাছ বসান হয়েছে ৫০০০০। বেশ কিছু মাঠকূয়ো ও মাঠনালা তৈরী করা হয়েছে। ভেরেন্ডা, করঞ্জির মতো বায়োডিজেল গাছ, আমলকির মতো ঔষধি গাছ বসান হয়েছে ৯০০০০। তোড়া জমি ও সামাজিক বনের মধ্যে সব্জি চাষ; আদা, হলুদ, ওলের চাষের ব্যাপক প্রচল ন হয়েছে। এই সবুজায়ন ও জল সংরক্ষণকে কাজে লাগিয়ে পশুপালন, মৎস চাষে জোর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্বনির্ভরদলকে উন্নত হাঁস, মুরগি, ছাগল দেওয়া হয়েছে এবং মাছচাষে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২৫০ কেঁচোসারের ইউনিট স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়েছে। ২০০টির বেশী ধর্মগোলা তৈরী করে দুর্বলতর শ্রেণীর খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

জলবিভাজিকা উন্নয়ন কর্মসূচীতে, মূলত ভূমিহীনদের জন্যে, মাছ চাষ ও প্রাণী চাষ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল হাতিয়ার। ৮২৫টি জলাশয়ের অধিকাংশতে অন্ততঃ বছরের ৫-৬ মাস জল থাকেই। কয়েকটিতে বর্ষাকালীন ৩-৪ মাসে জল থাকে। হাতে গোনা কয়েকটি জলাশয়ে (যেমন দধিমুখা মৌজার পদ্মডোবা ইত্যাদি) সারা বছর জল থাকে। এই সব জলাশয়ে জলভরণ রেখা ও জলক্ষরণ রেখা মিলিত হয়ে ঝর্ণা বিন্দু সৃষ্টি করে সারা বছর জল পূর্ণ রাখে। মাছচাষের ক্ষেত্রে স্থানীয় পদ্ধতি এবং রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদির প্রবণতাই বেশী। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নত চাষ ও উন্নত প্রজাতির চাষ বাড়ছে। ব্লকে মাছ চাষের সংখ্যাতত্ত্ব এইরূপ (২০০০-২০০১)। ৯৩৫ হেক্টর সম্ভাব্য জলাশয়ের ৭৮০ হেক্টর জলাশয়ে উন্নত মাছ চাষ করা হয়। কালপাথর মাছ সমবায়ের সদস্য, স্বনির্ভর দল ও মৎস্যজীবী ৫২৩২জন এই পেশায় জড়িত ছিল। মোট উৎপাদন ছিল ১০৬১৯ কুইন্টাল। মেটাকোলা প্রভৃতি গ্রামে রঙ্গীন মাছের চাষ জনপ্রিয় করার চেষ্টা চলছে।

প্রাণী পালনে রেড-আইল্যাণ্ড মুরগী, খাঁকী-ক্যাম্পবেল হাঁস, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চল বাড়ছে। উন্নত জার্সি গাই অনেকেই পালন করেন। ব্লকে প্রাণীপালনের সংখ্যাতত্ত্ব এইরূপ (২০০০-২০০১)। গাভী ৪১২৫২, ষাঁড় ৫১০৩, ছাগল ২১৭৩২, মুরগি ৬৭২৮১টি।

তোড়া-টাঁড় এলাকায় সবুজায়ণ ও জলাশয়ে জলের পরিমাণ বাড়ায় প্রাণীপালন-মাছচাষ-হাঁসচাষ ক্রমশ বাড়ছে। বনসৃজনের ফলে জ্বালানীর জন্য গৃহবধূদের দূর অরণ্য থেকে ডালপাতা সংগ্রহের কষ্ট লাঘব হয়েছে অনেকটাই।

বাঁকুড়া-১ ব্লকের ভূগর্ভস্থ জলস্তরের অবস্থা সংযোজিত জলস্তর মানচিত্রে দেখান হয়েছে। তাছাড়া বিগত দুই বছরে জলবিভাজিকা উন্নয়নের সফল রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন গ্রামে ভূগর্ভস্থ জলস্তর ২ থেকে ১০ ফুট বৃদ্ধি পেয়েছে। জলস্তর বৃদ্ধির এই খতিয়ান পরপৃষ্ঠায় ঃ- (ভূ-পৃষ্ঠ থেকে জলস্তর কত ফুট নীচে)

মাস	শুনুকপাহাড়ী	রামজী-পুর	ছেন্দুয়া	চতুরডি	নন্দীগ্রাম	ছেলেবাখরা	ধোবাগ্রাম	চেলেমা	মানুষমুড়া	আগরা
জানু.'০৬	২৭	১৭	২৩	২৩	২৯	১৮	১৯	৩০	১২	১৯
ফেব্রু.'০৬	২২	১৫	১৯	২২	৩০	২০	২০	৩১	১৭	২০
মার্চ'০৬	২০	১২	১৭	২০	২৩	২২	২১	৩২	১৭	২০
এপ্রিল'০৬	১৮	১০	১৫	১৮	২১	২২.৫	২৪.৫	৩৩	১৮	২২
মে'০৬	১৯.৫	১১	১৫.৭৫	১৭	২৬	২২	২৪	২৭	২০	২৩
জুন'০৬	২০.৫	১২	১৬.৭৫	১৮	২৩	২১	২৩	২৬.৫	১৭	২৪
জুলাই'০৬	২৪	১৪.৫	২০.৫	২০	২৫	১৪	১৭	১৮	৩	৪
আগষ্ট'০৬	৩৫	২১.৫	৩০.৫	২৪	৩৩	১৮	১৯	১৯	৪	৪
সেপ্টে.'০৬	৩০	১৯	২৭.৫	২৬	৩৪	১১	১৩	১৪	৪	৫
অক্টো.'০৬	২৮	১৭	২৫.৫	২৪	৩৩	১০	১১	১৪	৬	৬
নভে.'০৬	২৫	১৫	২২.৫	২১	২৪	১১	১২	১৪	৭	৬
ডিসে.'০৬	২৩	১৫.৫	১৮.৫	২০	২৩	১২	১৩	১৫	৯	১২
জানু.'০৭	২১.৫	১৫	১৪.৫	১৯.৫	২২	১২	১৩.৫	১৫.৫	২	১২
ফেব্রু.'০৭	২০	১৬	১৩.৫	১৯	২১	১২	১৪	১৬	১২	১২
মার্চ'০৭	১৯.৫	১৩	১৩.৫	১৯	২০	১২.৪	১৪.৫	১৬.৫	১২	১৪

সুস্পষ্ট এই ভূ-জলস্তর বৃদ্ধির একমাত্র রসায়ণ জলবিভাজিকা উন্নয়ণ কর্মসূচীর সফল রূপায়ণ। ১.৫ হেক্টরমিটার বাৎসরিক বিপুল জলরাশির কিয়দংশ সংরক্ষণ করতে পারলেই বাঁকুড়ার এই ব্লকের একফসলী জমিকে সারা বছরের জন্যে শস্যশ্যামলা রাখা যাবে।

শস্য অপ্রতুলতা থেকে শস্য প্রাচুর্য্য। দারিদ্র থেকে স্বাচ্ছন্দে। আগামী দিনের যাত্রাপথ জলবিভাজিকা উন্নয়নের এই সাফল্যের সরণি বেয়ে। নতুন ভোরের সন্ধানে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল — ডব্লু. ডব্লু. হান্টার
২। বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার্স — ও'ম্যালী
৩। পল্লী প্রকৃতি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪। বাঁকুড়া জনের ইতিহাস-সংস্কৃতি — রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী
৫। এন.আর.ডি.এম.এস — বাঁকুড়া ও এন.বি.এস.এস.এল. ইউ.পি, নাগপুর
৬। বাঁকুড়া-১ কৃষি উন্নয়ন করণ
৭। জেলা সংখ্যাতত্ত্ব পুস্তিকা, বাঁকুড়া
৮। অভিবাসন বৃত্তে বাঁকুড়ার শ্রমিক — রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী
৯। এল.ডি.এম. ও বি.ডি.সি.সি. ব্যাঙ্ক, বাঁকুড়া
১০। পশ্চিম রাঢ় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, বাঁকুড়া
১১। এগ্রিকালচার স্ট্যাটিসটিকস্ বাই প্লট টু প্লট এ্যনুমারেশন ইন বেঙ্গল, এইচ.এস.এম. ইসাক, আই.সি.এস
১২। বাংলার শ্রম প্রতিবেদন — বি. ফোলি
১৩। রেড ল্যাটেরাইট জোন ঃ প.ব. — বি. সি. কে. ভি
১৪। পশ্চিমবঙ্গ ঃ বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা
১৫। সেনসাস প্রতিবেদন ঃ ২০০১

বাঁকুড়ার লোকসংস্কৃতি পরিচয় ঃ বাঁকুড়া-১

[লৌকিক দেবদেবী / লোকগান / মেলাপার্বণ / আদিবাসী সংস্কৃতি]

ধীরেন্দ্রনাথ কর

ভূমিকা

জেলা বাঁকুড়া সমগ্র রাঢ়ভূমির মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত। বাঁকুড়াকে তাই রাঢ়ের মধ্যমণি বলা হয়। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় অঞ্চল সমীকরণের ফলে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে অঞ্চল, কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে ব্লক তৈরি হয়েছে। জেলার মধ্যে বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লক আবার জেলার মধ্যমণিও বটে। বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকে ছয়টি অঞ্চল — ১) কেঞ্জাকুড়া ২) আঁচুড়ি ৩) কালপাথর ৪) আঁধারথোল ৫) জগদল্লা (এক) ৬) জগদল্লা (দুই)। রাঢ়ের এই অঞ্চলের ভূমি শুষ্ক, রুক্ষ ও অসমতল, ডাঙ-ডহর সমাকীর্ণ।ব্লকের মধ্যভাগে প্রবাহিত দ্বারকেশ্বর নদের দুপাশে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে ছিল জঙ্গল। জঙ্গলে ছিল শাল, পলাশ, কেন্দ, হরিতকী, মহুয়া ও নানাশ্রেণীর গাছ, লতা ও গুল্ম। জঙ্গলের মধ্যে বাস করত নানা বন্য জন্তু যেমন - নেকড়ে, হায়না, ভালুক, শিয়াল, গোধিকা, খরগোস, হাড়াঞ্জা। এখন জঙ্গল নিঃশেষিত, জীবজন্তুরাও উধাও। নানা প্রজাতির পাখির সংখ্যাও কমতির দিকে। খরা ও অনাবৃষ্টির বছরে মাঠের ধান শুকিয়ে বাবুই হয়। সুবৃষ্টি হলে চাষ আবাদ ভালো হয়। সেচ ব্যবস্থা অপ্রতুল। ছোট ছোট গ্রাম। এইসব গ্রামে বাস করে বর্ণহিন্দু ও নবশাখ সম্প্রদায় চাড়া সাঁওতাল, বাউরি, মাল, কোড়া, ডোম, বাগ্দি, লোহার, ম্যেটা প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নশ্রেণী। এরাই লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সংসারে অভাব অনটন অন্ত্যজশ্রেণীর বারোমেসে সঙ্গী। তবে হালে সামন্ততান্ত্রিক শোষন ও পোষন থেকে অনেকটাই মুক্ত। এই অঞ্চলে অদ্যবধি কোন বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠেনি। কুটির শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষিকর্মে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়।

আদিকাল থেকে অঞ্চলের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে নানা উপাদান নিয়ে। মানুষের জীবনে দৈনন্দিন কর্মধারা, ধর্মাচরণ, নৃত্যগীত, ক্রীড়া, উৎসব, খাদ্যদ্রব্য, পোষাক পরিচ্ছদ, চিত্রকলা, চিকিৎসা মন্ত্রতন্ত্র - এসবই সংস্কৃতির সামগ্রিক উপাদান। নিম্নবর্গীয় শ্রেণি নির্বিশেষে জনসাধারণের সংস্কৃতিই লোকসংস্কৃতি। পুরাতত্ত্ববিদ চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত ''রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি'' প্রবন্ধ-এ লিখেছেন - ''লোকসংস্কৃতি বলতে অনগ্রসর আদিমগন্ধী, মূলতঃ গ্রামকেন্দ্রিক মনন প্রসাধনহীন এক সংস্কৃতিকে বোঝায়, যার গোত্র-প্রবর মার্গ সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কৌলিন্য প্রধান ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যেমন ইতরজনা থেকে পৃথক। মানুষ সমাজে সামাজিক শ্রেণিবিভাগ করেছে। এই শ্রেণি বিভক্ত সমাজেরই সর্বনিম্নস্তরের আপামর জনসাধারণের প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি মোটামুটি লোকসংস্কৃতি।''

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় — লোকসংস্কৃতির উপাদান — লোকিক দেবদেবী, মেলাপার্বন, লোকগান ও আদিবাসী সংস্কৃতি।

লৌকিক দেবদেবী ঃ- অখণ্ড বিশ্বাসবোধ, বিস্ময় ও ভয় থেকেই অদৃশ্য দৈবশক্তির বদ্ধ ধারণা মানুষের মনে জন্ম নিয়েছিল সেই কোন আদিম যুগে। প্রাকৃতিক শক্তি যেমন ঝড়ঝঞ্ঝা, অনাবৃষ্টি, বজ্রপাত, ভূমিকম্প, চন্দ্রসূর্যের উদয় অস্ত, মহামারী, নানা অসুখ প্রভৃতি সম্পর্কে বিশুদ্ধ যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানের অভাব থাকায় মানুষের মননে ভয়-ভক্তি ও বিস্ময় যোগে দেবতার সৃষ্টি হয়। দেবতাগণ অলৌকিক দৈবীশক্তির আধার, মঙ্গল-অমঙ্গলের নিয়ন্তা — এই বোধ

থেকেই তাঁদের পূজা আরাধনা শুরু হয়। দেবতাদের বিভিন্ন রূপ দিয়েছে মানুষ নিজের কল্পনা অনুযায়ী। পশুপক্ষী, বৃক্ষ, প্রস্তরের পূজা (Totem) শুরু হয় সেই আদিম যুগে। সর্ববিধ প্রাকৃতিক ও জাগতিক সংকট থেকে মুক্ত নিরুপদ্রব জীবনযাপনের জন্য দেবতার মন্দিরে বা থানে বলিদান করা হত, এখনও করা হয়।

মানুষের মনে ছিল ভয়ের এক বিশাল বৃত্ত। এখনও সে বৃত্তের বিলোপ ঘটেনি। দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার করত পুরোহিত সেবাইত ও কৌশলী দেয়াশীরা। ঝাঁড়ফুক, স্বপ্নাদ্য, কবচ, মাদুলি, অষুধ, ভুত ছাড়ানো, হলুদপোড়া, বাটিচালা, তেলপোড়া প্রভৃতি তাকতুকে অন্ধ বিশ্বাস ছিল মানুষের। দেবতার কাছে নানাবিধ কামনার মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে আত্মরক্ষার বিষয়, তারপর বংশরক্ষা, বংশবৃদ্ধি, সন্তানসন্ততির ইষ্ট, শস্যবৃদ্ধি, রোগমুক্ত জীবন ও ধনদৌলত প্রার্থনা — এসবই ছিল দেবতার কাছে প্রার্থিত বিষয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের স্বরূপ ও কারণ উপলব্ধি করার মত ক্ষমতা মানুষের ছিল না। তাই আদিম যুগে বৃক্ষ, প্রস্তর, মৃত্তিকা, পশুপক্ষী দেবতার বাহন ও প্রাকৃতিক শক্তিগুলি দেবতারূপে পূজ্য হয়ে উঠে। এদের এক বৃহদাংশ লৌকিক দেবতা। লৌকিক দেবতাগণ পৌরাণিক দেবদেবীগণের চেয়ে প্রাচীনতর। লৌকিক দেবতার পূজায় না ছিল জটিল মন্ত্রতন্ত্র হোম যজ্ঞাদি ক্রিয়াপ্রকরণ। পূজার উপকরণ যৎসামান্য বাহুল্যবর্জিত — দুগ্ধ, ফুলফল, মাংস, মদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যাদি। গাছের তলায়, মাঠে ঘাটে ঘটপূজা হলে বুঝতে হবে তা দেবীর থান কারণ ঘট যোনীর প্রতীক। প্রস্তরখণ্ড পূজা হলে বুঝতে হবে পুরুষ দেবতার থান - পাথর লিঙ্গের প্রতীক। পৌরাণিক দেবতা ও লৌকিক দেবতার মধ্যে পার্থক্য কোন কোন ক্ষেত্রে অনেকটাই ঘুচে যায়। কালক্রমে কিছু কিছু লৌকিক দেবতা পৌরাণিক দেবতার সমগোত্রীয় হয়ে উঠেন। ব্রাহ্মণ পূজারীরা মন্ত্রোচারণ দ্বারা লৌকিক দেবতাদের পূজা শুরু করে দেন। অনেক জায়গায় লৌকিক দেবতারা এখনও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছেন। বিশেষ করে নিম্নবর্গীয়দের পূজ্য লৌকিক দেবতাদের অধিকাংশ এখনও বৃক্ষতলে ও উন্মুক্ত মাঠে বা প্রান্তরে অবস্থান করছেন। এদের নিয়েই গড়ে উঠেছে লোকসংস্কৃতির বিশেষ এক ধারা। লোক বলতে অতি সাধারণ লোক — খেটে-খাওয়া কৃষি ও কুটিরশিল্পীজীবী। এদের সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর শ্রেণীর চিকনচাকন সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

কেঞ্জাকুড়া অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবী

লৌকিক দেবতাদের শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্যণীয়। যথা গ্রামদেবতা বা গেরাম দেবতা ও আঞ্চলিক দেবতা। গ্রাম দেবতা সেই গ্রামের একমাত্র রক্ষক ও মঙ্গলদাতা। মড়ক, অনাবৃষ্টিরোধে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় গ্রামদেবতার বিশেষ ভূমিকা থাকে। গ্রামের মানুষ গ্রামদেবতার কাছে ঐহিক সুখশান্তি, সন্তান কামনা করে, কামনা সিদ্ধ হলে মানত শোধ করে। গ্রাম্য দেবতার অধিষ্ঠান গাছতলায়, কোথাও কোথাও উচ্চ বাধানো বেদির উপর তার অবস্থান।

কেঞ্জাকুড়া অঞ্চলের প্রধান গ্রাম কেঞ্জাকুড়া। এক নম্বর ব্লকের মধ্যে বৃহৎ গ্রাম। কেঞ্জাকুড়া বর্ত্তমানে প্রায় আধা শহর — শহরায়নের ছোঁয়া সর্বত্র। তবু লৌকিক দেবতারা সগৌরবে বিরাজমান।

কেঞ্জাকুড়ার ধগড়্যাপাড়ায় বুড়ির পুকুরের দক্ষিণে বিশাল এক বটবৃক্ষের তলায় কেন্দসিনি বা কেন্দসাইমার অবস্থান। মনে হয় বহু আগে কেন্দ গাছের তলায় দেবীর থান ছিল। কেউ বলেন কেন্দবাসিনী। যাইহোক এ দেবীর পূজায় চণ্ডীর মন্ত্রে পায়েস ও খিচুড়ির ভোগ দেওয়া হয়। বছরের যেকোন সময়ে শুভ তিথি ধরে ধগড়্যাবাসীগণ এই গ্রামদেবীর পূজা দেন। পূজার সময় পোড়ামাটির ছোটবড় ঘোড়া ও হাতি উৎসর্গ করা হয়। একটু দূরে জোড়খালের ধারে বাগালসিনির পূজা করে রাখালেরা। বাগালসিনি গোধনের রক্ষাকর্ত্রী। বাউরীপাড়ায়আছে কাল ভৈরব ও কালোসোনা ভৈরব। 'এখ্যান' দিনে এঁদের পূজা হয়।

কেঞ্জাকুড়ার পশ্চিমে অনতিদূরে দ্বারকেশ্বর নদের তীরে সঞ্জীবনী দেবীর অধিষ্ঠান। এখানে ভৈরব ও হনুমানও আছেন। তাছাড়া বসন্তকালে বাসন্তীপূজা হয়। সঞ্জীবনী শশ্মানকালী বলে অভিহিত হন। তিনি মৃতকে পুনর্জীবন দান করেন তাই সঞ্জীবনী। তাঁকে সঞ্জুড়ীও বলা হয়। সঞ্জীবনী বুড়ি থেকেই সঞ্জুড়ী। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তিতে সঞ্জুড়ীর মেলা বসে ও যথারীতি দেবীর পূজা হয়। নদীগর্ভে কয়েকটি বড় বড় পাথরের স্তুপ আছে। স্তুপের কোলে দহ। প্রতি

বছরই বর্ষার বানে দহ তৈরি হয়। এই দহের পাশেই সঞ্জীবনী দেবীর মৃন্ময় মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেবীর গাত্রবর্ণ ঘননীল, কেশ আলুলায়িত রক্তবর্ণের বস্ত্রপরিহিতা প্রায় ভৈরবী মূর্তি। মন্ত্রও পূজা পদ্ধতি চণ্ডীর। স্থানীয় চট্টোপাধ্যায় বংশীয় পুরোহিতগণ দেবীর পূজা করেন। কালের বিবর্তনে অনেক বৌদ্ধ ও জৈন তান্ত্রিক দেবদেবী লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীতে পরিণত হয়েছেন আবার লৌকিক দেবদেবীরাও অনেকক্ষেত্রে প্রমোশন পেয়ে পৌরাণিক দেবদেবীতে পরিণত হয়েছেন। সঞ্জীবনী জৈন অথবা বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী হতে পারেন। মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করলে নদীতীরে প্রস্তরমূর্তি বা অন্য প্রত্নদ্রব্য মিলতে পারে। একদা দ্বারকেশ্বরের বিস্তৃত উভয় তীরে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটেছিল। নদের তীরে সঞ্জীবনী আশ্রমে পৌষসংক্রান্তিতে হরিনাম সংকীর্তন হয়। পাশেই বৃহৎ শিবমন্দির নির্মীয়মান। বাসন্তীমেলা সন্নিকটে সংলগ্ন মন্দিরে মা কালীর অধিষ্ঠান। তাই এই তীর্থভূমি শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবের সমন্বয় ক্ষেত্র। এখ্যানের পরদিন নরনারায়ণ সেবা দেখার মত।

রাধাকান্তপুর ঃ- রাধাকান্তপুর মৌজার গ্রামদেবী বটতলায় অবস্থিত। তাই এঁকে মানুষ মানত করে পূজা দেয়। অনতিদূরে কামারপুকুরের পাড়ে আগে রাখাল গাজন হত জৈষ্ঠ মাসে, এখানে বাগালসিনিল অধিষ্ঠান ছিল বেলগাছের তলায়। একাড়্যা পুকুরের পাড়ে রয়েছেন বাঘারায়, বাঘের দেবতা। বনগ্রামে সন্ন্যাসীতলায় মকরদিনে সন্ন্যাসী পূজা হয়। নুতনপুকুরের পাশে ঝোপের মধ্যে আছেন সারসাসিনি। মাটির হাতিঘোড়া দিয়ে দেবতার পূজা হয়। চাষীরা এক আঁটি করে ধানসহ খড় খাে দেয়। দেবী শস্য প্রদায়িনী ও শষ্যের রক্ষক। নিকটবর্তী বেহারাডি মৌজায় আছেন কুদরাসিনি, পৌষমাসে এঁর পূজা হয়।

ম্যেটাকুল্যা ঃ- ম্যেটাকুল্যা কেঞ্জাকুড়ার সন্নিহিত এক ছোট গ্রাম। এই গ্রামেই স্বরূপনারায়ণের থান। স্থানীয় পণ্ডিতগণ স্বরূপ নারায়ণের পূজা করেন, এরা এই থানে হাঁপানির দৈব ওষুধ দেন। বহু দূরদূরান্তর থেকে হাঁপানি রোগীরা আসেন এবং ওষুধ (Folk Medicine) খান। পণ্ডিতদের 'পড়িত' বলে। এরা আহিরী গোপ। এঁদের পূর্বে নিবাস ছিল মহাভারতের বিরাট রাজ্যে। রাজার গোধনের পরিচর্যা করতেন এঁরা। পণ্ডিতরা ভগবতী পূজা করেন। ভগবতী মঙ্গল গেয়ে এরা গৃহস্থের গরু-বাছুরের মঙ্গল কামনা করেন। এই গ্রামেই মাঠের মধ্যে গাছতলায় আছেন ভৈরব। বিশেষ তিথিতে এঁর পূজা হয়। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে, অধিকাংশ গ্রামেই ভৈরবথান ও সন্ন্যাসীর থান দেখা যায়। পারিবারিক সন্ন্যাসীর থানও সংখ্যায় কম নয়।

মোলবনা ঃ- মোলবনা কেঞ্জাকুড়ার পাশে এক ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম। কৃষিই এখানকার মানুষের মুখ্য জীবিকা। জেলার মধ্যে মোলবনা এক প্রাচীন প্রত্নসম্পদে পরিপূর্ণ গ্রাম। জেলার ম্যাপে বিশেষ প্রত্নস্থল হিসাবে গ্রামটিকে চিহ্নিত করলে ইতিহাসকে সঠিক মর্যাদা দেওয়া হত। এককালে মোলবনায় জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠা হয় এবং তার প্রমাণ স্বরূপ গ্রামে মৌলেশ্বর মন্দিরের পাশে কয়েকটি জৈনমূর্ত্তি সংরক্ষিত রয়েছে। ইতিপূর্বে অনেক প্রত্নদ্রব্য অপহৃত হয়েছে অথবা সংস্কৃতি সওদাগরেরা ''ফেরত দেবো'' বলে নিয়ে গেছেন, তারা আর এমুখো হননি। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একবার ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে এখানে এসেছিলেন।

মোলবনা গ্রাম ও তার চারপাশে দ্বারকেশ্বর নদের তীরভূমিতে সর্বসমেত ৬৫টি গ্রামদেবতা, আঞ্চলিক লৌকিক ও পৌরাণিক দেবতার থান ও মন্দির বিদ্যমান। এতগুলি দেবতার এই পরিমণ্ডলে সন্নিবেশ বিস্ময়কর। সম্প্রতি তরুন গবেষক মেঘদূত ভুঁই অক্লান্ত পরিশ্রম করে ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ ''রাঢ়ের আলোয় মোলবনা'' গ্রন্থটি প্রনয়ণ করেছে। তার উদ্যম প্রশংসনীয়।

পুলকেশিনী (পুলগিসিনী) ঃ- মৌলেশ্বর শিবের দেবডাক ও দিকডাক পুঁথিতে পুলকেশিনী নাম আছে। "শ্রীশ্রী পুলকেশিনীর অন্তঃসার হইল দিয়া জয়''। পুরকেশিনী অর্থাৎ দীর্ঘকেশী ফুল্লময়ী দেবী। ইনি দেবী দুর্গার পূজামন্ত্রে পূজিতা হন। দেবীর থান দ্বারকেশ্বরের উত্তর তীরে। পোড়ামাটির হাতিঘোড়া দেবীর প্রতীকচিহ্ন রূপে পূজিতা হচ্ছেন। গ্রামের মানলগন এখ্যান দিনে দেবীকে আতপ চাল, ঘি, মধু, চিনির ভোগ নিবেদন করে। আগে পশুবলি হত, এখন হয় না। সামনেই দ্বারকেশ্বরের বিশাল দহের নাম ''পুলকীর দ''।

কালুবীর ঃ- গ্রামের সাঁতরাপুকুরের পাড়ে থাকেন কালুবীর। কালুবীর কুমীরের দেবতা। বাঁকুড়া জেলার নদনদী ও জলাশয়ে কুমীর থাকেনা। দ্বারকেশ্বরেও কখনও কুমীরের দেখা মেলে না। না মিলুক, কুমীর ভয়ঙ্কর প্রাণী। তাকে সন্তুষ্ট রাখাই উচিত বলে মনে করত মানুষ। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' ৪র্থ খণ্ডে বিনয় ঘোষ লিখেছেন — "জীবজন্তুর মধ্যে যারা ভীতিপ্রদ তারা সাধারণত মানুষের কাছে দেবতারূপে পূজিত হয়ে থাকে। বস্তুতঃ ভয়, প্রেমভক্তির দেবতাদের পৃথকভাবে শ্রেণীবদ্ধ করলে দেখা যাবে যে ভয়ের শ্রেণীতে দেবতাদের সংখ্যা অনেক বেশি। বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়, সাপের দেবতা মনসা, কুমীরের দেবতা কালুরায়।" মোলবনায় একটি কালো পাথরই কালুরায়ের প্রতীক। চিনি, চিড়া, দুধকলা, বেলপাতা দিয়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদিত হয়।

মাদনা বা মহাদানা ঃ- মহাদানা থেকে মাদনা। এ অঞ্চলে অনেক গ্রামে মাদনার থান রয়েছে। মাদনাবুড়ি বৃক্ষতলবাসিনী লৌকিক দেবী। আগে এ-অঞ্চলের বনে বাঘ থাকত। হিংস্র বাঘেদের সন্তুষ্ট করার জন্য মাদনাবুড়ির পূজা শুরু হয় মাদনা এ অঞ্চলে সুন্দরবনের বনবিবির মত। ছোট জালি কেটে পাঁচটি মাটির ঢেলা দিয়ে উনান তৈরি করে তাতে খিচুড়ি রান্না করে ভোগ উৎসর্গ করা হয়। এই দেবীর থান গ্রামের পূর্বে ভন্দরবান্দীর উত্তরে। আর একটি থান চরকাডাঙায়। হেমন্তে ধান কাটার সময় এলাকার চাষীরা এক আঁটি করে ধান দেবীর থানে জমা দেয়। দেবীর অবস্থিতি ঝোপের মধ্যে। মাটির হাতিঘোড়া দিয়ে দেবীর পূজা হয়। অন্য কোন প্রতীক নেই।

কাটজুড়্যাসিনি ঃ- কাটাকুটি ও ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়ার দেবতা। ভোলামৌজার এক দান ঝোপের মধ্যে এই লৌকিক দেবতার স্থান। স্থানীয় শিকারীদের দ্বারা দেবী পূজিতা হতেন। প্রতিবছর এখ্যানদিনে ঘি, মধু, খিচুড়ি, চাঁদমালা দিয়ে এঁর পূজা হত। এখন আর হয় না।

ভোলাসিনি ও বাগালসিনি ঃ- উভয়েই অনার্যদের অরণ্যদেবতা। মনে হয় বাগালসিনি রাখালদের দেবতা। গোরুর পালকে হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা করতেন এই দেবতা। কেউ বলেন ইনি বাঘের দেবতা। কালো কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরখণ্ড দেবতার প্রতীক। মাঠের ঝোপে এর অবস্থান। ভোলাসিনির থান কাদাকুলি মৌজায়। ধানকাটার সময় মালগোষ্ঠী এঁর পূজা করে পায়েস চিড়া ও গুড় দিয়ে। ভোলাসিনি শস্যের দেবতা বলে কথিত আছে।

ধনযখ থান ঃ- কথায় বলে যখের ধন। যখ বা যক্ষ গুপ্তস্থানে রক্ষিত ধনের পাহারাদার। এখানের ধনযখ খুব প্রাচীন নন। সামন্তভূমরাজ শঙ্খ রায়ের মৃত্যুর পর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা হলে রাণী বিরজা রাজকোষের কিছু ধনরত্ন নিয়ে এই গ্রামের এক জায়গায় পুঁতে রাখেন। ভবানী ঝরাইতের সময় থেকে এই স্থানটিতে ধনযখের পূজা শুরু হয়। পরে কুঁচিলা গাছের তলায় যখের দেবতা সন্ন্যাসী ঠাকুর হিসাবে পূজিত হচ্ছেন।

বিরজাবুড়ি ঃ- ছাত্‌নার রাণী বিরজার সমাধিস্থানে প্রতিবছর ছড়রা গাছের তলায় হাতি ঘোড়া দিয়ে গ্রামের কবিরাজ ও ভুঁইরা ধান রুয়া ও ধান কাটার সময় বিরজাকে দেবী জ্ঞানে পূজা করে। পরে ইনি বিরজাবুড়ি নামে লৌকিক দেবী রূপে গণ্য হন।

বাঘরায় ঃ- বাঘের দেবতা। এই দেবতার থান মোলবনার পূর্বদিকের মাঠে, একটা রিঠা গাছের নীচে। থানের জায়গার পরিমাণ ৩ গণ্ডা।

খাঁদারাণী ঃ- গ্রামের উত্তর প্রান্তে এক চত্বরে ছিল জৈনদেবী খাঁদারাণীর মন্দির। এই ছোট মন্দির বহুকাল আগে ধ্বংস হয়ে গেছে। মন্দিরের প্রস্তরখণ্ড ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। পাঁচ ফুট উচ্চ পাথরের শ্ল্যাবে খোদিত ছিল খাঁদারাণীর মূর্তি। শিলাখণ্ডটি আজ আর অখণ্ড নেই। কালের প্রকোপে মূর্তির মধ্যাংশ অবক্ষয়িত। একটি খণ্ড ও আরও দু'চারটি পাথরের মূর্তি সংস্কৃতি সওদাগরেরা 'ফেরত দেবো' বলে নিয়ে গেছেন। তারা আর এ-মুখো হননি। অপর খণ্ডটি শিবমন্দিরের সামনে বিরাজমান। এই দেবীর পূজারী ছিলেন মুর্মু গোত্রের সাঁওতাল। এক্তেশ্বরে খাঁদারাণীর মূর্তি আছে।

ভৈরব ঃ- রাঢ় অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি ছোটবড় গ্রামে ভৈরবের থান রয়েছে অনেক লৌকিক দেবতার অধিস্থান ক্ষেত্রের পাশেই ভৈরবথান দেখা যায়। ভৈরবের সংখ্যা আট। উগ্রতেজা ভৈরবদের শিবজ্ঞানে পূজা করা হয়। মোলবনা গ্রামের মধ্যেই ভৈরবের অবস্থান।

কাঁটমণি ঃ- ধলডাঙ্গা গ্রামের শিলামূর্ত্তিরূপে জাগ্রতা দেবী। একে কাঁটাঝোপে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। ফলমূলসহ নিত্যপূজা হয়। কার্ত্তিকমাসে বড় পূজা হয়।

কালোসোনা ঃ- বড়চিংড়া গ্রামে ভাদ্রসংক্রান্তিতে ফলমূল দিয়ে নৈবদ্য দেওয়া হয় এই দেবীকে। মানুষ মানত করেও মাটির হাতিঘোড়া উৎসর্গ করে।

বেলিয়াসিনি ঃ- ২০০ বছর আগে খননকার্যে জাগ্রতা এই দেবী আবিষ্কৃত হয়। দুর্গামন্ত্রে পূজিতা। অনেকের মতে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এই দেবী ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করেন। রাসপূর্ণিমাতে কীর্তন ও পূজাপার্বণ হয়।

মনসা ঃ- মনসাকে অনেক লৌকিক দেবী বলতে কুণ্ঠিত হবেন। মনসা অনার্যদেব পূজিতা দেবী। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে পদ্মাপুরাণে মনসার উপাখ্যান আছে। তাই তিনি পৌরাণিক দেবী। রাঢ় অঞ্চলে পূজার প্রকৃতি দেখে অনেকে মনসাকে লৌকিক দেবী হিসাবে মান্য করেন। নাগদেবী মনসা নাগরাজ বাসুকীর ভগিনী। অপর নাম জরৎকারু। জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহ হয়। আস্তিক তাঁদের পুত্র। পূর্বে মর্তলোকে মনসার তেমন প্রতিষ্ঠা ছিল না। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মনসার নানা ক্রিয়াকলাপ মনসামঙ্গলে বর্ণিত হয়েছে। চাঁদসওদাগর, বেহুলা, লখীন্দর-এর উপাখ্যান মনসামঙ্গলের অন্যতম বিষয়। সর্পদংশনে মৃত্যুভয় থেকে সাপের দেবীর কল্পনা এবং তাঁর পূজা উপসনা। রাঢ়বঙ্গে প্রায় প্রতি গ্রামেই মনসামেলা ও মনসার চালি দেখা যায়। তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ মনসাপূজা করে, বর্ণহিন্দুরাও এঁর পূজায় অংশগ্রহণ করে। দশহরার পর থেকে মনসাপূজা শুরু হয়। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত মনসাপূজা বিশেষ আকর্ষণীয়; কারণ চাষের সময় কর্ষণজীবি মানুষ সারাদিন কাজ করে প্রতি শ্রাবণ সন্ধ্যায় দরদ দিয়ে মনসামেলায় মনসামঙ্গল গায়। এ সময় ক্ষেতে-ব্যাদে সাপের উপদ্রব। চাষ শেষ হয় শ্রাবণ সংক্রান্তিতে। ধুমধাম সহকারে পূজা ও ঝাঁপান খেলা দেখার মত। দেয়াশীরা অর্থাৎ দেঘুরিয়ারা মন্ত্র জানে না, তারা নিজেদের ভাষায় মনসাকে স্তবস্তুতি করে, ফলফুল মিষ্টান্ন নিবেদন করে, বলি দেয়। ক্রমে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ পূজায় অংশগ্রহণ করতে থাকে।

মোলবনায় অনেকগুলি মনসামেলা আছে। এদের মধ্যে ওস্তাদ, সাঁতরা ও ঘুনিয়াদের পূজা প্রধান। বাউরি, মাল ও লোহারদের মনসাপূজাও উল্লেখযোগ্য।

চণ্ডী ঃ- চণ্ডীদেবী পৌরাণিক দেবী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীর কথা বর্ণিত হয়েছে। মোলবনায় ওস্তাদ ও ঘুনিয়াদরে চণ্ডীদেবীর কোন মন্দির বা বিগ্রহ নেই। তাই ইনি লৌকিক দেবীরূপে পূজিতা হন। নিম গাছের তলায় কেলেকড়ার ঝোপে দেবীর থান। দীর্ঘকাল সিন্দুর ও চন্দন লেপনে ও উন্মুক্ত পরিবেশে থাকার ফলে দেবীর প্রতীক প্রস্তরখণ্ড দান কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। চণ্ডীর পূজা করে ওস্তাদেরা ঝাঁড়ফুক করে, জলপড়া দেয়।

এসব ছাড়া গ্রামে পৌরাণিক দেবদেবী যথাক্রমে শিব, বিষ্ণু, বিশ্বকর্মা, যমরাজ, নীলাম্বর, কার্তিক, কালী, দুর্গার পূজা হয়। রাসের সময় আগে অস্থায়ী রাসমঞ্চে রাসোৎসব হত। গ্রামের প্রধান দেবতা হলেন মৌলেশ্বর শিব। তাঁর মন্দিরও বিশাল। মৌলেশ্বরের গাজন জেলার অন্যতম গাজনোৎসব। মৌলেশ্বরের মোলবনা এক মহিমান্বিত শিবতীর্থ। এঁর মাহাত্ম্য স্মরণাতীত কাল থেকে প্রচারিত।

বাসলী বা বাশুলী ঃ- ছাত্‌নার সামন্ত রাজাদের কুলদেবী বাসুলী বা বিশালাক্ষী। সামন্তভূমের অনেক গ্রামে গ্রাম্য দেবী বাসুলী। অনেক গ্রাম বাসুলী তড়া, বাসুলীডাঙা ও বাসুলীতল নামে পরিচিত। গ্রামের প্রান্তে অশ্বত্থ অথবা বটতলায় দেবীর অধিষ্ঠান। গাছের তলায় মাটির হাতিঘোড়া দৃষ্ট হয়। অগ্রহায়ণ, পৌষমাসে কোন কোন গ্রামে এই গ্রাম দেবতার নিকট "বাতাল" দেওয়াহয়। ঠাকুরের স্থানে ভোগ তৈয়ার হয় ও ঠাকুরের পূজা দেওয়া হয়। (বাঁকুড়া জেলার বিবরণ - রামানুজ কর)। দ্বারকেশ্বরের ওপারে বেলিয়া গ্রামে বাসুলীতড়া গ্রামে বাসুলীর পূজা ও গাজন হয়। ছাত্‌নায় রাজাদের বাসুলী মন্দির আছে। নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। বাসুলীর থানে গাজন মেলা বসে।

কুদরাসিনি ঃ- জেলার বহু গ্রামে এই দেবতার থান আছে। পাপুরডিহিতে কুদরাসিনি থান ছাড়াও ষষ্ঠী ঠাকুর এর থান আছে। কুদরাসিনির থানে হাতিঘোড়া দিয়ে পূজা করা হয়। ধলডাঙা মৌজায় কুদ্রাসিনী (দানাসুন্দরীর) পূজা হয় খিচুড়ি দিয়ে, পৌষ মাসে, নতুন শষ্যের আশায়।

কুলবনা গ্রামের গ্রাম দেবতা রাধামাধব। দেবীপুরে বাসুলী গ্রামদেবী। গোঁসাইডিহি গ্রামের দেবী শাকাইসিনি গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে এক গাছের তলায় থাকেন।

পাঁচামীসিনি ঃ- জগদল্লায় মাঠের মাঝে জোড়ের ধারে পাঁচামীসিনির পূজা হয়, পৌষ মাসে, নতুন ধানের আশায়।

লৌকিক দেবদেবী

নতুনগ্রামের পীরথানে মানুষ মানত দেয়। এখনও বিশ্বাস যে গ্রামে কোন অনিষ্ঠ হলে সন্দেহভাজন ব্যক্তির নামে মানত বাঁধলে, সত্যিকার দুষ্ট হলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

বরুটগ্রামের গ্রামদেবী হলেন জেঠাইসিনি। নিমগাছের তলায় থাকেন। বেদীর উপর সজ্জিত মাটির হাতিঘোড়া দেবীর প্রতীক। ব্রাহ্মণ পুরোহিত পূজা করেন।

তুলসীগ্রাম ঃ- সাঁওতালদের গ্রাম। মনোরম পরিবেশ। গ্রামদেবতার নাম নাগরদোলা। সাঁওতাল গ্রামে এই নামে দেবতার নাম কেন বুঝে উঠতে পারিনি। আর এক দেবী আছেন, নাম চাতরা। দেঘুরিয়া পূজা করে। দেবীর থানে পাঁটাবলি হয়।

উপরশোলের গ্রামদেবী ঢ্যাঙাকালী। মাটির হাতিঘোড়া দিয়ে পূজা হয়। বাদুল্লাড়া মুসলিম প্রধান গ্রাম। এখানে গ্রামের প্রান্তে আশরাফবাবার দরগা ও মাজার। এখানের পরিবেশ নির্জন ও শান্ত। কাশ্মীর আগত আশরাফবাবা সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। এবং এখানেই তাঁর সমাধি হয়। ৮ই চৈত্র এখানে উৎসব হয়। বাদুল্লাড়ার পাশেই বল্লারডি মৌজা; এখানে রয়েছেন বল্লাডি ঠাকুর। বাদুল্লাড়ার মোল্লারা এই ঠাকুর পূজার তত্বাবধায়ক ও পৃষ্ঠপোষক। এটি হিন্দুমুসলিম সম্প্রীতির এক আদর্শ উদাহরণ।

সানাবাঁধ (পশ্চিম)-এর গ্রামদেবী বটতলার ষষ্ঠীঠাকুরন। মাঠে বহেড়া তলায় আছেন সন্ন্যাসী ঠাকুর।

জ্যোমরাডিহি ঃ- সামন্তক্ষত্রিয়ের বাস। শিবঠাকুর গ্রাম দেবতা। বৈশাখ মাসের শিবের গাজনে বিপুল জনসমাগম হয়।

আঁচুড়ি গ্রামের গ্রামদেবী হলেন ডাকাইসিনি তাছাড়া মহাদান বা মাদানার পূজাও হয়। ঘট, হাতিঘোড়া, চিঁড়াগুড় ফলমূল নৈবেদ্য দিয়ে পূজা হয়। তাছাড়া কালী, দুর্গা, সরস্বতী পূজা যথাবিধি হয়ে থাকে।

কেঞ্জাকুড়া অঞ্চলের পছিরডাঙা গ্রামে বৃন্দাদেবী হলেন গ্রামদেবী। বৃক্ষতলে তার অবস্থান। মাটির হাতিঘোড়া দিয়ে তাঁর পূজা হয়। পায়েস ও খিঁচুড়ির ভোগ হয়। এছাড়া এখানে আছেন সন্ন্যাসীর থান। সত্যপীর তলায় হিন্দু ও মুসলমান মানত করে, সিন্নি দেয়। মাঠে আছেন মাদানা ঠাকুর। গোপালপুর গ্রামে ভৈরবথান ও সন্ন্যাসীর থান আছে। গ্রামদেবীও আছেন নাম বৃন্দাদেবী।

ঘাটতোড় গ্রামে এক বটগাছের তলায় গ্রামদেবতা মাদরার অধিষ্ঠান। এখানে একটি কোয়ার্টাজ পাথরের ভগ্ন মস্তক আছে, মনে হয় কোন দেবীমূর্তির।

কালপাথরে ভৈরব আছেন। কালাবতীর কালীপূজা এ অঞ্চলের বিখ্যাত পূজা, পুরুণ্ডিতে ভৈরব পূজিত হয়।

মেলা-পার্বন

গ্রামীন জনজীবনে সংস্কৃতি সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে গ্রামীণ মেলা, গাজন, পরব, হাট প্রভৃতির গুরুত্ব আজও অপরিসীম। বর্তমানে যন্ত্রসভ্যতার যুগে ভোগবাদী সমাজব্যবস্থায় নিত্যনূতন ভোগোপকরণ সংযোজনের ফলে মানুষের সাংস্কৃতিক রুচি পরিবর্তিত হওয়ায় মেলা বা গাজনের মৌল চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের রূপান্তর ঘটেছে। পূর্বে গ্রামাঞ্চলে পুরোপুরি কৃষি নির্ভর বাঙালী জীবনে জীবিকার জন্য ছোটাছুটি কম ছিল নিজ নিজ বৃত্তির বৃত্তে প্রায় সকলেই কমবেশি সন্তুষ্ট ছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গাজন বা মেলা ছাড়াও বৎসরের বিভিন্ন সময়ে গ্রামাঞ্চলের মানুষ নিছক মনোরঞ্জনের জন্য মেলা বা পরবের উদ্যোগ গ্রহণ করত। এমনিতেই বাঙালীর সমাজ জীবনে বারোমাসে তেরো পরব

তো আছেই — তার উপর এইসব গাজন মেলার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবর্তন গ্রাম্য জীবনে মানসিক জড়তার মুক্তি ঘটাত। কতকগুলি গাজন মেলার পটভূমিকায় ধর্মীয় প্রতীক না থাকায় সেগুলির অধিকাংশের অবলুপ্তি ঘটেছে, কয়েকটি কোনমতে টিকে আছে। উদাহরণ স্বরূপ কেঞ্জাকুড়ার পাশাপাশি কয়েকটি গাজন মেলার উল্লেখ করা যায়। যেমন হুজুগ গাজন, রাখাল গাজন, মাঝির গাজন — এগুলির বিলুপ্তি ঘটেছে। হুজুগের বশে গাজন হয় বলে হুজুগ বা হুচুক গাজন বলে। মৌলেশ্বরের গাজনের পরেই কেঞ্জাকুড়ার 'বাসীহাট' পাঁচ দশ বছরের মধ্যে উঠে যাবে বলে মনে হয়। বাসীহাট আদিবাসীদের উপস্থিতিতে সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। তাদের বাঁশীর সুমধুর সুরে হাট হয়ে উঠত মুখরিত। অনেকে এইজন্য এই হাটকে বাঁশী হাটও বলে। হালে এই হাটে আদিবাসীদের সমাগম হয় না। সম্প্রতি প্রশাসনিক উদ্যোগে কয়েকটি সাংস্কৃতিক মেলার প্রবর্তন হয়েছে।

রামানুজকরের "বাঁকুড়া জেলার বিবরণ" ও বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি অকাদেমীর ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত জেলার পরব ও মেলার সংখ্যা ৪০০-এর বেশি। বাঁকুড়া ১ নং ব্লকের অধীন অঞ্চলে অনেকগুলি ছোটবড় মেলা ও গাজন চালু আছে। প্রথমেই নাম করতে হয় মোলবনার মৌলেশ্বর শিবের গাজন। চৈত্রসংক্রান্তিতে এই গাজন অনুষ্ঠিত হয়। অনেকের মতে গর্জন থেকে গাজন শব্দটি এসেছে। শৈব সন্ন্যাসীরা গর্জন ধ্বনি করতেন বলে মেলাকে গাজন বলে। তবে বিনয় ঘোষের অভিমত অন্য। তিনি বলেছেন গাজন অর্থাৎ গ্রামজনের মেলা। মৌলেশ্বরের গাজন সান্তভূমের শ্রেষ্ঠ গাজন। গাজনের পরিসমাপ্তি ঘটে পয়লা বৈশাখ। শেষ দুদিনে মেলাপ্রাঙ্গণে যাত্রাভিনয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এই গাজনে গ্রামে আসে দূরের মানুষ, আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব, উৎসাহ আনন্দে সারা গ্রামে এক মিলন মেলা তৈরি হয়। ভক্ত্যরা শিবের বারব্রত করে, উপবাস করে কৃচ্ছসাধন করে। তীক্ষ্মমুখ লৌহ শলাকা কন্টকিত শালপাটার উপর পাটভক্ত্যার শয়ন অনার্যরীতি বলে মনে হয়। গাজন উপলক্ষ্যে আগুন সন্ন্যাসী, জাঙালভাঙা, কাঁটাদুয়ারী, শ্যামঘুড়া পর্ব, কামল্যা পর্ব এরকম নানা ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। মৌলেশ্বর শিবতীর্থ, এখানের শিবলিঙ্গ স্বয়ম্ভু, এক্তেশ্বরের মতই প্রাচীন।

বাসিহাট বা বাঁশিহাট ঃ- মৌলেশ্বরের গাজন শেষ হলেই কেঞ্জাকুড়ার বাসিহাট। বাসিহাটের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই মেলা বা হাটের ভিত্তিতে কোন ধর্মীয় প্রতীক নেই। জনসাধারণের কেনাকাটার হাট বা মিলন মেলা বলা চলে।

সত্যায়তনের দোলোৎসব ঃ- স্বামী যোগজীবনানন্দ প্রতিষ্ঠিত মনোহরপুর সত্যায়তন মহামন্দিরে প্রতি বৎসর বসন্তকালে ধূমধামের সঙ্গে দোলোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে স্বামীজীর শিষ্যবর্গ আসেন। যাত্রানুষ্ঠান, নাটক, মহিলাসভা, ধর্মালোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই উৎসবের অঙ্গ। আশ্রম মধ্যে শাল গাছের তলায় বাসুলী ও ভৈরবঠাকুরের থান। গ্রামের মানুষ এখানে মানত করে ও পূজা দেয়।

সঞ্জীবনীর মেলার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। দ্বারকেশ্বর নদের তীরে আলিঝাড়া রোডের পাশে সঞ্জীবনী বা সঞ্জুড়ির মেলা প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। মেলা চলে তিনদিন ধরে। প্রচুর জনসমাগম হয়। সকলে নদের দহে মকর স্নান করে।

গাঁঠে ব্যাঁধে মুড়ি
চললো সঞ্জুড়ি,।

ছেলেমেয়ে, বউবিটি, গিন্নিবান্নি সকলেই গাঁটে মুড়ি বেঁধে যায় সঞ্জুড়ি। নদীর বালিতে বসে তেলেভাজা মিঠাই ও মুড়ি খায়। মুড়ির পিকনিক। এই মেলার শেষ দিনে ২৫/২৬টি চুলা জ্বেলে খিচুড়ি ভোগ হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে বহুমানুষ এসে পাতপেড়ে খিঁচুড়ি ভোগ খায়। কেঞ্জাকুড়ার গৌড়ীয় মঠ ধর্মীয় এই মতধারার অন্যতম প্রতিষ্ঠান।

স্বরূপ নারায়ণের মেলা ঃ- মেট্যাকুলার স্বরূপনারায়ণ ঠাকুরের থানে প্রতি বছর মেলা হয়। তবে এ মেলা বর্তমানে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। লোকসমাগম হয় না।

ভোলার মেলা ঃ- বারুণী উপলক্ষে দ্বারকেশ্বরের তীরে মোলবনার কাছেই এই মেলা এখনও হয়। এখানে একটি ছোট প্রস্রবন আছেন।

উইরামা গ্রামে প্রতি বছর বৈশাখের দশ তারিখে শিবের গাজন হয় ধুমধামের সঙ্গে জ্যোমরাডিহিতেও শিবের গাজন হয়। গাজনে আগে চড়ক আসত, এখন আসে না। রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ধর্মের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই অঞ্চলে কোথাও ধর্মের গাজন হতে দেখা যায় না।

দর্পনর্গরে আচার্যগণ বাস করেন। তাদের আরাধ্য ও কুলদেবী মা শীতলা বা বসন্তকুমারী এঁরা আগে বসন্তরোগের চিকিৎসা করতেন। এ অঞ্চলে অনেকে বসন্তকুমারীর গান গেয়ে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করেন।

আঁধারথোল গ্রামে বৈশাখে ৪ দিনের গাজন মেলা বসে। অন্যান্যে গ্রামে মনসাথান কেন্দ্রিক ২৪ প্রহর উৎসব হয় বৈশাখেই। কালপাথর, আঁধারথোল, জগদল্লা-১, জগদল্লা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত সহ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামেই মনসাথান কেন্দ্রিক শ্রাবণ সংক্রান্তি মেলা বসে। কোথাও কোথাও দোকানদানি বসে, আত্মীয়স্বজনের আনাগোনা বাড়ে। কখনও কখনও পাঁঠাবলিও হয়।

লৌকিক বারব্রত

রাঢ়বঙ্গে পূজাপার্বন, লোকোৎসব ও লৌকিক বারব্রতের সংখ্যা অগনন। অধিকাংশ বারব্রত মেয়েলী ও কৃষিকেন্দ্রিক। রাঢ়ের ভূমি অনুর্বর, কখনও খরা, কখনও ঝরা। তাই উর্বর মৃত্তিকা, সুবৃষ্টি, পর্যাপ্ত ফসলের জন্য শস্যদেবীকে সন্তুষ্ট করতে মেয়েদের ভূমিকা সর্বাগ্রে। অপরিসীম দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষের অনিবার্য পদসঞ্চার এই ভূমিকাকে কদাপি ম্লান করতে পারেনি। বারব্রত বালনে তাদের অসীম আনন্দ, প্রবল উৎসাহ লোকজীবনকে ছন্দময় ও বর্ণময় করে তুলে।

জৈষ্ঠ্য মাসে রোহিনী পালন। গৃহস্থের মেয়েরা ক্ষেত থেকে ঝুড়িতে মাটি বয়ে আনে। এই মাটিকে রোউনী বা রোহিনী মাটি বলে। মাটি সযত্নে গোহালের এককোণে রাখা হয়। এই দিনে ও দশহরা দিনে কেলেকড়া ফলের টুকরা খেতে হয়। রোগনিবারণে তিক্ত কেলেকড়ার নিশ্চয় কোন ভূমিকা আছে। বর্ষার সময় রোহিনীমাটি ধানবীজ অঙ্কুরিত করতে কাজে লাগে।

এ অঞ্চলে দশহরা বা দশেরা উৎসব পালিত হয়। স্থানে স্থানে গঙ্গাপূজা হয়। মনসাপূজার শুরু এই দশেরার দিন থেকে। অম্বুবাচীর উপবাস একদিন। মেয়েরা আগে নিরম্বু উপবাস দিত। নির্জলা থেকে জলদেবতা বরুনকে আবাহন করা এই উপবাসের উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। অম্বুবাচীতে তিনদিন মৃত্তিকা রজস্বলা থাকে, তাই ওই তিন দিন হলাকর্ষণ বন্ধ থাকে। জৈষ্ঠ্য মাসের কোন কোন দিন নৈসর্গিক কারণে সূর্যের চারিদিকে এক বলয়ের সৃষ্টি হয়। একে ডাঁহা লাগা বলে। ডাঁহা লাগার সময় বীজতলায় ধানবীজ বোনা নিষিদ্ধ। চাষীরা হলাকর্ষণ থেকে বিরত থাকে।

আষাঢ়ের বিশেষ দিনে 'শাকদেওয়া' বা শাকদান পালন করে এখানের মেয়েরা। আটরকম শাক শিবথান ষষ্ঠীথান গ্রামদেবতার থান ও তুলসী থানে কচুপাতায় সাজিয়ে দেওয়া হয়। সেদিন গৃহস্থের বাড়িতে অষ্ট শাক সমন্বয়ে রান্না হয়। এইসব শাকের ভেষজগুণ উপেক্ষণীয় নয়। শ্রাবণের শেষ সপ্তাহে শনিবার ধরে খই ঢ্যারার অনুষ্ঠান। খই ঢ্যারা মনসা পূজার ভিন্নরূপ। আগের দিন বার পালন করা হয়। খই ঢ্যারায় চিড়া, দই, মুড়কি ও আমপাকা দিয়ে ফলার হয়।

শ্রাবনসংক্রান্তিতে মনসার ব্রত। তাছাড়া আছে বিপত্তারিণী ব্রত। সংসারের কল্যাণ ও বিপদমুক্ত জীবন কামনা করে মেয়েরা এই ব্রত পালন করে। তারা দক্ষিণ বাহুতে সাত ঘি লালসূতা দূর্বাসহ ধারণ করে ব্রতভঙ্গ করে।

ভাদ্রমাসে চাষপর্বের সমাপ্তি ঘটে, নিড়ান, চটান আরম্ভ হয়। সারা ভাদ্র মাসে নানা পূজা, নানা বারব্রত। ভাদ্রে ঝুলন, লোটনষষ্ঠী, চাপড়াষষ্ঠী, লক্ষীপূজা, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, গণেশ পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা, মনসাপূজা ও অরন্ধন।

ভাদ্রের বৃক্ষপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে জগদল্লায় অনুষ্ঠিত হয় কালীয় নাগ দমন। শ্রীকৃষ্ণের কালীদহে কালীয় দমনকে উপলক্ষ্য করে এই উৎসব।

ভাদ্র সংক্রান্তিতে অরন্ধন। অবশ্য তার আগের দিন রান্না করে রাখা হয়। সন্ধ্যায় শিলনোড়াকে স্নান করিয়ে নববস্ত্র দিয়ে ঢেকে রান্নাঘরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। চালভাজা ও কলাই ভাজা নিবেদন করে মেয়েরা পূজা করে। এই ব্রতকে

শিলষষ্ঠীর ব্রতও বলে। পরদিন শিলনোড়ায় বিশ্রাম। দুপুরে গৃহস্থের সকলে বাসীভাত তরকারী খেয়ে ব্রত উদ্‌যাপন করে। রান্নায় আমিষ থাকে।

জিতাষ্টমী আশ্বিনের এক বিশেষ তিথি। এই তিথিতে জীমূতবাহনের পূজা ও শিয়াল শকুনি ভাসানের পরব। জীমূত শব্দের অর্থ মেঘ বা ইন্দ্র। তবে আর এক অর্থ হতে পারে — মেঘ যার বাহন এখানে বৃষ্টির দেবতা বরুনদেবকে বুঝাচ্ছে। জীমূতবাহন পূজা রাঢ়ের এক উল্লেখযোগ্য লোক উৎসব। মাটি অথবা পিতলের কলসীতে ছোলা কিংবা মটরকলাই ভিজানো হয়। কলসীটিকে চিত্রিত করে শালুক ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়। ওইদিন ভোরে ছেলেমেয়েরা নিকটবর্তী জোড়খাল কিংবা পুকুর থেকে মাটি এনে শিয়াল শকুনি ও ঐরাবত গড়ে মহানন্দে। ছেলেবেলার সেই আনন্দময় দিনটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ওই দিন আগের রাত নষ্টচন্দ্রের রাত। সেরাতে গৃহস্থের খামার বাড়িতে হানা দিয়ে ছেলেরা চুপিচুপি লাউ, শশা, টক লেবু অপহরণে ব্যস্ত থাকে। পরদিন সকালে মেয়েরা শশা কামড় দিয়ে ব্রতভঙ্গ করে। ছেলেমেয়েরা শিয়াল শকুনির ভাসান দেয় পুকুরের জলে তারা সমস্বরে বলে —

শকুনি গেল ডালকে শিয়াল গেল খালকে
ও শিয়াল মরিস না।
লোক হাসাহাসি করিস না।

মন্থন ষষ্ঠী বা মাথানি ষষ্ঠী ঃ- এই ব্রত ষষ্ঠীর। পুকুরে মন্থনদণ্ড পুঁতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত পূজা করে। মেয়েরা ডালায় শশা, কলাইভিজা, চিড়াদই দিয়ে নৈবেদ্য সাজায়। আশ্বিনমাসে শক্রোত্থান বা উত্থান একাদশী। গৃহস্থ মেয়েরা বারদিন পালন করে একাদশী তিথিতে উপবাস দেয়। এই দিথিতে দেবরাজ ইন্দ্র জাগরিত হন।

আশ্বিন সংক্রান্তিতে জিউড়; লক্ষীর সাধভক্ষণ। ক্ষেতে ধান এই সময় গর্ভবতী হয়। শরগাছ কিংবা শালডালে দই, দুধ, আতপ চাল, কলাপাকার মণ্ড, মানপাতার পুটলীতে বেঁদে ক্ষেতের এক কোণে পুতে দেওয়া হয়। গ্রামদেবতার থানেও দেওয়া হয়। আগের দিন সন্ধ্যায় সুপারি দিয়ে থানে থানে নিমন্ত্রণ করা হয়।

কার্তিক মাসে কাত্যায়নী ব্রত। সারা কার্তিক প্রতিদিন নিকটবর্তী নদী কিংবা পুকুরে মেয়েরা স্নান করে এই ব্রত পালন করে। সংক্রান্তির সকালে পায়েস তৈরি করে মেয়েরা। নদীতে গিয়ে তারা স্নান সেরে পায়েস খেয়ে জলে বাড়তি পায়েস বিসর্জন দেয়, সেই সঙ্গে ব্রতকথা বলে কাত্যায়নীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে। একে ক্ষীর ভাসান বলে।

ইতুব্রত আর এক লৌকিক ব্রত। ইতু আসলে লক্ষী। কার্তিক মাসে সংক্রান্তি দিনে ঘট পেতে অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি রবিবারে সেই ঘটে সূর্যের পূজা হয়। সূর্যের অপর নাম মিত্র। মিত্র শব্দই কালক্রমে ইতু হয়েছে বলে অনেকের ধারণা সূর্যপূজাকে ইষ্টপূজা বলে। এই ইষ্টই ইতু, অর্থাৎ লক্ষী। ইতুব্রতের উপকরণ হল ঘট, গাঁদাফুল, পঞ্চশস্য, প্রদীপ পিচুলি, গঙ্গাজল, ফলফুল নৈবেদ্য।

ইতুব্রতীনী নারী সকালে স্নান করে শুচিবস্ত্র পরে উপবাস দেয়। ডঃ শীলা বসাকের মতে — "ব্রতপালনের মধ্য দিয়ে নারীদের ত্যাগ, নিষ্ঠা, সংযম, সুপ্তকামনা বাসনা বা কল্পনা এবং একাগ্রতার প্রকাশ ঘটে। এক কথায় বলা যায়, যে প্রাতঃস্নান ব্রতাচার পালন, উপবাসী থাকা আলপনা দেওয়া ছাড়া বলা ব্রতকথা বলা বা শোনা ইত্যাদি হল ব্রতের কতকগুলি আচরণীয় নিয়ম।"

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, প্রতিটি ব্রতের বিশেষ অঙ্গ হল ব্রতকাহিনী। দেবতার মাহাত্ম্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হল তার উপাখ্যান বর্ণনা করাই ব্রতকথা। মেয়েরা এখনও ব্রতকথা বর্ণনায় পারদর্শিনী। ইতু লৌকিক শস্যদেবী। এই অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রামের মেয়েরা ইতুব্রত উদ্‌যাপন করে।

ডেনী পালন ঃ- ডেনী শব্দের উৎস বা অর্থ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। হেমন্তে ক্ষেত থেকে খামারে ধান তোলার শেষদিনে ক্ষেত থেকে ডেনী আনা হয়। ডেনী ঠাকুর আসলে শস্যের দেবী অর্থাৎ লক্ষ্মী। ক্ষেতের এক কোণে এক হালা ধান অকর্তিত রাখা হয়। ঘি, মধু, আতপচাল ও গাঁদাফুল দিয়ে ওই ডেনী ঠাকুরের পূজা করা হয়। ওই ধান হালাটিই ডেনী ঠাকুর। হালাটি দা দিয়ে কেটে মাথায় চাপিয়ে নিয়ে আসা হয় খামারে। সেখানে খড়ির আলপনা দেওয়া পিড়ায় ডেনীঠাকুর অবস্থান করেন। পরদিন সকালে তাঁকে পালুইয়ের পরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

এ্যাখান বা এখ্যান পূজা, হাড়ি কাঁড়ার দিন ঃ- মকরসংক্রান্তির পরদিন পিঠাপরবের লাগোয়া এখ্যান পরব। এই দিন ঠাকুরথানে আগুন খেলা হয়, ভক্ত্যাদের ঝুপ্যাল নামে। নূতন হাড়িতে রান্নাকরে অনেকে এখ্যান উদ্‌যাপন করে। এইদিন অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষেরা বলে শিকার করতে যায়।

ঘেঁটু পূজা ঃ- বেশ কিছুদিন আগেও ঘেঁটুপূজার প্রচলন ছিল। ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির দিন ঘেঁটু পূজার দিন। কারও মতে ঘন্টাকর্ণের পূজা। ঘেঁটুর পাতার রস খোসপাঁচড়ার মহৌষধি। ঘেঁটু চর্মরোগের দেবী। ঘেঁটু পূজায় ঘেঁটু ফুল, কড়ি, হলুদ, গোবরপিণ্ড, চাল, গুড়-এর নৈবেদ্য সাজিয়ে ছেলেমেয়েরা গান গাইতে গাইতে পাড়ার ঘরে ঘরে ঘুরে ও চালপয়সা আদায় করে। একে আলুর মালুর বলে। কেঞ্জাকুড়ায় এখনও ছেলেমেয়েরা আলুর মালুর করে ছড়া কাটে। যেমন —

ঘাঁটু এল নড়ে, হাতির উপর চড়ে
ঘাটু ঘোর ঘোর, ঘাটু বিয়া দুব তোর।
আলুর মালুর চাল গুছ্যেক দাও
না দিলে খোস পাঁচড়া লাও।

প্রচলিত লোকসংস্কারগুলির মধ্যে ধর্মীয় আচার আচরণ সমন্বিত ব্রতপালন মেয়েদের ত্যাগ ও নিষ্ঠার পরিচায়ক। মেয়েরা অতি সহনশীল, উপবাস জনিত কষ্ট, অক্লেশে সহ্য করে আত্মসুখ বিসর্জন স্বামী ও সন্তানসন্ততির মঙ্গল কামনায়, ব্রত পালনের মাধ্যমে তারা যে ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরিচয় দেয় তা অভাবনীয়। পারিবারিক মঙ্গলকামনাই ব্রতের উদ্দেশ্য। এখানকার মাটিতে মেয়েদের কঠিন বাস্তবের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। ব্রতপালন ও ব্রতকথার কাহিনীর রূপকের মধ্যে তারা আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস খুঁজে পায়। ব্রতকথা লোককথার বিশেষ এক অঙ্গ।

লোকগান (Folk Song)

লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রাণবন্ত উপাদান হল লোকগান। মার্গসঙ্গীত উচ্চমার্গের মানুষদের জন্য, লোকগান তাবৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্গীয়দের জন্য। লোকগান উচ্চবিত্ত ও এলিটদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় - ব্রাত্য। যাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান বেশ উচ্চে তাদের সংস্কৃতির কাঠামোচরিত্র ও পরিবেশনা সবই কৌলিন্যের ঝকঝকে মোড়কে মোড়া। তাদের জন্য রয়েছে বিদেশী গান ও যন্ত্রসঙ্গীত। মধ্যবিত্ত এলিটদের জন্য আছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি ও অতুলপ্রসাদের গান। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভক্তও আছেন। ওসব গান নিম্নবর্ণের শ্রমজীবি সম্প্রদায় গায় না, তারা গায় ঝুমুর, বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বাউল। তাদের মেয়েরা গায় ভাদুটুসুর গান।

লোকগান পরিমার্জিত ও ছন্দবিজ্ঞান অনুসারী না হলেও এতে রসমাধুর্য আছে, সুর আছে, আছে প্রাণের আকুতি। হৃদয়ের অন্তঃস্থলে এইসব গানের অনুরনন ধ্বনিও হয়। লোকগানের ধারা স্বতঃস্ফূর্ত, স্বচ্ছ গতিসম্পন্ন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারায় লোকগান সম্পৃক্ত হয়ে নিত্যনূতন সৃষ্টির আনন্দভুবন তৈরি করে থাকে। লোকগান হল খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের হৃদয় থেকে উৎসারিত জীবনবেদের প্রকাশ, যা লোকজীবনের রোজ নামচা — কালক্রমে ইতিহাস। সাদামাটা ভাষায় রসমধুরতায় পরিপূর্ণ লোকগীতি এখনও এক অসাধারণ সংস্কৃতি সম্পদ।

ভাদু ঃ- বাঁকুড়ার এই অঞ্চলে যেসব লোকগান প্রচলিত তাদের মধ্যে রয়েছে ভাদু, টুসু, ঝুমুর, বাউল ও শ্রমজীবিদের পেশাভিত্তিক গান। ভাদুর গান গায় মেয়েরা। সারা ভাদ্রমাস প্রতি সন্ধ্যায় ভাদুর গান গায় সংক্রান্তিতে মেয়েরা ভাসান দেয়। এক্ষনে ভাদুপূজার ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে প্রমানসাপেক্ষ বিস্তৃত আলোচনা করার অবকাশ নেই; ভাদুপূজার কাল ১৪০/১৫০ বৎসর। কথিত আছে কাশিপুর রাজ নীলমনি সিংহের এক কন্যা ভাদ্রমাসে জন্মগ্রহণ করেন, নাম ভদ্রাবতী বা ভদ্রেশ্বরী। কারও মতে ভদ্রাবতী অবহেলিত নিম্নবর্গীয় প্রজাগনের দুঃখে বিচলিত হয়ে তাদের মধ্যে ঘোরাফেরা করে তাদের অভাব অভিযোগ শুনতেন। অন্ত্যজ শ্রেণী এক যুবকের প্রেমে পড়েন তিনি। প্রেম পরিণয়ে সার্থক হবে না ভেবে মনোদুঃখে ভদ্রাবতী শায়রে প্রাণ বিসর্জন দেন। গুনবতী রাজকন্যার স্মরণে প্রজাগন ভাদুর প্রতিমা গড়ে পূজার সূচনা করে। অপর এক মতে, ভাদু কৃষিলক্ষ্মী। ভাদ্রমাসে ভাদুই ধান উৎপন্ন হত, ভাদুই ধান গরীবের অভাব দূর করত। আনন্দে গরীব চাষী ভাদুর গান গেয়ে পূজা শুরু করে দেয়। এমনি বিভিন্ন মত আছে। তবে যে

যাই বলুক ভাদু নিম্নবর্গীয় কৃষি শ্রমিকদের পূজ্যা লৌকিক দেবী। মানব-মানবীর লৌকিক দেবতায় উত্তরণ আমাদের দেশে ঘটে আসছে। তবে একটা কথা ভাদুর পূজা স্থানীয় উচ্চ ও মধ্যবিত্তের অন্দরমহলে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হত। মেয়েরা ভাদুর গান গাইত। ভাদুপূজায় পুরোহিত নেই, নেই কোন মন্ত্র ও শাস্ত্রীয় আচার আচরণ। ভাদুপূজা ভালোবাসার পূজা, ভয় ভক্তির স্থান নেই। দৈবী শক্তির আধার নন বলে ভাদুর থান বা মন্দির নেই। মেয়েরাই নিজেদের অথবা পল্লীকবিদের রচিত ভাদু গান গেয়ে থাকে।

বাউরি ও মেট্যা সম্প্রদায়ের মেয়েরা এই গানটি গায়। গানটির রচয়িতা মেয়েরা বলেই মনে হয়। গানটি কাশিপুর থেকে এ অঞ্চলে এসেছে।

আমডগি জামডগি কিবা ডগি মেলেছে
এতবড় দেশের রাজা দালান দিতে লেরেছে
দালান দিলি বেশ করিলি তার উপর দরজা দে
দরজার উপর চেপে দেখব কাশিপুরের রাজাকে।
কাশিপুরের বাসি চাদর উলটে ধরব না
যার সঙ্গে ভালোবাসা তার সঙ্গে ভাব করবো না।

দ্বিতীয় গান —
হাওয়া গাড়ী টুঙটুঙ কে বাজারেতে?
আয়লো সই দেখে যানা ভাদুর বাংলাতে
ভাদুর হাতের পানের খিলি খেলো ঠাকুরঝি
তোর কিরা ভায়ের কিরা জর্দা দিয়েছি
জর্দা দিয়া পান হয় সখের সস্তা খিলি
বাঁকুড়ায় পানের দোকান আছে অলিগলি।

তৃতীয় গান —
ও রামের মা, ও রামের মা রাম ক্যান ধূলায় পড়ে?
বড় ভাইয়ের বড় মায়া লাও ফেলে ধূলা ঝেড়ে।
বানর বুলে ডালে ডালে বানরের কি পা দোলে
রামসীতাকে বনে দিয়ে বসে আছি গাছতলে।

তিনটে গানের তিনরকম সুর।

প্রথমেই বলি ভাদুর গানে বিষয় বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু সুরের তেমন বৈচিত্র্য নেই দু'চারটে সুরের মধ্যে ভাদুর গান সীমাবদ্ধ এবং তা মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত গানেই। কয়েকজন সংগীতবিশারদ ভাদুর গানের স্বরলিপি তৈরি করেছেন। ভাদু টুসু ঝুমুর ও করম গানের মধ্যে অনেকক্ষেত্রে বেশ মিল চোখে পড়ে। ভাদুর গানে আছে লৌকিক পৌরাণিক প্রসঙ্গ। আছে দার্শনিক তত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণের লীলা, সমসাময়িক ঘটনাবলী। প্রচলিত বেশীর ভাগ গানের কাব্যিক মূল্য খুব একটা নেই, বিষয়সঙ্গতি ও ভাষা বড় দুর্বল। নন্দীগ্রামের রাধারাণীদের কণ্ঠে ভাদুগানে মুগ্ধ হতে হয়। তবু ভাদ্র সন্ধ্যায় মেয়েরা সুর করে ভাদুর গান গায় শুনে মুগ্ধ হতে হয়। মোলবনার মেয়েরা ভালো ভাদুর গান গায় এবং গানের চর্চা এরা বজায় রেখেছে, আবার মেট্যাকুল্যার জেলেদের মেয়েরা যে সুরে গান গায় শোনার মত। কেঞ্জাকুড়ায় আর এক ধরনের সুরে গান গাওয়া হয়। এই একটি সুরকে কেন্দ্র করে বছরের পর বছর ধরে ভাদুর গানের বহু চটি বই বেরিয়েছে। এই অঞ্চলে ১৭ জন ভাদুর গানের রচয়িতার সন্ধান পেয়েছি। দু'চারটে গানের নমুনা দিচ্ছি।

১। গ্রামের নগরায়ন,
গেরাম কি আর গেরাম আছে
নগরজীবন কোথা লাগে এর কাছে।
টাইম টাইম জল আসিছে গো
গ্রামের সবাই নিতেছে
বিজলী বাতি তা-ও জ্বলিছে
টেপ টিভি ফ্যান চলিছে।
(অমর চক্রবর্ত্তী)

২। নবীন বিশ্বায়নে
দেশের রূপটা বদলে গেল এ্যাদ্দিনে
জগৎজুড়ে খোলাবাজার গো
বিক্রি হয়ে গেল সবখেনে
বিদেশী মাল আসছে অঢেল
বিক্রি হচ্ছে দোকানে।
(অঃ চঃ)

৩। ভাদু আজকে তোমার পাকা দেখা
তুমি কি তা জান না
রোদে কেন ঘুরছ ভাদু
শুকিয়ে যাবে মুখখানা
(অনাদি চন্দ)

৫। ভাদু মোজের রাজার বিটি,
পিঠ ভেঙ্গে চুল পড়েছে
ভাদুর খোঁপায় উঠবে বলে
বাগিচায় ফুল ফুটেছে
চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙে ঐ
এল ভাদুর আননে
কালো ভ্রমর নাচে যেন
ভাদুর দুটি নয়নে।
(বারিদ চন্দ)

৬। কালি তোর আমলে
কত রঙ্গ দেখিব ভূমণ্ডলে
যত মানুষ তত রকমের দেখি এই কলিকালে
দেখে শুনে হই যে অবাক
ভাবছি হাত দিয়ে গানে
(কানাই কুচল্যান)

৪। আমার ভাদু সিলাই আইল
পরতে দুব কী?
বাক্সয় আছে পাটের শাড়ি
বার করে দি
উয়ার ভাদু সিনাই আইল
পরদে দুব কী?
ঘরে আছে চট ছ্যাঁড়া
বার করে দি।
(প্রচলিত সুর)

৭। নাকেতে লত দিলাম, লতটানা দিলাম গো
জলটোপ দিলাম তার সনে।
নাকচাবিতে মানায় ভালো ও ভাদুধনে
গলাতে চিক দিলাম, চাপকলি দিলাম গো
সপ্ত গাঁথা তার সনে
সীতাহারে মানায় ভালো ও ভাদুধনে।
(প্রচলিত সুর)

দেশবিদেশের ছোট বড় নানা সমস্যা, ঘটনা-দুর্ঘটনা নিয়ে প্রতিবছরই ভাদুর গান লেখা হয়। এবছর কেঞ্জাকুড়ার পল্লিকবি অনাদি চন্দ ভাদুর গান রচনা করছেন। কেঞ্জাকুড়ায় যেসব ভাদু প্রতিমা তৈরি হয় তার অধিকাংশই আধুনিক, বেলবটম পরিহিতা, বরছাট চুল, কোলে হারমোনিয়াম অথবা গীটার। কৃষ্ণকোলে পদ্মাহস্তা ভাদু দু'চারটে তৈরি হয়। মেয়েরা ভাদুর কাছে সন্তান কামনা করে।

টুসু ঃ- বাঁকুড়া জেলায় বিভিন্ন জায়গায় টুসু পূজার প্রচলন আছে। পরকুলে কাঁসাই তীরের টুসু পরব বিখ্যাত। বাঁকুড়ার মধ্যাঞ্চলের গ্রামগুলিতে আগে মেয়েরা টুসু পূজা করত, টুসুর গান করত। এখন বিনোদনের নানা উপকরণ গ্রামগঞ্জের ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে সুতরাং ভাদু টুসুর গানে ভাঁটা তো আসবেই। ভাদুটুসুর পূজা ও গান এখনও অন্ত্যজ শ্রেণীর মেয়েরা টিকিয়ে রেখেছে। টুসু ভাদুর মত লৌকিক দেবী। কারও মতে টুসু কৃষিলক্ষ্মী। হেমন্তে ধান কাটা হয়, ফসল ঘরে আসে। লক্ষ্মীর আগমন হয় চাষীর ঘরে। তাই ধানের তুষ পোড়ামাটির খোলায় রেখে গাঁদাফুল সাজিয়ে, খোলার তিনদিকে এক সারি প্রদীপ জ্বেলে টুসুর পূজা করা হয়। ফলফুল নৈবেদ্য সামনে রেখে মেয়েরা টুসুর গান করে। টুসু পূজাতেও পুরোহিত নেই, মন্ত্র নেই। সারা পৌষমাস প্রতি সন্ধ্যায় মেয়েরা টুসুর গান করে পৌষ সংক্রান্তিতে নদী কিংবা সায়রের জলে ভাসান দেয়।

টুসু ভাদুর মত রাজকন্যা নন। টুসু সাধারণ গৃহস্থবধু। সাদামাটা তার জীবনধারা। টুসুর গুনে গৃহে অপার শান্তি,

অভাব অনটন নেই। এই অঞ্চলে টুসুর প্রতিমা নির্মান হয়না। অন্যত্র টুসুর প্রতিমাপূজা হয়। ভাসানের সময় চৌদলা সমেত টুসুর বিসর্জন হয়।

ভাদুপুজার চেয়ে টুসুপূজা প্রাচীন, টুসুর গানও প্রাচীন। টুসুর গান অতি সাধারণ তবে সুশ্রাব্য। বর্তমানে সামাজিক সমস্যা ও চলতি ঘটনাবলী টুসুর গানে ঢুকে পড়েছে। আলোচ্য অঞ্চলে টুসুর গানে বই প্রকাশ হতে দেখিনি। তবে দক্ষিণ বাঁকুড়া বই প্রকাশিত হয়।

টুসুর গান —

১। আম কাঠের পিড়াটি
ঘি চপ চপ করে।
তায় বসে আমার টুসু
কন্যা দান করে।।

২। আসছে বছর অ্যাসো টুসু
দুব পাটের শাড়ি।
চৌদোলাতে চ্যাপে টুসু
যাবেক শোশুরবাড়ি।

৩। কুথা থ্যেকে অ্যালে টুসু
কুথায় তুমার ঘরবাড়ি
চাকুল্যাতে ডেরা ডাণ্ডি,
কুশমাটিতে ঘরবাড়ি।।
*টুসু আমার রাজার বিটি
কার্মেটি কাঁটায় ব্যাঁধেছে ঝুঁটি।

* এখানে টুসুকে রাজার বিটি বলা হয়েছে।

৪। আয় লো টুসু কাটবি ধান
ব্যাতন দুব খিলিপান
সোনার বরন ধান প্যাকেছে মাঠে
কাটবি লাড়া দুই কাহন
ছুটি পাবি স্যেই তখন
সূয্যি যাবে পাটে।

পৌষের সংক্রান্তিতে টুসুর ভাসান। মেয়েরা দল বেঁধে টুসুর খোলা মাথা নিয়ে গান গাইতে গাইতে নদীর দহে অথবা সায়রের জলে টুসুর বিসর্জন দিতে যায়। মেয়েদের গানে পরস্পর লড়াই আছে যাকে বলে গানের লড়াই।

৪। একপক্ষ ঃ- আমার টুসু মুড়ি ভাজে, চুড়ি ঝলমল করে গো
উয়ার টুসু হ্যাংলা মেয়ে আঁচল পেতে মাগে গো
অপরপক্ষ ঃ- এ-চালে ধান ওচালে ধান সকল খেল হাঁসে গো,
আমার টুসু নাক বিঁধালো গাঁদা ফুলের বাসে গো।

৫। তুষ-তুষোলো তুষপতি**
কেন তুষোলো এতরাতি
তালবনে হারালাম ছাতি।
সেই ছাতি জাগে
ভায়ের প্রতি লাগে,
ভাই লক্ষন দুটি ভাই
খলুক খলুক পয়সা পাই
(খলুক = খেলতে খেলতে।)

** এখানে টুসু ও তুসু সমার্থক, কিন্তু অনেকে তুষু ও টুসু ভিন্ন বলে মনে করেন। তুষু শব্দটি মাণিকলাল সিংহ ব্যবহার করেছেন। ভারতকোষে আছে টুসু। দক্ষিণ বাঁকুড়ায় ও পুরুলিয়ায় টুসু শব্দের চলন বেশি। তবে আজকাল সর্বত্রই টুসু শব্দটির ব্যবহার হচ্ছে হয়ত কালের প্রভাবে।

হাপুখেলা ও হাপুর ছড়া ঃ- বেশ কিছুদিন আগেও দেখেছি বিভিন্ন মেলায় ছেলেরা হাপু খেলা দেখাত। গরীব ঘরে ছেলে ঘরে ঘরে হাপুখেলা দেখিয়ে পয়সা চাল রোজগার করত। দুটো কাঠি দিয়ে পিঠে ঘাড়ে শরীরের এখান ওখান ছন্দে ছন্দে বাড়ি মারত আর সুর করে ছড়া বলত। এখন আর হাপুখেলা দেখা যায় না।

ঝুমুর

জেলা বাঁকুড়ার সর্বত্রই ঝুমুর গানের কমবেশি প্রচলন আছে। বর্তমানে ঝুমুর এক জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত। সম্প্রতি বাঁকুড়ার বিভিন্ন জায়গায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ঝুমুরের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। ঝুমুর গানের মাধ্যমে মানুষের কাছে জনকল্যাণমূলক নানা পরিকল্পনার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে।

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে ঝুমুরের উল্লেখ আছে, সুতরাং ঝুমুরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। ঝুমুর কান নাচের গান, তবে সংস্কৃতির বিবর্ত্তনের ফলে বৈঠকী ঝুমুর গান উচ্চাঙ্গ ফরমুলায় গাওয়ার চল আছে। ঝুমুর শব্দের নানা ব্যাখ্যা আছে। ঘুরে ঘুরে যে গান গাওয়া হয় তাকেই ঝুমুর বলে। আদিবাসীগণ নানা আনন্দ অনুষ্ঠানে মাদল ও ধামসার বাজনার তালে তালে নেচে যে গান গাইত সেই ছন্দময় গানই ঝুমুর।

তাই ঝুমুরে আদিবাসী নৃত্যশৈলীর প্রভাব বিদ্যমান। ঝুমুর গানের ভাষা সহজ সরল সাবলীল, ঝুমুর কীর্তনের চেয়ে প্রাচীন। ঝুমুরকে অনেকে ঝাড়খণ্ডের পদাবলী বলে। পুরাণ মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতির লৌকিক প্রসঙ্গ ও রাধাকৃষ্ণের লীলাকে কেন্দ্র করে বহু ঝুমুর গান রচিত হয়েছে। কালক্রমে ঝুমুরে সামাজিক ও মানুষের জীবনের নানা সমস্যার প্রসঙ্গ এসেগেছে।

লৌকিক ঝুমুর গানের বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষ্যনীয়। যেমন দেহতত্ব, সাংসারিক সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, ধর্মীয় ভাবনা। ঝুমুর নানা শ্রেণী আছে যেন, ভাদরিয়া চৈতী, পাতকুম্যা, দাঁড়শালিয়া, কাঠিনাচের ঝুমুর, মুদিয়ালী পেটিয়ামারা নাচনিশাল, ঝিঙাফুলিয়া ইত্যাদি। বাঁকুড়ার এই অঞ্চলে সাধারণত ভবপ্রীতানন্দের ঝুমুর বেশি গাওয়া হয়। বাঁকুড়ার কাঠিনাচে ভবপ্রীতামন্দের ঝুমুরই গাওয়া হয়। জগৎ কবিরাজ, চামু কর্মকার, রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলির ঝুমুরও অনেকে গেয়ে থাকেন। এ অঞ্চলে নাচনী ঝুমুরিয়া নাই, পুরুলিয়ায় আছে। পুরুলিয়া থেকে নাচনীদের মাঝে মাঝে নানা অনুষ্ঠানে আনা হয়। নাচনীদের গানে রাধাকৃষ্ণে প্রেমবিরহের কথা থাকে তবে অন্যান্য গান আদিরসাত্মক ভাষাও অমার্জিত। ঝুমুর গানে গমকের কাজ, সুরের টান ও দোল খাওয়া ছন্দ শ্রোতার মনে এক উন্মাদনার সৃষ্টি করে যা অন্যান্য লোকসঙ্গীতে দুর্লভ। তাছাড়া ঝুমুর অর্থকরীও বটে, ভাদু, টুসু অর্থকরী নয়।

এ অঞ্চলের কয়েকজন ঝুমুরিয়ার পরিচয় পাওয়া যায় — বাদি ঠাকুর, উমেশ হালদার, দাশু লোহার।

বর্তমানে জীবিত শিল্পীদের মধ্যে আছেন, শ্যাম লোহার, মদন কালিন্দী। এরা নানা অনুষ্ঠানে ঝুমুর গেয়ে থাকে। পেশায় শিক্ষক ভাগবতচন্দ উচ্চাঙ্গের বৈঠকী ঝুমুর গেয়ে থাকেন।

একটি লৌকিক ঝুমুর গান ঃ-

১। ঝিঙাফুল লিলেক জাতি কুলগো
পিরিতি হইল ফুল গো
বর্ণ ছিল চাঁপার কলি
ভাইবে ভাইবে হইলাম কালি
কালার এ পিরিতি আমার
মজাল দুই কুল গো।

(প্রচলিত)

রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক ঃ-

২। আজি রাধাসনে নিশি
যদি না মিলি রূপসী
ব্যাকুল হবে তার অন্তর গো
মদন হারিবে ফুল শরগো।
বিষম কুমুম গণ
দহিবে রাধার মন
কুপিত হবে মোর উপর গো।
রাধার ঘটিলে মান
মোর হিয়া কম্পমান
দংশিবে বিরহ বিষধর গো।
ভবপ্রীতা গতি রাধাধর গো। (ভবপ্রতীম)

৩। আজি আসিল বসন্ত
না আসিল প্রাণকান্ত
অঙ্গ কাঁপে থর থর মদন দহনে।
(রঙ) কত ব্যথা জাগে মনের গভীর গহনে
কী কারণে বংশীধারী পাসরিল রাধাপ্যারি
কাটে নিশি রঙ্গরসে কাহারই কাননে
সুগন্ধি কুসুম দাম
অঙ্গ সাজে কিবা দাম
অবসিত চন্দনবাস মন্দপরণে।

(ধীরেন্দ্রনাথ)

কুরুক্ষেত্রে উদ্যোগ পর্বে সারথি শ্রীকৃষ্ণকে
অর্জুনের আবেদন —

৫। হে মাধব, ক্ষম সখা, ক্ষম অভাজনে,
যাব না, যাব না আমি ওই মহারণে।
করে ধরি ধনু, ভাবি মনে মনে
যুঝিব কেমনে আত্মজন সনে
কেহ বাল্যসখা, কেব বা বান্ধব
পূর্ণ রণভূমি যত পরিজনে।

(ধীরেন্দ্রনাথ)

৪। ও ললিতে তোরে বলি
ওই, ফুটলো বনে কৃষ্ণকলি
কুঞ্জে আমার কৃষ্ণ এল কই
ওলো, গাঁথছি বসে ফুলহার
রাখছি খুলে কুঞ্জদ্বার
কোথায় পাবো দেখা তার
কৃষ্ণধনে খুঁজলো তোরা সই।।

(ধীরেন্দ্রনাথ)

ভাদরিয়া ঝুমুর ঃ-

৬। বিরহে কাতর অতি রাইবলে সখী প্রতি
কে এনে মিলাবে তারে বল না।
(রঙ) বিরহে আর প্রাণ বাঁচে না।।
মন দুঃখ বলি কারে নিয়ত নয়ন ঘুরে
মরমে মরমে ভেল যাওনা
সোহি দরশন মাগে সদাই অন্তরে জাগে
রামকৃষ্ণ বলে মরম বেদনা।
বিরহে প্রাণ বাঁচে না।।

(রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী)

ঝুমুরের পালাগানও গীত হয়। এখন সর্বশিক্ষা অভিযান, পণপ্রথা, নারী ও শিশু পাচার, এড্‌স প্রতিরোধ প্রভৃতি নানা বিষয়ে ঝুমুর গান রচিত হচ্ছে ও গাওয়া হচ্ছে। ঝুমুর গানের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনত্ব, ক্লাসিক চরিত্র থাকলেও বিবর্তনের ফলে ঝুমুর লোকসঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া ঝুমুর গণসচেতনার মাধ্যমও বটে।

মনসামঙ্গল

পূর্বে জগদল্লা থেকে পশ্চিমে কেঞ্জাকুড়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি গ্রামেই মনসার থান ও মেলা বিদ্যমান। বর্ণ হিন্দুদের পাড়ায় মনসামেলা নাই বল্লেই চলে। অথচ তারা যথাবিধি আচার আচরণ পালন করে মনসার থানে পূজা দেয়। সারা শ্রাবণ মাস প্রতি সন্ধ্যায় মনসামেলায় মনসামঙ্গল গায় কৃষিজীবি মানুষ। মনসার গানের সঙ্গে বাজে বিষান ঢাকী। দু-এক জায়গায় মনসা যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়। মনসামঙ্গলের গানের সুর বেশ মর্মস্পর্শী। ভাসানের গানেও ফুটে উঠে করুন আবেদন। মনসা সর্পদেবী, তাই সংসারের মঙ্গল কামনা ছাড়া সর্পভীতি দূর করার জন্য মনসার স্তবস্তুতি আবাহন গানের মাধ্যমে করা হয়। আগে কেঞ্জাকুড়ায় লোহার মেলায় ঝাঁপান খেলা হত। এখন হয় না। এখনও অনেক মানুষের অন্ধ বিশ্বাস। সর্পদষ্ট প্রাণী ওঝার ঝাঁড়ফুঁকে সেরে যাবে। তবে বিজ্ঞান চেতনার প্রসারের ফলে এদের সংখ্যা কমে এসেছে। মনসামঙ্গলের গান মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের কথা, নানা সমস্যার কথা বলে না। তাই মনসামঙ্গলকে ভাদু-টুসু বাউলের সমগোত্রীয় লোকসঙ্গীত বলা চলে না।

এ অঞ্চলে মনসামঙ্গলের অন্যতম শিল্পী শ্যাম লোহার ও সম্প্রদায়। অমর দাস ও তার বাউরি খুব জনপ্রিয় শিল্পী। তাদের গায়নভঙ্গীও রীতিমত আকর্ষণীয়। বাঁকুড়া ব্লক ওয়ানের বিভিন্ন গ্রামে মনসামঙ্গলের সুগায়ক আছেন তাদের নাম সংগ্রহ করা দরকার।

বাউল

বাঁকুড়া জেলায় বাউলের সংখ্যা কম নয়, প্রায় পাঁচশত। এদের মধ্যে কয়েকজন রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত। জেলায় বেশ কয়েকটি আশ্রম ও আখড়া আছে। বাউলেরা একতারা, গাবগুবা গুব, গুপীযন্ত্র ও দোতারা বাজিয়ে বাউলগান পরিবেশন করেন। পূর্বে লোকসংস্কৃতির গবেষকগণ বাউল গানকে লোকসঙ্গীত বলে গণ্য করতেন না। কিন্তু এখন বাউল গানের রূপান্তর ঘটে গেছে। বাউল শুধু সাধন মার্গের সঙ্গীত নয় লোককল্যানকর সঙ্গীতও বটে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের নানান সমস্যা, দৃষ্টান্তমূলক চলতি ঘটনা, লোকশিক্ষার বিষয়বস্তু নিয়ে গান রচিত হচ্ছে এবং সেসব গান বাউলেব সুরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাউলেরা নিষ্ঠাভরে গাইছে। তবে যারা মনে প্রাণে প্রকৃত বাউল অধ্যাত্মতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্বের গান ব্যত্তি অন্য বিষয়ের গান তাদের কাছে অচ্ছ্যুৎ। বর্তমানে এক শ্রেণীর বাউল বাউল গানকে দেশ বিদেশে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করছেন।

যে তত্ত্বের বাউল দর্শন প্রতিষ্ঠিত তার বিচ্যুতি ঘটেছে সাম্প্রতিক কালে। সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দ থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি। বাউল সংসারে উদাসীন এক ধরণের বাউণ্ডেলে ভবঘুরে জীবন দার্শনিক। বাউল জাতপাত মানে না, প্রচলিত ধর্মে, ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাসী নয়। তবে তারা গুরুবাদী। বাউল গবেষক সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন — "সারা পশ্চিমবঙ্গে এমন বহু বৈষ্ণব বাউল রয়েছেন যাঁরা কিন্তু কেউ বাউল নন, জাত বৈষ্ণব বা সহজিয়া। সত্যি কথা বলতে বীরভূমে খুব বেশি বাউল নেই। কেন্দুলীতে যেটা হয় সেটা বৈষ্ণব মেলা। মুর্শিদাবাদ, নদিয়াতে এখনও কিছু সত্যিকারের বাউল আছেন। সত্যিকারের বাউলেরা পৌওলিকতা বা জাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। এঁরা কোনো গোত্রের লোক নয়। এঁদের কাছে নিজেদের পরিচয় একটাই — মানুষ।"

যাইহোক বাউলের কণ্ঠে উদাত্ত হৃদয়হারী সুর, ছন্দময়, নৃত্যভঙ্গী, সাধারণ পরিধেয় ও অনবদ্য পরিবেশনা মানুষ যাদু করে রাখে। বিষয়টির বিস্তারে আর যাচ্ছি না।

বাঁকুড়ায় সোনামুখী মনোহর দাস আশ্রমে, এক্তেশ্বরের গাজনে ও কাটজুড়িডাঙ্গাতে রাঢ় অকাদেমি প্রাঙ্গণে বাউল গানের অনুষ্ঠান হয়। বসন্তকালে তিনদিন ধরে অনুষ্ঠিত এইসব আসরে জনসমাগম কম হয় না। করগাতিরও পোয়াবাগানে একটি সাধুর আশ্রম আছে, এখানে বাউল গান হয়। আঁচুড়ির প্রফুল্ল মালাকার (ভজু) বাউল গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রফুল্ল বাউলগান রচনা করতে পারেন। সদা প্রফুল্ল উদয় সহিস বাউলগানের একনিষ্ঠ শিল্পী। কেঞ্জাকুড়ার জয়দেব কর্জনা, মনোহর পুরের শুকদেব দাস, উপরশোলের ফটিক ঘোষ, তপন কর্মকার বাউল গানে বেশ নাম করেছেন। শুকদেব দাস গৃহী বাউল, তিনি উৎকৃষ্ট দোতারা তৈরি করতে দক্ষ। প্রতিদিন শুকদেব ট্রেনে বাউল গেয়ে উপার্জন করে। উপরশোলে মনোহর বাবাজীর রামানন্দ আশ্রম, সেখানে নিয়মিত বাউলের চর্চা হয়।

বাউল গান

১। বৃন্দাবনে তিনটি পুষ্প
একটি পুষ্প সাদা,
এক ফুলেতে ঠাকুর কৃষ্ণ
আর এক ফুলে রাধা।

২। বনমালী তুমি পরজনমে হইও রাধা
আমি মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে বানাব রাধা।
তুমি আমারই মতন জ্বলিয়া জ্বলিও
শ্যাম কলঙ্কের হার গলেতে বাঁধিও
তুমি যাইও যমুনার ঘাটে
না মানি ননদীর বাধা।

৩। হইছি আমি পথের বাউল
পথেই আমার বাসা
পথে পথে বেড়াই ঘুরে
বিলাই ভালোবাসা।
পথের মাকে চলতে চলতে
হরিনাম বলতে বলতে
মন ভরে যায় প্রেমানন্দে পুরে মনের আশা।

৪। রুক্ সুখু রাঢ় বাঁকুড়ার
লাল মাটিতে ভাই
বসত করে সারা বছর
দিন আনি দিন খাই।
এই মাটিতে দারুন খরা
কখনও বা অঝোর ঝরা
খেয়ালি মেঘ কোথায় থাকে
সাকিন না তার পাই।

৫। আমি যে এক সাধের বাউল
ভাবের বাউল হইব কেমনে,
কোথায় পাবো ভাবের গুরু
শুধাই জনে জনে।
ওই সাধের বাউল সাজে
তুলি লহর এক তারাতে
কবে ভক্তি কুসুম ফুটবে আমার প্রেমের কাননে।

আদিবাসী সংস্কৃতি

আদিবাসী বলতে আমরা তাদের বুঝি যারা প্রাচীনকাল থেকে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে আসছে। আমাদের দেশে সাঁওতালগণ আদিবাসী নামে পরিচিত। ডাল্টনের মতে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এই জেলায় সাঁওতালদের আগমন ঘটে। ছোটনাগপুর মালভূমির পশ্চিমাঞ্চল থেকে সাঁওতালরা এসে উত্তরের দামোদর নদের তীরভূমি থেকে দক্ষিণে রাইপুর রাণীবাঁধ থানা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ছিয়াত্তরের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় জেলার বহু গ্রান জনশূন্য হয়ে যায়। কৃষি শ্রমিকের দারুন অভাব ঘাটে। জমি জায়গা নিবিড় বনজঙ্গলে পরিণত হয়। নব্য ভূম্যধিকারীগণ কৃষিজমি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন উপজাতিগোষ্ঠীকে ডাক দেয়, হাজারীবাগ, শিখরভূম থেকে সাঁওতালগোষ্ঠী এই ডাকে সাড়া দিয়ে জেলার বিভিন্ন স্থানে গ্রামের পত্তন করে। গ্রামগুলি মৌজার নাম অনুসারে নামাঙ্কিত হয়। কিন্তু ডাল্টনের মত সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়। সেসময় অনেক সাঁওতাল এলেও পূর্ব থেকেই সাঁওতালদের এখানে বাস ছিল। ছাত্না থানায় এমন প্রাচীন গ্রাম আছে যার নাম সাঁওতালী। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে যদি সামন্তপ্যন থেকে সাঁওতাল হয় তবে ছাত্না সামন্তভূমতো বটে। তাহলে দেখা যাচ্ছে সাঁওতালগণ জেলার আদিবাসী।

বাঁকুড়া জেলার মধ্যে রাইপুর থানায় সাঁওতালদের সংখ্যা বেশি, এরপর আছে রাণীবাঁধ, ছাত্না, খাতড়া ও অন্যান্য থানা। বাঁকুড়া ব্লক ওয়ানের সাঁওতাল গ্রামগুলি হল — কেঞ্জাকুড়া অঞ্চলে, তুলসী, ধোবার গ্রাম, কেশ্যাডোবা, কেন্দসায়র গিরমিড্ডি, জামিরতড়া, নূতনডি, হরেকৃষ্ণপুর, বক্সিডি, তাঁতকানালী, কেচাবনি, কালপাথর অঞ্চলে রাঙামেট্যা, ভালুকসুন্দা, শালুনি, বড়বনা, আঁধারথোল অঞ্চলের কালুডি-সেয়াবাদা, জগদল্লা-২ এর আঙ্গারিয়া।

বাঁকুড়া ব্লক ওয়ানে সাঁওতালদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। এখানকার গ্রামগুলি ছোটছোট। এদের গ্রামে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে না। ওরাও অন্য সম্প্রদায়ের গ্রামে বসবাস করেনা। প্রাচীন গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনধারার স্বকীয়তা আজও তারা বজায় রেখেছে। তবে ইদানীং সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হওয়ায় অনেকে চাকুরী উপলক্ষ্যে শহরে বাস করছেন এবং শহুরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হচ্ছেন।

বহুপূর্বে সাঁওতালরা ছিল যাযাবর অরণ্যচারী। শিকারলব্ধ পশুপক্ষীর মাংস এ জীবিকা নির্বাহ করত। পরে কৃষি

ব্যবস্থা যুক্ত হলে তাদের গ্রাম, গোষ্ঠী সমাজ ও কৌম গড়ে উঠে। সাঁওতালরা নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে অস্ট্রিকগোষ্ঠীর। কৃষ্ণকায় সবল সুগঠিত দেহ, সহজ সরল স্বভাব, নির্ভীক ও পরিশ্রমী। সাঁওতালদের জীবনযাত্রার ধরণ, ধর্মীয় আচারআচরণ, সামাজিক রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বরাবর প্রায় অক্ষুন্ন আছে। স্থানবদল, ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব, বিভিন্ন জনজাতির নৈকট্য, সযত্নে লালিত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে তাদের একেবারে বিচ্যুত করতে পারেনি।

গোষ্ঠী সমাজবদ্ধ সাঁওতালদের সামাজিক রীতিনীতি অতি স্বচ্ছ ও জটিলতা বর্জিত। অরণ্যসন্নিহিত অঞ্চলে গ্রাম গড়ে তারা বসবাস করে। এখন অরণ্য প্রায় অন্তর্হিত হওয়ায় এবং গ্রামীণ জীবনে শহরায়ণের ছোঁয়া লাগায় সাঁওতাল পল্লীর ভোল বদলাতে শুরু করেছে। মাটির দাওয়া, খড়ে ছাওয়া ঘর, গ্রামজ উপকরণ দিয়ে দেওয়ালের চিত্রায়ন ও সুষম অলংকরণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তাদের অকৃত্রিম সৌন্দর্যবোদের পরিচয় দেয়। নারীপুরুষের অনাড়ম্বর অঙ্গ সজ্জাতে রুচিবোধও পারিপাট্য লক্ষ্য করার মত। আগে স্যাঁতালদের মধ্যে বিষয়সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে বিশেষ চেতনা ছিল না। কালক্রমে বৈষয়িক চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটে।

সাঁওতালদের আরণ্যক জীবনে বন্যপশুপক্ষী শিকার করে জীবিকা নির্বাহ ছিল প্রধান উপায়। পরবর্তীকালে কৃষিভিত্তিক সমাজে শিকার এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়। শিকারের দুটি দিক প্রধান - লা বির সেন্দর — অর্থাৎ বলে পশু শিকার করা, আরেকটি হল লা বির বাইসি অর্থাৎ সর্বোচ্চ বিচারসভা। বর্তমানে লা বির বাইসির অস্তিত্ব নেই। শিকার অনুষ্ঠানের মুখ্য নিয়ামক হলেন দিহরি। তার পরিচালনা ও নির্দেশে শিকারপর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

সাঁওতালদের উদ্ভব সম্পর্কে কাহিনী আছে। সাঁওতালদের পূর্বপুরুষ পিলচু হাড়াম। পিলচু হাড়াম ও পিলচুবুড়ি থেকে সাঁওতালদের উৎপত্তি। সাঁওতালদের গোত্র মোট ১২টি। সাঁওতাল নামটির উৎস সম্পর্কে নানামত প্রচলিত। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে সামন্তপাল থেকে সাঁওতাল। সাঁওতালী ভাষায় মানুষকে হড় বলে। সাঁওতালী কথ্যভাষা আগে লৈখিক কোনরূপ ছিল না। রোমান হরফে এর লিখিত রূপ দেওয়া হলে ও বর্তমানে অলচিকি হরফের প্রবর্তন হয়েছে। ওড়িয়া ও বাংলা হরফেও সাঁওতালী পত্রপত্রিকা ও বই আছে। অলচিকি লিপির উদ্ভাবক রঘুনাথ মুর্মু। অলচিকি সাঁওতালি ভাষার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সমর্থ। রঘুনাথ সিধুকানুকে নিয়ে ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন। বর্তমানে গ্রামীণ যাত্রাপালার অবনতি ঘটেছে নিদারুনভাবে। কিন্তু সাঁওতালী যাত্রা গ্রামীণ জীবনে জোয়ার এনেছে। প্রায়ই সাঁওতালী যাত্রা মঞ্চস্থ হচ্ছে। মেয়েরা এতে অভিনয় করছে। শালুনীর বিনোদ বাস্কে সাঁওতালী নাটক ও গান প্রযোজনা ও পরিচালনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বক্সিডির বৈদ্যনাথ-এর ও নাটকের দল আছে।

সাঁওতাল সমাজে নারীর অধিকার স্বীকৃত। কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ কর্মের প্রকৃতি অনুসারে নির্ধারিত হত। গ্রামীণ জীবনে অভ্যস্ত হলেও সাঁওতালগণ পূর্বের গোষ্ঠীজীবনের রীতিনীতিগুলি বহাল রেখেছে। যথা বিটলে রেয়াম জাতিচ্যুত করা। এটি গোষ্ঠী জীবনের এক চরম শাস্তি। ভিন্নজাতির মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়া ও স্বজনের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলা এ দুটি মস্ত অপরাধ। সমাজে মোড়ল বা মুখ্যা হলেন মাঝি। তিনি সমাজের সর্ব বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন। মাঝিকে নানাকাজে সহায়তা করেন জগমাঝি, পরামাণিক ও কোটাল। জগমাঝি যুবক যুবতীদের অভিভাবক স্বরূপ। তিনি তাদের গতিবিধি নজরে রাখেন। মারাং মাঝি গ্রামের নানা সমস্যা ও অভিযোগ বিচার করেন তিনি গ্রামের শান্তি রক্ষকও বটেন। পুরোহিতের ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করেন লায়া।

সাঁওতালদের বিবাহপদ্ধতির সবিস্তার বর্ণনায় যাচ্ছি না। বিবাহের পর সাঁওতাল রমনীর গোত্র ও পদবী বদল হয়। বৃত্তি অনুসারে সাঁওতাল সমাজে গোত্র বা পদবী নির্ধারিত হয় না।

সাঁওতালদের প্রধান দেবতা মারাং বুরু। তিনি মহাপর্বত, মহাশক্তির ধারক ও সমাজের নিয়ামক। দেবতার কাছে সাঁওতালদের প্রার্থনা রোগমুক্ত সুস্থ জীবন, মড়ক-না আসা, ফসল রক্ষা প্রভৃতি। প্রত্যেক পরিবারে পৃথক দেবতার পূজাও আরাধনা হয়। পূর্বপুরুষের আত্মা ও প্রেতাত্মারাও পূজিত হন। মারাংবুরু ছাড়া অন্যান্য দেবতারা হলেন - পরগনা বোঙা (বোঙা অর্থে দেবতা), সিমবোঙা, দাবোঙা, বীরবোঙা, পাকরিবোঙা, এসব ছাড়া ছোট ছোট অপদেবতা ও বোঙা আছেন। বহু আগে সাঁওতালগণ ছিল প্রকৃতি পূজারী, দেবদেবী ছিল তাদের ধারনার বাইরে। সাঁওতালগণ

গ্রামীণ জীবনে প্রবেশ করার পর প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে দেবতারূপে প্রতীকের মাধ্যমে ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে পূজা করতে শুরু করে। শালগাছকে সাঁওতালগণ দেবতা হিসাবে মান্য করে। শালপাতা পাঠিয়ে খবরাখবর ও নির্দেশ দেবার পদ্ধতিকে শালগিরা বলে।

সাঁওতালদের সবচেয়ে বড় পরব সহরাই বা বাঁধনা পরব। কার্তিক মাসের কালীপূজার দিন থেকে বাঁধনা গোবন্দনা পরব আরম্ভ হয়। সহরাই উৎসবে মোলমদ পান ও মাংসভাত খাওয়ার ঢালাও ব্যবস্থা থাকে। নাচে-গানে সাঁওতালপল্লী প্রানবন্ত ও মুখর হয়ে উঠে। এসময় প্রেমিক প্রেমিকরা মিলিত হয়। বিবাহিত মেয়েরাও পিত্রালয়ে এসে পূর্বতন প্রেমিকের সঙ্গে একান্তে মিলিত হতে পারে। পাঁচদিন ধরে এই উৎসব চলে। সহরাই-এর গানগুলি ভাবোদ্দীপক, সুর, অনুপম ও শ্রুতিমধুর, মনে দোলা দেয়।

সহরাই ছাড়া আছে বাহা, দাঁশায়, লাগাড়ে নাচ, পাতা নাচ, নাটুয়া নাচ, করম নাচ, বিবাহের সময় দং নাচ, ভুয়াং নাচ, শালুই নাচ, সারুল নাচ, সড়পা নাচ, শিকার নাচ, ডান্টা নাচ, লুহুরী নাচ, মাতোয়ার নাচ, গুজার নাচ ও মুগুরী নাচ। সাঁওতালী জীবনের সঙ্গে নাচ-গান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অনুষ্ঠানে গান ও নাচের পরিবেশনা সমান সমান। অধিকাংশ নাচই মেয়েদের সারিবদ্ধ যৌথ নৃত্য। বাজনার মধ্যে রয়েছে মাদল, ধামসা, গুপীযন্ত্র। ঢোলক, বড় করতাল, দেশি বাঁশের লম্বা বাঁশী, কাড়া নাকাড়া। এখানে বলে রাখা ভালো মধ্য বাঁকুড়ায় সবরকম নাচের প্রচলন নাই। তবে পাতা নাচ, দং নাচ, বাহা, সড়পা নাচ প্রচলিত আছে। শিকার নাচে পুরুষেরা অংশগ্রহণ করে। শিকার করে গ্রামে ফিরবার সময় এই নাচের অনুষ্ঠান হয়। এতে কাঁড়া নাকাড়া ও ধামসা বাজে। শিকারে সাঁওতালদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে রয়েছে তীরধনুক, বর্শা, (খেঁচা), কুঠার, টাঙ্গি। তীরধনুক ওদের জাতীয় অস্ত্র বলা চলে। শিকার নৃত্য একপ্রকার রণনৃত্য। এখন বন্যজন্তুর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। শিকার যাত্রায় আর পোষায় না।

বসন্তকালে দোলের সময় বাহা নাচ শুরু হয়। তিনদিনের উৎসব। এটি সাঁওতালদের বসন্তোৎসব। মেয়েরা খোঁপায় পলাশফুল গোঁজে। রঙীন অথবা লালপাড় শাড়ি পরে মামুলী উপাচারে প্রসাধিতা হয়ে যখন মাদলের তালে তালে নৃত্য করে তখন এক অদ্ভুত উন্মাদনার সৃষ্টি হয় যা বর্ণনাতীত। শরৎকালে অনুষ্ঠিত হয় দাঁশাই নৃত্য। নাচের সঙ্গে দাঁশায় সেরেঞ্জ গাওয়া হয়।

পৃথিবীর সবদেশে সব সমাজেই সংস্কার, কুসংস্কার আছে। যা এককালে সংস্কার হিসাবে গন্য হত পরবর্তীকালে তা কুসংস্কার বলে বিবেচিত হয়েছে। সাঁওতাল সমাজে ও সংস্কার ও কুসংস্কার আছে। এসবের মধ্যে ডাইনীপ্রথা প্রধান। এখনও জান ও গুনিনরা ডাইনী চিহ্নিত করে শাস্তির ফতোয়া দেয়। তবে বর্তমানে নানা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, কয়েকটি বিজ্ঞান মঞ্চ ও সরকারের প্রচেষ্টায় ডাইনী প্রথার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চলেছে, সাফল্যও মিলেছে। সাঁওতাল সমাজে জান, গুনিন ওঝাদের অসীম প্রভাব। ঝাঁড়ফুঁক, তেল দেখা, ছাড়াও গাছ গাছড়ার অষুধ দেওয়া তাদের কাজ। অবশ্য সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদের প্রভাব কমছে। গ্রামে প্রাইমারী স্কুলে ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ছে। উচ্চবিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক সাঁওতাল যুবক-যুবতী উচ্চশিক্ষা লাভ করে নানা সরকারী পদে আসীন। মধুবন, কালপাথর, কেঞ্জাকুড়া, সানবাঁধা (পঃ), আঁধারথোল প্রভৃতি হাইস্কুলে এ অঞ্চলের বহু সাঁওতাল ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করছে। কেঞ্জাকুড়া দামোদর বালিকা বিদ্যালয়ে ও পোয়াবাগান বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতনে আদিবাসী মেয়েদের জন্য হস্টেল রয়েছে।

ইংরাজ আমলে সাঁওতালরা দারুনভাবে শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে। জমি থেকে তাদের নির্বিচারে উৎখাত করা হয়েছে। দেশি সুদখোর মহাজনেরা তাদের মানুষ বলে গন্য করত না। স্বাধীনতা প্রিয় নির্ভীক সাঁওতালগণ অসহিষ্ণু হয়ে বীরভূম সিধু কানু, চাঁদ ভৈরবের নেতৃত্বে ইংরাজ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। কালক্রমে অরণ্য সন্তানেরা রুজি রোজগারের সন্ধানে আসামে ইংরাজদের চা বাগানে কুলি মজুরের কাজ করতে গিয়ে দলে দলে গ্রাম ছাড়া হয়েছে। কয়লাখনির বিপজ্জনক গহ্বরে কয়লা কাটা ও কয়লা উত্তোলনের কাজে সাঁওতাল শ্রমিক ছিল অপরিহার্য। ক্রমশ তারা শিল্পশ্রমিকে পরিণত হয়েছে। অত্যাচারিত ও প্রতারিত হয়েছে অহরহ। দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র নিষ্পেষিত সাঁওতালদের মুখের অমলিন হাসি ও প্রাত্যহিক আনন্দময় জীবন কেড়ে নিতে পারেনি কেউ।

এখন তারা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অধিকার রক্ষিত। কিন্তু এখনও অনেক দিক দিয়ে তারা পিছিয়ে। তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আরও বিশেষ সদর্থক পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। অন্যান্য অনগ্রসর উপজাতিদেরও এই উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল করা জরুরী। সম্প্রতি, পঞ্চায়েতের সহায়তায় গ্যাংতোড়াতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চা কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে।

একটি সাঁওতালী কবিতা

কবি সাধু রামচাঁদ মুর্মু (১৮৯৭-১৯৫২)

জৗত জতা

কোল - সাঁওতাল - মাহলে - মুড়া
গারো - কুকি - ভূমিজ কড়া
আবন রেনাঃ হড়ম জিল
মিদুঃ তাবন দিল।
ধিরি হরুৎ বঙ্গা তাবন
সুরু ঘুরু সেবা কবন
নুকু রেনাঃ কামি জারি
উদুগাবন সৗরি
মেনাঃবনা রহায় তিনীঃ
হিজু পেসে বাবন ভিনীঃ
জয় জয়শে আদিবাসী
মনে জিউয়িরে কুশি।

বঙ্গানুবাদ

কোল সাঁওতাল মাহাল মুড়া
গারো কুকি ভূমিজ কড়া
রক্তমাংসের শরীরে মোদের মিল
ধর্মে দেবতা আছেন বৃক্ষ ও শিল
আমরা করি, তাদের উপাসনা
মোরা ভাই ভাই সকলেই একমনা
করি যে সাধন নিত্য দিনের কর্ম
সত্য ও সেবা হয় যে পরম ধর্ম
এসো সবে মনানন্দে, বিচ্ছেদ কভু নয়
বলো এক সুরে জয়, আদিবাসীদের জয়।

সহরাই সেরেঞ (বাঁধনার গান)

তিহিঞ দঃ না দাই না নায়কে দঃ না দাই
উম নাকাল নাড়কা আকাল
অত রেগেঞ গিতিচ আকানো
তিহিঞ দনা দাই জাহের রেগেঞ বঙ্গায়
গপা দঃ নাই বঙ্গায়
দারা হারা চাতম তাড়ারে।

বঙ্গানুবাদ

আজ আমাদের পূজারী স্নান সেরে কাপড় পরে কাচা বিছানাতে ঘুমাবে। আজকে পূজা করবে গ্রাম থানে। আগামী কাল পূজা করবে আমাদের ছোট্ট কুটিরে।

বিয়ের গান (দং সেরেঞ)

১) তাহারেতা রে তারে নানারে
তাহারেতা রে তারে নানারে
হুডিঞে বুরুরে বিঁদিম তাহে কান
মারাং বুরুতে বিঁদিস উচীড়েন
বাই বাইতে বিঁদি তাড়াম মে
তড়ে সুতীম বিঁদি তালাম তপা গা

২) উীর উীরতে বিঁদি তাড়াম মে
সাকাম সাকামতে বিঁদি টুডাংমে
তড়ে সুতীম বিঁদি আলম তপাগা।

বঙ্গানুবাদ

বিন্দা তুই ছিলি ছোট পাহাড় খোঁদলে
বড় পাহাড় পেয়ে তুই গেলি যে চলে
কুনবি জাল আসতে যেতে
যেন, সুতা তোর যায় না ছিটে
দিনে রাতে বুনবি জাল
ভরবে জালে ডালে ডাল
পাতায় পাতায় জুড়বি সুতা
দেখিস যেন সুতা না যায় টলে।

তথ্যসূত্র :

১) রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি : চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত ২) বাঁকুড়া জেলার বিবরণ : রামানুজ কর ৩) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি : বিনয় ঘোষ
৪) রাঢ়ের আলোয় মোলবনা : মেঘদূত ভূঁই ৫) কালিদাস প্রামাণিক, সীমা প্রামাণিক
৬) সুভাষ বাস্কে, হরেকৃষ্ণ সরেন।

ভূমিসংস্কার ও বাঁকুড়া-১

ফটিক গোস্বামী

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা অপরিসীম। শুধুমাত্র উৎপাদনের দৃষ্টিকোন থেকেই নয়, শ্রমিক বাহিনীর একটি বৃহত্তর অংশ এই কৃষিক্ষেত্রের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকালে ইংরেজ সরকার তাদের আয়কে সুরক্ষিত করার জন্য কিভাবে ভূমি রাজস্ব থেকে সরকারি আয় বাড়ানো যাবে সে কথা ভেবে বাংলা ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তো" চালু হয়। সেই সময়ে জমিদার শ্রেণীকে জমির মালিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং সেই সময়ে জমিদার শ্রেণীই রাজস্বের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন। নূতন ব্যবস্থায় জমিদাররা তাদের মুনাফা বৃদ্ধি ও অস্তিত্ব সুরক্ষিত করতে উত্তোরোত্তর খাজনা বাড়িয়েছে। কৃষিতে কোন বিনিয়োগ করেনি। রাজস্বের বোঝা কৃষিজীবিদের একইভাবে আক্রান্ত ও নিঃস্ব করেছে। নূতন ব্যবস্থায় জমিতে ভূ-স্বামী বা রায়তদের নিরঙ্কুশ মালিকানায় আইনানুগ স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে সমাজে দুর্বল শ্রেণীর মানুষের অধিকার বিপন্ন হয়।

ভারতের কৃষক সম্প্রদায়ের ইংরেজ, ভূস্বামী এবং মহাজনদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম তাদের দীর্ঘদিনের লড়াইকে নূতন করে উদ্দিপ্ত করল। 'নীলদর্পন' নাটকে ইংরেজদের কৃষক, পুরুষ ও নারীর উপর অমানুষিক অত্যাচার, খাজনা আদায়ের জুলুম ও মহাজনী শোষন ইত্যাদি বিষয়গুলি ভারতবাসীর ইংরেজদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃনা ও বিতৃষ্ণার সঞ্চার করে। সিধু কানুর নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তীব্র সশস্ত্র আন্দোলন ভারতের বৃহৎ অংশের জনগণের পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রাণ সঞ্চার করেছিল।

১৯৩০-এর দশকে সমগ্র দেশ জুড়ে কৃষকশ্রেণী তার স্বার্থরক্ষার জন্য নূতন আত্মত্যাগ শুরু করে। যে মুখ্য দাবিগুলি ঘিরে কৃষকদের সংগঠিত করা হয়েছিল — সেগুলি হল খাজনা ও ভূমি রাজস্বের পরিমান হ্রাস। জমিদারদের দ্বারা আরোপিত বেগারী, ভিটি, কর্জের পরিমান হ্রাস, ভূ-স্বামী ও মহাজনদের অত্যাচারের অবসান, অবৈধ দখলি জমি উদ্ধার ইত্যাদি। সারা দেশ জুড়ে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবীর ও গুরুত্ব বেড়ে গেল। যুদ্ধোত্তর সংগ্রামগুলির মধ্যে তে-ভাগা আন্দোলন সবচেয়ে জঙ্গী। এইটি বাংলার ভাগচাষীরা সংগঠিত করেছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে তার সূত্রপাত এবং এর সংগঠক কৃষকসভা। বাংলার কৃষক উৎপাদনের সমস্ত ব্যয় নিজেরা বহন করলেও উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক খরচ না দিলে জমিদার জোতদারদের গোলায় তুলে দিতে বাধ্য ছিল। তে-ভাগা আন্দোলনে কৃষকদের দাবী ছিল উৎপাদনের অর্ধেক খরচ না দিয়ে জমিদার-জোতদার পাবে তিন ভাগের এক ভাগ, চাষীর ঘরে উঠবে দুভাগ ফসল। এরই নাম তেভাগা। তে ভাগার দাবির ন্যায্যতা ফ্লাউড কমিশন স্বীকার করেছিল। ১৯৪৬ সালে তে-ভাগা আন্দোলন বাঁকুড়া সহ বাংলার নানা জেলায় শুরু হয়ে যায়।

স্বাধীনতার পর সরকার কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য বিবিধ আইনসংক্রান্ত ব্যবস্থা ও কৃষি সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জমিদারি ব্যবস্থার বিলোপ সাধন, যার মধ্য দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক, মধ্যভোগী শ্রেণী

অবলুপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল ভূমিসংস্কার যার ফলে কৃষকের ভূমি কর্ষণের অধিকার সুনিশ্চিত হবে। তাই বৃহৎ চাষীদের জমির উর্দ্ধসীমার বাইরে যে অতিরিক্ত জমি আছে তা অধিগ্রহণ করে আইনের সাহায্যে তা ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করার ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে ভাগচাষী কর্তৃক প্রদত্ত খাজনার অংশকেও কমিয়ে আনা হয়।

ষাট-এর দশকের মাঝামাঝি যে খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয় তার ফলশ্রুতি ছিল খাদ্যের ব্যাপারে বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি নির্ভরশীলতা। এই নির্ভরশীলতা কাটিয়ে তোলার জন্য সরকার কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি উৎপাদন উন্নয়নে কৌশলের দ্বারস্থ হয় যা পরবর্ত্তীকালে "সবুজ বিপ্লব" নামে চিহ্নিত হয়।

তেভাগা আন্দোলন, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, নায়েক বা লায়েক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ইত্যাদি অসংগঠিত ও সংগঠিত সংগ্রামের নানা ঘটনাবলী কৃষক জাগরণের এক একটি উদাহরণ। ভারতের নিপীড়িত জনগণের মুক্তির প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে কৃষক মুক্তির উপর নির্ভরশীল।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষক শুধু কৃষি উৎপাদনকে বৃদ্ধি করেনি তারা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে অনেক সচেতন। তাই শ্রেণী সংগ্রাম তাদের সচেতনতা ভূমিসংস্কারের কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ভূমি সংস্কারের প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গের গৃহীত পদক্ষেপকে একটি আদর্শ হিসাবে চিহ্নিত করে অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও কৃষক জনমানসে কিছুটা ভূমিসংস্কারের সম্ভাবনাকে তুলে ধরে ভূমি ভিত্তিক কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৩ সালে জমিদারী অধিগ্রহণ আইন ও ১৯৫৬ সালে ভূমি সংস্কার আইন পাস হয়। কিন্তু জমিদাররা যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পাওয়ার ফলে স্বনামে ও বেনামে অনেক জমি লুকিয়ে ফেলে। অবশিষ্ট যেটুকু জমি পাওয়া গেল তাও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন না হওয়ার ফলে জমিদারদের সে জমি নিজ দখলেই রয়ে গেল। ভূমিহীন কৃষকদের জমি পাওয়ার আশা অপূর্ণ থেকে গেল। কৃষি উৎপাদনের কেন্দ্রীভূত মালিকানার ফলে প্রতি বৎসর ক্রমাগত খাদ্য সংকটের ফলে সাধারণ মানুষ জর্জরিত হতে থাকল।

গ্রামে ও শহরে ক্রমবর্ধমান খাদ্যাভাব গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশের ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৬৭ সালে এক নূতন যুক্তফ্রন্ট সরকার জন্ম নিল। সেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন কৃষক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা হরেকৃষ্ণ কোনার। একদিকে কৃষক আন্দোলনের চাপ অন্যদিকে প্রশাসনিক চাপে জমিদ্দারদের লুকানো উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধারের কাজ শুরু হয়। ১৯৬৭ হইতে ১৯৬৯ সালের এই স্বল্পকালিন সময়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবাংলায় প্রায় ছয় লক্ষ একর জমি উদ্ধার করেন।

১৯৬৯ সালের আগষ্ট মাসে ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোনার পরিবার ভিত্তিক সিলিং সীমার যে আইনি খসড়া করেন তা দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের পতনের ফলে আইনে পরিণত করা যায়নি।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় বামফ্রন্ট সরকার। এই সরকারের আমলে জমির প্রশ্নটিকে গুরুত্বের সঙ্গে সামনে নিয়ে আসা হয়। সংগঠিত কৃষক আন্দোলন, ভূমি সংস্কার কার্যকরী করার পক্ষে বামফ্রন্ট সরকারের আন্তরিক প্রয়াস, ইত্যাদির ফলে গ্রামাঞ্চলে উদ্বৃত্ত জমি বিলি, বর্গাদারদের নাম নথিভূক্ত করা কাজের একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরী হয় এবং ভূমিহীন কৃষক, গরীব কৃষক সহ একটি গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে ১৯৭৮ সালে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা গিয়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গঠিত হয়। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে গ্রামের মানুষের হাতে ক্ষমতা এবং অর্থ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের কাজে বন্টিত হয়। সেই সময়েই ভূমি সংস্কারের কাজে বাঁকুড়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় জোয়ার সৃষ্টি হয়। বর্গাদাররা চাষ করা জমির ধান নিজ খামারে তোলার অধিকার অর্জন করেন। উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের মধ্যে বিলিবন্টনের কাজে গতি আসে। যে সমস্ত মৌজায় কে.বি. সেটেলমেন্টের কাজ শেষ হয় সেখানে "অপারেশন বর্গা" আইনের বলে বর্গাদারদের চাষের জমি তাঁদের নামে নথিভূক্ত করার সুযোগ আসে।

১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার

অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে তেমন কোন শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছিল না। যতদূর মনে পড়ে পচিরডাঙ্গা ও জামবনী গ্রামে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে সরকারে ভেষ্ট জমির দখলের আন্দোলন শুরু হয়। সেই সময়ে বাঁকুড়া ১নং J.L.R.O. অফিসে প্রশাসনিক উদ্যোগে উদ্বৃত্ত জমির পাট্টা তৈরী হলে তা সব পাট্টাদারদের হাতে পৌঁছায়নি এবং জমি চিহ্নিত করার কাজও অগ্রগতি হয়নি। ১৯৭৫-৭৬ সালে বিচ্ছিন্নভাবে কৃষক, ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত হওয়া এবং ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠার পর গরীব কৃষক, মাঝারি কৃষক এবং ক্ষেতমজুর ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভূমিসংস্কারের দাবীতে, খাদ্যের দাবীতে পঞ্চায়েত অফিসে Deputation দেওয়ার আগ্রহ দেখা গেছে। সুদূর গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে বাঁকুড়া শহরে বাঁকুড়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতি অফিসে, বাঁকুড়া ১নং J.L.R.O. অফিসে বর্গাদার রেকর্ডের দাবীতে, খাসজমি বিলি করার দাবীতে কৃষক ক্ষেতমজুর সহ গণতান্ত্রিক মানুষের সংগঠিত মিছিল শহরবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

১৯৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালিত হত বামপন্থীদের নেতৃত্বে এবং ২টি পরিচালিত হত দক্ষিণপন্থীদের নেতৃত্বে কিন্তু কৃষক আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছিল ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই। জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতি বামপন্থীদের নেতৃত্বে পরিচালিত হত। ভূমি সংস্কারের কাজের ক্ষেত্রে শ্রেণী সংগ্রামে সচেতন কৃষক একদিকে যেমন জমির আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল পাশাপাশি মজুরীর আন্দোলনেও পিছিয়ে ছিল না। বাঁকুড়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় পঞ্চায়েত কর্মকর্তাদের তৎপরতায় এবং প্রশাসনিক সহযোগিতায় ১৯৭৮-১৯৮৭ সালের মধ্যে জমিদারদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত জমি বের করে।

যতদূর জানা যায় বাঁকুড়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় যে কয়জন বড় ভূস্বামী ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বাঁকুড়া শহর থেকে গ্রামে এসে জমিদারী পত্তন করেন। বাঁকুড়া শহর নিবাসী সারদাপ্রসাদ দত্ত মহাশয় তিনি বৃটিশ আমলে একজন সাবজজ ছিলেন। শুনুকপাহাড়ী গভীর জঙ্গল কেটে জমিদারী ষ্টেট তৈরী করেন এবং তাঁর জমিদারী ব্যবস্থাকে রক্ষনাবেক্ষন করার জন্য ঐ এলাকার সামন্তদের দিয়ে বসতি স্থাপন করেন এবং শুনুকপাহাড়ী, জামবনী, পুরুণ্ডিহি চেলেমা ইত্যাদি মৌজাগুলি নামে মাত্র মূল্য দিয়ে কিনেছিলেন। চাষীদের চাষ করিয়ে সাজা-খাজনা তাঁর নিজস্ব সেরেস্তায় আদায় নিতেন বর্তমানে তাঁর বংশধরেরা বাঁকুড়া শহরে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবসা বানিজ্য চাকুরী ইত্যাদিতে যুক্ত আছেন তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো অংশীদার তাঁদের জমিদারী ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য জমিদারী ট্রাষ্ট থেকে দূর্গাপূজা, জমিদারী এষ্টেট কে টিকিয়ে তাঁদের আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। বর্তমানে তাঁদেরই জায়গার উপর শুনুকপাহাড়ীতে প্রতি সোমবার বাসুলী হাট বসে সেখান থেকে তাঁদের জমিদারী আয়ের মত কিছু আয়কে সুনিশ্চিত করেছেন।

রাজগ্রাম নিবাসী রামদাস কুণ্ডু মহাশয় কালপাথর অঞ্চলের লাঙ্গলবেড়া গ্রামে ব্যবসা করেন। লাঙ্গলবেড়া, গাংতড়া, ধগড়িয়া, নিমডাঙ্গা ইত্যাদি কয়েকটি মৌজা নিয়ে তাঁর জমিদারী ছিল বর্তমানে তাঁর সরকার অধিগ্রহণের পর অবশিষ্ট যা ছিল বসতবাটী সহ জমিদারী ষ্টেট সমস্তই তাঁর বংশধরেরা বিক্রী করে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কেও কেও বিদেশে চাকুরী নিয়ে থাকেন বাকীরা রাজগ্রামে নিজের পূরাণ বসতবাটীতে ফিরে গেছেন।

কালপাথর অঞ্চলের আদি জমিদার বলতে কালপাথর গ্রামের 'বাগ'দের নামই বিশেষভাবে শোনা যায় তা ছাড়াও নেকড়াগড়্যা, কাশীবেদিয়ার গোয়ালা (মণ্ডল), কুস্তরার মাহিষ্য মণ্ডল, মনোহরপুরের পাৎসা, ছাতনার দেঘড়িয়া (গোঁসাইডি অঞ্চলে), ভগবানপুরের কৈলাস মণ্ডল, কাপিস্টার মজিদ মিদ্যা, নুতনগ্রামের সামসুজোহা খান, দামোদরপুরের রায়, জগদল্লার চৌধুরীদের নামও শোনা যায়। এদের বেশীর ভাগ সিলিং বহির্ভূত জমি সরকার অধিগ্রহণ করে চাষযোগ্য জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করেছেন অবশিষ্ট যা পতিত জমি হিসাবে পড়ে আছে তা জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, পঞ্চায়েত অপিস ইত্যাদি সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজের জন্য রক্ষিত আছে।

কেঞ্জকুড়া অঞ্চলে কর্মকার, পাৎসা, কুণ্ডু ইত্যাদি কিছু স্থানীয় জমিদার ছিলেন তাঁদের সিলিং বহির্ভূত বেশীরভাগ জমি পাট্টা বিলি করে ভূমিহীন কৃষকদের দখলে আছে। কিছু মামলা পাট্টাবিলির কাজকে আটক করে রেখেছে। জমিগুলির বেশীরভাগই ভূমিহীনদের দখলে আছে।

পাতাকলা, দামোদরপুর এবং আগয়ার মধ্যস্থিত যে সমস্ত অকৃষি জমি দীর্ঘদিন ধরে অকৃষি জমি ছিল তা দীর্ঘদিন পড়ে থাকার পর বর্তমানে সেই জায়গায় কয়েকটি বেসরকারী বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে বাঁকুড়া শহরের বসতি বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঁকুড়া শহরের পশ্চিমদিকে আঁচুড়ি অঞ্চলের লাগোয়া আয়লাকুন্দি মৌজায় উদ্বৃত্ত জমির উপর সরকারী বাসষ্ট্যাণ্ড, প্রতীক্ষালয়, ফায়ারব্রিগেড ও অন্যান্য সরকারী অফিস নির্মিত হয়েছে। অবশিষ্ট যা আছে তা ভূমিহীন বস্তিবাসিদের গৃহনির্মাণ, বাজার ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। সব অঞ্চলেই ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে পাট্টা বিলি করা হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে পাট্টাদার এবং বর্গাদারদের স্বার্থরক্ষায় ক্ষেতমজুর এবং গরীব কৃষকদের সঙ্গে বহু গণতান্ত্রিক মানুষ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় অনেকেই নানা মিথ্যা মামলায় আসামী হতে হয়েছিল এবং কারাবরণও করতে হয়েছিল। কাগজ কলমে উদ্বৃত্ত জমি সরকারী খাতায় নথীভুক্ত হলেও অনেক বৃহৎ জমির মালিক স্বেচ্ছায় জমি থেকে বেদখল হতে চাননি, ফলে বর্গাদার গরীব কৃষকদের সঙ্গে তারা সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কালপাথরে বাগেদের বিরুদ্ধে কৃষকদের ভূমি ও শষ্য দখলের লড়াইয়ে জেলা আরক্ষাধ্যক্ষকে হস্তক্ষেপ করতে হয়।

আশির দশকে কিছু বৃহৎ জমির মালিকেরা বাইরে থেকে গুণ্ডাবাহিনী বোমা, পাইপগান ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বর্গাদার পাট্টাদারদের জমিতে আক্রমন করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরও পিছু হটতে হয়েছিল। আন্দারথোল, জিয়ারবাদা, কেশাডোবা, তরিবতরডিহি, ভগবানপুর ইত্যাদি মৌজার পাট্টাদার এবং বর্গাদারদের দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হয়েছিল। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বসহ পাট্টাদার ও বর্গাদারদের মধ্যে ৪৪ থেকে ৬৮ জনকে ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী করে মামলা রুজু করা হয়েছিল। এতে কারো কারো জেল ও জরিমানাও হয়। সেই সময় এই এলাকার বড় জমির মালিকদের মধ্যে কেউ কেউ খুবই প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধিও ছিলেন। তারা প্রশাসনিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি আদায় করতেন। তরিবতরডিহি, ভগবানপুর এবং ফেগুয়াকানালী মৌজায় জঙ্গলের জমি দখল করে রেখেছিলেন। সেখান থেকে ঐ সমস্ত বড় জমির মালিকদের উচ্ছেদ করে স্থানীয় মানুষ স্বেচ্ছাশ্রমে সামাজিক বনসৃজন করে বনভূমিকে রক্ষা করেছেন। একেও ভূমিসংস্কার কাজ হিসাবেও গণ্য করা যায়। নতুনগ্রাম, বনকাটার আমসুজোহাখান সন্নিহিত পাহাড়পুর, তাড়িরতড়ডিহি এলাকায় উদ্বৃত্ত জমি খাস হওয়া থেকে আটকাতে দেবোত্তর দেখিয়ে জ্যেষ্ঠ বংশধরদের মোতোয়ালী নিয়োগ করে।

১৯৮০ সালের জুলাই মাসে মোলবনা গ্রামের দক্ষিণ দিকে দ্বারকেশ্বর নদীর ''পুলকির-দ'' এর নিকট এক গাছতলায় আন্দারথোল, কালপাথর, কেঞ্জেকুড়া ও আঁচুড়ি এই চারটি অঞ্চলের ক্ষেতমজুরদের নিয়ে একটি বৃহৎ সমাবেশ হয়। সেই সমাবেশে জমিদারদের সীলিংএর বাইরের উদ্বৃত্ত জমির পাট্টার দাবী, বর্গাদারদের অপারেশন বর্গা আইনে রেকর্ড করানো, গ্রামে গ্রামে মজুরীর আন্দোলন বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সেই দাবী পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

বাঁকুড়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভূমিসংস্কার স্থায়ী সমিতির সভা ডেকে প্রশাসনকে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এবং ১৯৮১ সালের অক্টোবর নভেম্বর মাসে কুমিদ্যা বটতলা এবং কাপিষ্ঠা সমবায় সমিতি প্রাঙ্গণে সহস্রাধিক পাট্টাবিলির আয়োজন করা হয়। সেই সময়ে পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়।

এই সময় থেকেই পাট্টা জমির অধিগ্রহণ। পাট্টাদারদের কাছে জমি চিহ্নিতকরণের কাজের ধারাবাহিকতা শুরু হয়। কিন্তু সব পাট্টাদারদের জমি চিহ্নিতকরণ এখনো করা যায়নি।

উদ্বৃত্তজমি চিহ্নিত করে, তা খাস ঘোষণা করে ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টনের পাশাপাশি, ভাগচাষীদের স্বার্থরক্ষার আন্দোলন্য এসময় দানা বাঁধে। ইংরেজ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী-ক্ষণস্থায়ী সহ বিবিধ ভূমিনীতি ও পরিশেষে প্রজাস্বত্ত্ব আইনে ভাগচাষীদের চেয়ে, মালিকদের স্বার্থরক্ষাই লক্ষিত ছিল। এক জমির বহুবছরের ভাগচাষীদের ভূমিস্বত্ত্ব আটকাতে এই সময় ১-২ বছরের জন্য ভাগচাষী নিয়োগ ও তাদের তারপর উচ্ছেদের ঘটনা বহুগুণিত হয়। জঙ্গলমহল বাঁকুড়াতে কৃষিজমি সম্প্রসারণে বাউরী-বাগদী-রায় ও উপজাতিদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকলেও, আইনী অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে স্বল্প সময় ব্যবধানে ভাগচাষী উচ্ছেদ চলতেই থাকে। অন্যান্য অংশের মত বাঁকুড়ার কৃষকদের তেভাগার মত ভূমি আন্দোলনে সক্রিয় যোগদান ছিল। ''অপারেশন বর্গা''র মত ভূমি সংস্কার কর্মসূচী ও আন্দোলনের ফলে এই

ব্লকে ভাগচাষীদের স্বার্থরক্ষা সম্ভব হয় ও ২৯১৯ জন বর্গাদারকে নথিভূক্ত করা হয়।

জমিদারদের শ্রেণী চরিত্র এক হলেও ব্যক্তি চরিত্রের কিছুটা ফারাক দেখা গেছে। এর মধ্যে তাদের সামাজিক অবস্থানও কিছুটা কাজ করে। বর্তমানে জমি বিভাজনের ফলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে জমিদার "জমিদার-পরিবারে" পরিণত হয়েছে। কোন কোনো জায়গায় জমিদার, পাট্টাদার এবং বর্গাদারদের সঙ্গে সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছে। সরকারকে দেওয়া উদ্বৃত্ত জমি নিজ দখলে রাখার জন্য আইনের আশ্রয় নিয়ে আটকের চেষ্টা করা হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকারের শুভ উদ্যোগে সেইসব মামলা বেশীর ভাগই খারিজ হয়েছে এবং সেইসব জমি বেশীর ভাগই পাট্টাদারদের দখলে এসে গেছে।

১৯৭৭ সালের পূর্বে দেশের জরুরী অবস্থাকালীন পঞ্চায়েতের প্রধানদের ক্ষমতা হ্রাস করে গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক একজন করে বিধানসভার সদস্যাদের একজন প্রতিনিধিকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়ায়, প্রতি অঞ্চলেই কোন কোন মৌজায় রাতারাতি উদ্বৃত্ত জমি বেনামী করে এক একজনের নামে তিন চার একর করে জমির পাট্টা লেখা হয়েছিল। সেই পাট্টার জমি বেনাম জমি হিসাবে অন্য ব্যাক্তির দখলে ছিল। কিন্তু ১৯৭৮ সালের পঞ্চায়েত গঠনের পর JLRO Office থেকে সেই তথ্য বের করে সেইসব পাট্টা বাতিলকরে ভূমিহীন কৃষকদের বিলি করে দখল নেওয়া হয়েছে।

পাট্টাদার এবং বর্গাদারদের হাতে পাট্টা তুলে দেওয়া, জমি চিহ্নিত করে দখল রাখার কাজও যেমন হয়েছে তেমনি ঐ জমি কিভাবে চাষযোগ্য করা যায় তারও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার আইন পাশ করে তপশীলি ও তপশীলি আদিবাসী পাট্টাদারদের যে সুযোগ করে দিয়েছিল বাঁকুড়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাগণ পাট্টাদারদের স্বার্থেই তা ব্যবহার করেছেন। চাষের অনুপযোগী উদ্বৃত্ত জমিগুলি মাটি কাটিয়ে চাষোপযোগী করে দেওয়া হয়েছিল এবং পাট্টাদার ও বর্গাদারদের চাষের জন্য উন্নতমানের বীজ ও সার সরবরাহ, I.R.D.P. প্রকল্পে ঋণের মাধ্যমে তাদের আর্থিক সাহায্য এই সবই এলাকার ভূমি সংস্কারের কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

জমিদারী অধিগ্রহণ ও ভূমি সংস্কার আইন চালু হওয়ার সময়ই সমস্ত রকমের ফাঁক ফোকর বন্ধ করে আইন কার্যকরী করলে যে পরিমাণ জমি সরকারের হাতে আসত এবং ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টনকরা যেত, তার থেকে বর্তমানে খাসজমি ও বন্টিত জমির পরিমান কম। এরজন্য সেই সময়ের সরকারের সদিচ্ছারও অভাব ছিল আবার কৃষকের সচেতনতারও অভাব ছিল।

ভূমিসংস্কার আইনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংশোধনীর সতর্ক প্রয়োগের মাধ্যমে ধনী কৃষকের একাংশের দখলীকৃত জমি থেকে বামফ্রন্ট সরকার বেশ কিছু উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধার করতে পেরেছে। কৃষিজমি এবং অকৃষি জমির চরিত্র বর্ণনায় যাহা রায়তের খতিয়ানভূক্ত ছিল তা দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভূমি সংস্কার বিলে আনীত সংশোধনীতে "LAND" এর ব্যাখ্যায় সীলিং বহির্ভূত জমিকে রায়ত খতিয়ানে সীলিং এর হিসাবে অন্তর্ভূক্তির সঙ্গে একটি ভালো অংশের জমি বাঁকুড়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার B.L.R.O. দপ্তরের উদ্বৃত্ত জমি হিসাবে ১নং খতিযানভূক্ত হয়েছে। তার অনেকাংশই ইতিমধ্যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি হয়েছে এবং বিলির কাজ চলছে। এখানে বাঁকুড়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমিসংস্কার স্থায়ী সমিতিকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে যাতে উদ্বৃত্ত জমির তালিকা ভূমিহীন কৃষকের গোচরে আসে।

বর্তমানে ধনী কৃষক পরিবারগুলি দ্বিধাগ্রস্থ। উন্নতমানের কৃষি জমিকেও অকৃষি খতিয়ানভূক্ত করে নিজ দখলে চাষবাস করছিলেন। যে মুহূর্তে বাস্তুভিটে, খামার বাড়ি, পুকুর ইত্যাদি অকৃষি জমি যাহা "LAND" এর সজ্ঞার বাইরে ছিল তা হিসাবের মধ্যে আসায় তাদের ভালো জমিও ছাড়তে হচ্ছে। যদিও বর্তমান ধনী কৃষকের বেশীরভাগ অংশই আদালতের দ্বারস্থ পাট্টাগুলি সরকারী লাল ফিতায় আটকে গেছে। আবার অনেক ধনী কৃষক বড় জমির আইনগুলি উদ্বৃত্ত জমি হিসাবে চিহ্নিত করতে চাইছেন। কোথাও বা এক ডেসিমেল, দু-ডেসিমেল করে বিভিন্ন দাগে জমি ছেড়ে দিতে চাইছেন যাতে ভূমিহীন কৃষকদের চাষের অসুবিধা ভাবিয়ে জমি দখলের দিকে অনীহা সৃষ্টি করা যায়।

বর্তমান কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির কথা ভেবেই অল্প পরিমাণ জমি হলেও তার মূল্য আছে এটা ভূমিহীন কৃষককে ভাবাতে হবে। কারণ কৃষি বিকাশের আন্দোলনই আজকের দিনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভূমিসংস্কারের সাফল্য, কৃষি বিকাশের মধ্য দিয়ে আসবে।

কৃষিতে পুঁজির অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার, পুরানো সহজাত প্রয়োজনভিত্তিক পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্কগুলি সংকুচিত হয়ে আসছে। এই সম্পর্কগুলি কৃষকদের স্বতঃ প্রনোদিত উদ্যোগ। একে ধরে রাখতে হলে উৎপাদনের সংরক্ষণ এবং বিপণন এর কাজে কৃষি সমবায়গুলিকে কাজে লাগাতে হবে। প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে গ্রুপ গঠন করে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

বাঁকুড়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় গরীব কৃষক ভূমিহীন কৃষকদের আন্দোলন-এর ফলে বর্গাদার রেকর্ড এবং ভেষ্ট জমি বিলির প্রসার ঘটেছে। সেখানে পঞ্চায়েত এবং প্রশাসনের সহযোগিতা খুবই প্রসংশনীয়।

ভূমি সংস্কার আন্দোলন সবচেয়ে বেশী যেখানে দানা বেঁধেছিল, সেই আঁধারথোল ও কালপাথর অঞ্চলে ভূমি সংস্কার নিম্নরূপ ঃ-

অঞ্চলের নাম	রেকর্ডভূক্ত বর্গাদার-এর সংখ্যা	রেকর্ডভূক্ত জমির পরিমাণ (একর)	রেকর্ডভূক্ত পাট্টাদার-এর সংখ্যা	রেকর্ডভূক্ত জমির পরিমাণ (একর)	কোর্ট কেস	মোট ভেষ্ট জমির পরিমাণ
আন্দারথোল	৫৪৭	২৯০.৮৭	৭১৫	২০৭.৫৩	৪৫.৫৭	২৫৩.০৯
কালপাথর	২০২	১১১.৮৪	৮৭৮	৩১৮	৩৯.২৮	৩৮৩.১৩

(মন্তব্য ঃ- খাস জায়গার ৯৯নং কালপাথর মৌজায় কালপাথর গ্রাম পঞ্চায়েতকে ২.৭০ এ ৯৯ নং কালপাথর মৌজায় জওহর নবোদয় বিদ্যালয়-এর জন্য ২৫.৮৫ এ দেওয়া আছে।)

সমগ্র ব্লকে এ পর্যন্ত খাস ঘোষিত জমির অনেকটাই ৩০১৩ জন ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বন্টিত হয়েছে।

খরাপ্রবণ বাঁকুড়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় মাইক্রো ওয়াটারশেড এর কাজগুলি জমির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জমির চরিত্রের ও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এলাকার গরীব কৃষকদের জমির বেশীরভাগ জমিই অনুর্বর পতিত জমি। বর্তমানে এই প্রকল্প কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিরও সাহায্য করেছে। অকৃষি জমিতে মাটি কাটিয়ে জমিগুলি কৃষি উপযোগী করা ও সামাজিক বনসৃজনে ভূমিসংস্কার এর কাজকে অনেক এগিয়ে দিয়েছে।

২০০৩-০৪ সাল হতে রাষ্ট্রীয় কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রীয় শ্রমবিকাশ যোজনায় মাইক্রো ওয়াটারসেড এর কাজগুলি শুরু হয়। কালপাথর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় বি.ডি.-৩, বি.ডি.-৪ ওয়াটার শেড এর শুভ সূচনা ঘটে। পরবর্তীকালে প্রশাসনিক সহযোগিতায় ও বাঁকুড়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার জনগণের অবাধ অংশগ্রহণ ও চাহিদার ফলে মাইক্রো ওয়াটার সেড কমিটিগুলি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে আসছে। ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বেশ কিছু চেকড্যাম এবং পুকুর খনন হয় যার ফলশ্রুতি হিসাবে অনেক এক ফসল জমিকে দুফসলা জমিতে রূপান্তর করা সম্ভব হয়েছে। ফলবাগান তৈরী, কাজুবাদাম, ভেরেণ্ডা, অর্জুন, আমলকি ইত্যাদি গাছ সামাজিক বনসৃজন এর আওতায় আনা এবং ভূমিহীন SGSY গ্রুপকে রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব দেওয়া আগামী দিনে গরীব কৃষক পরিবারগুলির আরও আর্থিক উন্নতি ঘটবে।

গরীব কৃষকদের ভূমিবন্টন এবং ভূমির প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটানো, ভূমি থেকে উৎপাদন বৃদ্ধি করা, এসবই ভূমি সংস্কারের সাফল্য।

তথ্যসূত্র ঃ ১) বাঁকুড়া-১ সমষ্টি উন্নয়নকরণ

২) বাঁকুড়া-১ ভূমি ও ভূমি সংস্কারকরণ

ঐতিহ্যবাহী শিল্প ঃ বাঁকুড়া ব্লক-১

মধুসূদন চ্যাটার্জী

বাঁকুড়ার পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত জেলার ক্ষুদ্রতম ব্লকগুলির মধ্যে অন্যতম এই বাঁকুড়া ১নং ব্লক। ২০০১ এর জনগণনা অনুসারে ব্লকে ১৭,৪২১র মতো পরিবার বাসকরেন। এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকাই কৃষি। কিন্তু কৃষির হাল অত্যন্ত খারাপ। কোন বড় সেচ নেই। বিগত ২০-২৫ বছর ধরে পঞ্চায়েত ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের উদ্যোগে সেচের খানিকটা সুরাহা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। সম্প্রতি কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে ও জলবিভাজিকা কর্মসূচীতে অসেচ এলাকাগুলিতে সেচের জন্য জলাশয় নির্মাণ করে ১নং ব্লক কৃষির ক্ষেত্রে খানিকটা মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। এই প্রচেষ্টা কতটা বাস্তবায়িত হবে তা আগামী দিন বলবে।

ব্লকের বহু জায়গা আছে যেখানে ৩-৪ বছরে একবার ভাল চাষ হয়। বৃষ্টির জলেও অনেক জায়গায় চাষ হয় না। কারণ উঁচু নিচু অনুর্বর জমি। জীবিকার প্রধান উৎসের এই করুণ অবস্থার ফলে অধিকাংশ কৃষক, কৃষিশ্রমিক অকৃষি শ্রমিকে পরিণত হয়েছেন। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁরা নানা পেশার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন।

কৃষির পাশাপাশি ব্লক এলাকার একটি অংশ জুড়ে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পেরও অবস্থান আছে এবং তা আধুনিক নয়। প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন। এরমধ্যে যেগুলি উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল, বাসন, তাঁত এবং বাঁশের তৈরী নানা সামগ্রী।

ব্লকের কেঞ্জাকুড়ায় বাসন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন ৩০০ পরিবার। বর্তমানে জেলার নানাস্থানে কেঞ্জাকুড়ার বাসন সরবরাহ করা হয়। কোন সমবায় সমিতি না থাকলেও এই বাসন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু মানুষ আর্থিক দিক থেকে অত্যন্ত স্বচ্ছল। এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত কোটিপতি মানুষও কেঞ্জাকুড়ায় আছেন। কিন্তু ৭৮ সালের আগে কেঞ্জাকুড়ার এই অবস্থাটা ছিল না। এর প্রাধান কারণ সেই সময়কার বাংলা তথা জেলার আর্থিক অবস্থা। মানুষের বাড়িতে খাবার সংকট। সহজে খাদ্যদ্রব্য মিলতো না। মিললেও লুকিয়ে চুরিয়ে নিয়ে আসতে হোত। সেখানে কাঁসার বাসনে খাওয়া বিলাসিতা মাত্র। কেঞ্জাকুড়ার কাঁসার বাসন শিল্পীদের তখন পায়ের তলায় মাটি ছিল না। ইঁদুর আর আরশোলার রাজত্ব ছিল শালঘরগুলি। অধিকাংশ পরিবারই বিহারে চলে গিয়েছিলেন। স্রেফ পেটের দায়ে। বর্তমানে কেঞ্জাকুড়ার কর্মকার পরিবারের ২৫-৩০ বছরের যারা যুবক তাদের একটা বড় অংশের জন্ম বিহারের নানাপ্রান্তে। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর, বিশেষ করে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা পূর্ণ মাত্রায় চালু হওয়ার মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার বুকে যে অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটল তার ভেতর থেকেই মাথা তুলে দাঁড়ালেন কেঞ্জাকুড়ার বাসন শিল্পীরা। আগে খেতমজুরের বাড়িতে বিয়েবাড়ি হলে কেউ জানত না। এখন প্যান্ডেল করে বিয়ে হয়। পাত্রপক্ষকে দান দেন। দানে কাঁসার থালা, বাটি, গ্লাস, ঘড়া থাকবেই। ৭৮ সালের আগে এটা ছিল না। বহু সম্পন্ন পরিবারও কাঁসার বাসন দিতে পারতেন না। বর্তমানে কেঞ্জাকুড়ার বাসন শিল্পীরা উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুর, পাঞ্জাবের জলেশ্বর, বিহারের নওয়াদার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রীর গুনগত মান বজায় রেখে চলেছেন। এখানে থালা, বাটি, গ্লাস বেশি তৈরী হয়। এর কাঁচামাল তামা, রাং মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ থেকে কলকাতা হয়ে সরাসরি কেঞ্জাকুড়ায় চলে আসে। এছাড়া গুজরাটের বন্দরে পরিত্যক্ত জাহাজগুলির কাটা অংশ (তামা) লরিতে করে সরাসরি কেঞ্জাকুড়ায় চলে আসে। বর্তমানে কেঞ্জাকুড়ায় ২৪৮টি শালঘর (কাঁসার বাসন তৈরীর

ঘর) আছে। যেখানে মাল তৈরী হয়। রোলিং মিল আছে ৪টি। এগুলি সবই বেসরকারি মালিকানাধীন। নানা কারণে এই শিল্পে কোন সমবায় করা যায়নি।

ভেঙ্গেপড়া কাঁসাশিল্প উঠে দাঁড়ালেও মহাজনী শোষণ এখনও অব্যাহত আছে। মহাজন কাঁসা শ্রমিকদের এক কেজি পঞ্চাশ গ্রাম কাঁচামাল দিয়ে ১ কেজির তৈরী সামগ্রী নেন। যার জন্য মজুরী দেন ৪৫ টাকা। একটি পরিবার যদি সবসময় বিদ্যুৎ পান তাহলে দিনে ৫০ কেজি পর্যন্ত জিনিস তৈরী করতে পারেন। ফলে তাদের রোজগার ২ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে বলে বহু কারিগর জানান। কিন্তু বাস্তবে সেটা হয় না। মহাজনের বাজারের চাহিদার উপর তাদের কাজ করতে হয়। শোষনের সময়টা হল বর্ষাকালের আষাঢ়-ভাদ্র মাস। তখন চাহিদা কম থাকায় কম পয়সার মজুরীতে কাজ করতে হয়। ২০ টাকা কেজি মজুরীতেও অনেকে কাজ করেন। সবচেয়ে সমস্যায় পড়েন তাঁরা — যাঁরা জিনিসপত্রগুলি তৈরী হয়ে যাওয়ার পর পালিস করেন। তাদের ৩ টাকা, ২ টাকায় কাজ করানো হয়।

এই বাসন শিল্পকে তুলে ধরার জন্য সরকারি বিভাগ থেকে কারিগরদের বেশ কয়েকবার ঋণও দেওয়া হয়েছে। মানুষের আধুনিকতার চাহিদায় কাঁসার বাসনপত্রের কদর বেশ খানিকটা কমলেও এর সামাজিক কদর এখনও বলবৎ আছে। বিয়ে এবং নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে কাঁসার বাসনেরই দাপট বেশি। যদিও তা এক'দুবার ব্যবহার করার পর বাক্সবন্দী হয়ে যায়। তাহলেও এটা চলছে চলবে। কেঞ্জাকুড়া ছাড়াও হেলনা শুশুনিয়াতে ১৫০টি পরিবার বাসন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এঁদের অবস্থা কেঞ্জাকুড়ার মতো অতটা সচ্ছল নয়। সামগ্রিকভাবে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের আধুনিক জিনিসপত্র তৈরী করার প্রশিক্ষণ দেওয়া একান্ত জরুরী। থালা বাটিতে বেশিদিন চালানো যায় না। পশ্চিমবাংলার মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। বছরে ২০ হাজার কোটি টাকার পণ্য সামগ্রী এখানে বিক্রি হয়। এর মধ্যে কাঁসার সামগ্রীও আছে। কিন্তু যা ইস্পাতের বা ফাইবারে চাহিদা মেটায় সেই স্থান দখল করতে হবে কাঁসাকে। আর দুঃস্থ, অর্থনৈতিক দুর্বল কারিগরদের বাঁচানোর জন্য সমবায় তৈরী করাটিও জরুরী।

কাঁসার পর ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প হল তাঁত। ৩০০ বছরের পুরনো তাঁত শিল্প আজ আক্ষরিক অর্থেই মুখ থুবড়ে পড়েছে। সর্বভারতীয় বস্ত্রনীতি এবং সেই প্রচারে মানুষের মিশে যাওয়ার ফলেই তাঁদের আজ এই অবস্থা। কেঞ্জাকুড়ায় ৩৫০ তাঁতি পরিবার আছেন। ৮২ সালে এখানে ৫২৮টি তাঁত ছিল। বর্তমানে ১৩০-এ গিয়ে ঠেকেছে। গামছা ছাড়া তাঁতের কোন জিনিসই আর গৃহস্থের বাড়িতে আসেনা। কেঞ্জাকুড়ার কিছু তাঁতি শিল্পী বালুচরি তৈরী করলেও প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে পারছে না। তাঁতের কাজের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ শিল্পীই হয় লটারির টিকিট বিক্রি, না হয় কৃষি ও অকৃষি শ্রমিকে পরিণত হয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন। কেঞ্জাকুড়ায় মাকুর ধক ধক আওয়াজ, বা ঢাল তৈরীর আগে পুন্নিকাড়ার - একটানা মৃদু স্বর ভেসে আসে না। কেঞ্জাকুড়ার আর একটি আকর্ষণীয় হস্তশিল্প বাঁশের তৈরী সামগ্রি। এর সুনাম রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে আছে। ছান্দারেরর শিল্পী উৎপল চক্রবর্তীর শিষ্য সুধাংশু ত্রিনেত্রী কর্মশালা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই শিল্পের সূচনা করেন। বর্তমানে এমন ১৪টি কর্মশালায় ১৫০টি পরিবার জড়িত।

তাঁত, বাসন ছাড়াও এই ব্লকে দেউরা, শুনুকপাহাড়ী এলাকায় প্রায় ১৬টি পাথর ভাঙ্গার কল আছে। যুক্ত আছেন সহস্রাধিক মহিলা পুরুষ শ্রমিক। এছাড়া - জামবনী, পাতাকলা, গোড়াবাড়ি, বাঁশি, মনাডিহি প্রভৃতি গ্রামে বিড়ির কাজের সঙ্গে যুক্ত বহু কারিগর আছেন। আছে কেঞ্জাকুড়ার চালকল, তেলকল। অসংগঠিত ক্ষেত্র হিসাবে জগদল্লা-১ গ্রামপঞ্চায়েতে ১২টির মত পাথর ক্রাশার শিল্প গড়ে উঠেছে। এর সাথে ৪০০ পরিবারের জীবিকা জড়িত। পুরানো দামোদরপুর - দামোদরপুর এলাকার খাদান থেকে নুড়ি পাথর সংগ্রহের কাজে এলাকার কিছু পরিবার জড়িত আছেন।

ভারী শিল্পের মতো জায়গা ব্লকে আছে। বর্তমানে যাতায়াত সহ পরিকাঠামোরও উন্নতি হয়েছে ব্যাপক। এখানকার মানুষও সহজ সরল। দক্ষ শ্রমিকের অভাব নেই ব্লকের ৬টি অঞ্চলে। শহর লাগোয়া এই ব্লকেও আধুনিক শিল্প হতে পারে। উত্তর বাঁকুড়া জুড়ে যদি বড়, ভারী, শিল্পের উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে, দক্ষিণ পশ্চিম অংশের ব্লক-১ উপেক্ষিত থাকবে কেন?

তথ্যসূত্র ঃ ১) সমষ্টি উন্নয়ন করণ ঃ বাঁকুড়া-১ ২) জেলা শিল্প কেন্দ্র ঃ বাঁকুড়া ৩) সেনসাস প্রতিবেদন ঃ ২০০১

বনের কথা ঃ বাঁকুড়া-১

নির্মল চক্রবর্তী

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল গ্যাসট্রেলের বাঁকুড়া বৃত্তান্ত থেকে দেখা যায় অষ্টাদশ শতকের বাঁকুড়া ছিল মূলত গভীর অরণ্যাবৃত এক ভূমিখণ্ড। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া নামক জনপদকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়া জেলার সৃষ্টি হয় যা "জঙ্গলমহল" নামেই খ্যাত ছিল।

জেলা শহর বাঁকুড়া সন্নিহিত বাঁকুড়া-১ ব্লকের বন এলাকা সঙ্কোচনের প্রাথমিক কারণ জনপদের সম্প্রসারণ। মফস্বল থেকে সম্প্রসারিত শহরে পরিণত হওয়া ও শহরবৃত্তের স্বাভাবিক আগ্রাসন বাঁকুড়া-১ এর গ্রামীণ এলাকার অরণ্য সম্পদের উপর প্রভাব ফেলে। পাশাপাশি এই এলাকার নব্য ভূস্বামীদের চাষ এলাকা বৃদ্ধির নিয়ত প্রয়াস আঠারো শতকের "জঙ্গলমহল" নেহাতই স্মৃতিকথা হয়ে দাঁড়ায়। বাঁকুড়া-১ ব্লকের মোট এলাকা ১৮১৩০ হেক্টরের মধ্যে ১৯৪৪-৪৫ সনে বনভূমি দাঁড়ায় ২৩৭৯.৪ হেক্টর, যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১২৯৯ হেক্টরে।

বাঁকুড়া-১ ব্লকের মাঝবরাবর প্রবাহিত দ্বারকেশ্বর নদ। ব্লকের সীমান্তদেশের উচ্চ বনভূমি থেকে সৃষ্ট ও বনের বর্ষাজল পুষ্ট ১০টি বড় জোড় এই দ্বারকেশ্বরে মিশেছে। এই ব্লকের মধ্যাঞ্চলের নিম্নদেশ বরাবর প্রবাহিত নদী ও ব্লকের প্রান্তিক উচ্চ বনভূমি বরাবর বনভূমির অবস্থান ও তার ক্রমিক ক্ষয় সময়ের সাথে দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছে ব্লকের কৃষি মানচিত্রে; ভূমি, জল ও উর্বরতা সংরক্ষণের নিরিখে।

বাঁকুড়া-১ ব্লকের চিহ্নিত বনমৌজা ও বন এলাকার (একরে) বিবরণ নিম্নরূপ।

গৌরীপুর-৫৫	২৫৪.৩২	মুড়ারডি-৭৯	১৯.৫০	চিংড়া-১০৮	২৮০.৩২
আঁচুড়ি-৫৬	২৪৮.৩৪	উড়িয়ামা-৮০	১৫০.৯৯	ভালুকবাসা-১০৯	২.৫৭
ধোবারগ্রাম-৫৭	১৩.২৮	পচিরডাঙ্গা-৮২	৪.৬৪	হেতাশোল-১১০	৩৭.০২
ধুলকুমারী-৬০	১৪৩.৭৪	পাথরাডি-৮৪	৪৫.৮৪	আনন্দপুর-১১১	১৬২.৩৬
কেশাডোবা-৬১	৩০.৬৩	ভোলা-৯৫	২৪.৮৩	কুস্তরা-১১২	২১৯.৩৯
নিদয়া-৬২	৬২.৮৭	কাঁটাকুলি-৯৬	১১.০৬	খেঁকড়িযারা-১১৩	২৬.৭৭
পাপুরডি-৬৩	৬২.৮৩	ধুলাডি-৯৭	৮.০১	নেকড়াগোড়া-১১৪	২৭২.৫১
দেবীপুর-৬৪	১০৬.৬৬	কালপাথর-৯৯	৬৫.৫৩	পাথড়াকাটা-১১৫	৩৮.৩৩
বোহারাডি-৬৫	১৪৮.৬৪	রাঙ্গামেট্যা-১০০	৯৪.৩৭	গাংতোড়া-১১৬	৬৮.২০
নোয়াডি-৬৬	১৫৮.০৭	জামবেদিয়া-১০৩	১৩.৯২	ধগড়িয়া-১১৭	৪২.৮৪
বোলারডি-৬৫	১৪	পোড়াশোল-১০৪	২.৮৪	বনচিংড়া-১১৮	২৫.২৬
জলহরি-৭৪	১০.৫৬	বড়বাগান-১০৫	১৫২.৫৭	নাঙ্গলবেড়া-১১৯	২২১.৭৮
কাপিষ্টা-৭৬	১৭.৬৫	কাশিবেদ্যা-১০৬	০.৫০	ছেন্দুয়া-১২০	১৩৮.৮৩
দামড়াগড়িয়া-৭৭	৭০.১৮	বড়বেদ্যা-১০৭	৩৩.২৫	দিনারগ্রাম-১২৪	৪৫.৯৮

ডাবর-১৪০	১১১.৯৫	সেগুনসাড়া-১৪৭	২৩.৩৭	ঝড়িয়া-১৭৪	২৮.০৯
চিকচিকা-১৪১	৬৯.৮৩	ভালুকগাসের-১৪৮	৩০.০২	মাকড়কেন্দ-১৭৫	৮৯.০৫
পোড়ামৌলি-১৪২	৪৯৬.৪৪	চতুরডি-১৫৬	২.৭১	আগয়া-১৮৬	২৪
ধোবারগাঁ-১৪৩	৭৬.৯৬	সুপুরডি-১৫৭	২৫.৩৫	দধিমুখা-১৮৯	২৬.৬৫
চেলেমা-১৪৪	২৩.১৭	তরিবতড়ডি-১৫৯	৯৮.৮৭	চকজগদল্লা-১৯৫	৪৪৬.০৫
নয়াবাদি-১৪৬	৪.৭১	ভাতুড়ি-১৭৩	২১	জগদল্লা-১৯৬	৪১.৬৮

বনদপ্তর অধিকৃত এই বনভূমির কোন কোন অংশ সন্নিহিত এলাকার কৃষক কৃষিজমি হিসাবে (যেমন কাশিবেদ্যা, আগয়া মাজুরিয়া বনভূমি) দখল করলেও চিহ্নিত বনভূমির অর্ধাংশের কিছু কম এলাকা এখন বনবর্জিত (৪৮%, ২৪৯৫.৭২ হেক্টর বনভূমির ১১৯৬ হেঃ পতিত বনভূমি)।

পোড়ামৌলি, ভালকগাঞ্জার, ধোবারগ্রাম প্রভৃতি মৌজায় কিছু পুরানো শাল গাছ থাকলেও বাঁকুড়া-১ ব্লকের বনাঞ্চল মূলত রোপিত ও নবসৃষ্ট। জেলার মোট এলাকার ২০.৪ শতাংশ বনভূমি হলেও বাঁকুড়া-১ ব্লকে শতাংশের হিসাবে তা নগণ্য, যদিও এক তৃতীয়াংশ অংশে বনভূমি কাঙ্খিত ছিল। ১৯৪৪-৪৫ এ মোট ব্লক এলাকা ১৮১৩০হেঃ এর ২৩৭৯.৪ হেঃ ছিল বনভূমি যা শতাংশে ১৩.১৩। ২০০৬-০৭ এ এই বননিবিড়তা কমে দাঁড়িয়েছে ৭.১৭ শতাংশে অর্থাৎ ১২৯৯ হেক্টরে। ব্যক্তিমালিকানাধীন বনভূমির পরিমাণ নগণ্য। কোন কোন তোড়া এলাকায় পলাশ, পুটুশ, বনকুলের ঝোপঝাড় থাকলেও হেক্টরের হিসাবে তা অকিঞ্চিৎকর। বনদপ্তর অধিকৃত এলাকা শতাংশের হিসাবে ১৩.৭৭ হলেও ব্লকের মোট বনভূমি মাত্র ৭.১৭% হওয়া খুবই উদ্বেগের বিষয়।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের গ্যাসট্রেল বর্ণিত 'জঙ্গলমহল' বাঁকুড়া উপনিবেশিক শাসনের কালবেলায় ১৩ শতাংশে দাঁড়ায়। ইংরাজ প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থা ও সাধারণ মানুষের চেতনায় বনসম্পদের গুরুত্বহীনতা এর জন্য দায়ী। এই সময়ে নব্যভূস্বামীদের বনকে কৃষিজমিতে পরিবর্তনের প্রয়াস ও তাগিদ, এই প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে। সাতের দশক পর্যন্ত এই প্রবণতা অব্যাহত থাকে। এই সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ বনরক্ষা সমিতি তৈরীর সিদ্ধান্ত বনভূমি সংরক্ষণে ভীষণভাবে সহায়ক হয়। পঞ্চায়েতের সহায়তায় বনবাসী ও বনসন্নিহিত মানুষ ও বনদপ্তরের যৌথ নজরদারি বননিধন যজ্ঞে ছেদ টানে। আটের দশক থেকেই বনভূমির পরিমাণ বাড়তে থাকে। নয়ের দশকে সরকারি উদ্যোগে পঞ্চায়েত কর্তৃক সামাজিক বনসৃজন কর্মসূচী শুরু হওয়ায় এই প্রক্রিয়া আরতও জোরালো হয়। বর্তমানে বাঁকুড়া-১ ব্লকে বনভূমির পরিমাণ ৮ শতাংশের কিছু বেশী।

এই বনভূমির মৃত্তিকা রেড-ল্যাটেরাটিক। ছোটনাগপুর মালভূমি (আর্চিয়ান-ধর্ম্বীয়ান প্রস্তর স্তর) সৃষ্ট এই মাটির ৯০ শতাংশ নিস-এনথ্রোসিট ও ১০ শতাংশ এ্যলুভিয়াল-ল্যাটেরাইট। গ্রামপঞ্চায়েত ওয়ারী মৃত্তিকা-শৃঙ্খল এইরূপ—

১) আঁচুড়ি ও কেঞ্জাকুড়া অঞ্চলের বনাঞ্চলঃ লোহামারীরঙ্গ শৃঙ্খলার (লিথিক উস্ট্রোচেপ্ট স) এই কাঁকর-বালি মিশ্রিত এই গভীর মাটির ভূমিঢাল ৩-১০%।

২) জগদল্লা-১ অঞ্চলের বনভূমির কাঁটাবন-দয়ালপুর (হেপ্লাকোয়েপ্ট স্) শ্রেণীভূক্ত এই এঁটেল-দোঁয়াশ অগভীর মাটির ভূমিঢাল ০-৫%।

৩) জগদল্লা-২ অঞ্চলের বনভূমির ভুলনপুর-তালডাংরা (উদিক হেপ্লাসটাফ) শৃঙ্খলাভূক্ত ল্যাটেরাইট উপরিস্থিত বেলে-এঁটেল-দোঁয়াশ এই মাটির ভূমিঢাল ১-৫%।

৪) আঁধারথোল অঞ্চলের বনভূমির কেসে-রামসাগর শৃঙ্খলার অতি গভীর বেলে, এঁটেল, দোঁয়াশ (উদিক হেপ্লাসটাল্‌ফ ও ভার্টিক হাপ্লাকোয়েপ্ট স্) এই মাটির ঢাল মূলত ৩-৫%, কোন অংশে ১-৫%।

৫) কালপাথর অঞ্চলের বনভূমির ফুলকুসুমা-ভুলানপুর (প্লিন্থাসটাক্স) মাঝারি-গভীর ল্যাটেরাইট ক্ষয়িত বেলে, এঁটেল, দোঁয়াশ এই মাটির ঢাল ১-৫%।

মাটির চরিত্র আম্লিক (৫-৬.৫ পি.এইচ)। নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম, ফসফেটের পরিমাণ মাঝারি থেকে খারাপ যথাক্রমে .০৩-.০৬ শতাংশ, ২০-৫০ কেজি/হেঃ, ২০০-২৫০ কেজি/হেঃ। পোড়ামৌলি, চিকচিকা, চিংড়ি বনভূমির কোন কোন অংশে অভ্রর আধিক্য আছে।

বনভূমিতে গড় বৃষ্টিপাত ১৩০০ মিমি। তাপমাত্রা সর্বাধিক ৪৫° সি. থেকে সর্বনিম্ন ৭° সি.। আপেক্ষিক আদ্রতা সর্বাধিক ৯৪%, সর্বনিম্ন ৪০%। উপক্রান্তীয় উপআর্দ্র এই জলবায়ুতে এই বনশ্রেণী চিরহরিৎ প্রকৃতির।

বাঁকুড়া-১ ব্লকের প্রাচীন বনভূমির প্রায় সবটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত। বর্তমান বনভূমি বনদপ্তরের উদ্যোগে সৃষ্ট ও রোপিত। গেজেটিয়ার্স থেকে জানা যায় প্রাচীন বনভূমিতে গামার, শাল, সেগুন, মেহগনী, জারুল প্রভৃতি মূল্যবান গাছের আধিক্য ছিল। তাছাড়া বট, অশ্বথ, অর্জুন, কয়েত, বেল প্রভৃতি বৃক্ষের অস্তিত্ব ছিল।

বাঁকুড়া ব্লকের বনৌষধি এক ঐতিহাসিক সত্য। বনভূমিতে নিম, আমলকী, বেল, বহড়া, হরিতকী, পিপুল, অশ্বগন্ধা, ইত্যাদি গাছের সম্পৃক্ততা বাঁকুড়া-১ ব্লকে ঐতিহাসিক বাণিজ্য কেন্দ্র ও বাণিজ্য নদীপথের সৃষ্টি করে। 'দত্ত' পদবীধারী তন্তুবায় ও 'কুণ্ডু' পদবীধারী তাম্বুলিরা রাজগ্রামে এই ব্যবসাকেন্দ্র পত্তন করেন। বিশ শতকের শুরুতে কেদারনাথ কুণ্ডু ও বিপিনবিহারী দত্ত হরিতকী, বহেড়া, আমলকি, লাক্ষার বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৮৮১ সালের সেনসাস প্রতিবেদনে দেখা যায় দ্বারকেশ্বর নদের এই বাণিজ্য পথে ৮৭ জন নৌবাসী নিয়োজিত ছিল। মেদিনীপুরের ঘাটাল প্রভৃতি শহর পর্যন্ত নৌপথেই বাণিজ্য চলত।

বৃক্ষ, গুল্ম, ঝোপঝাড় পরিবৃত এই বনভূমিতে আরও ছিল ডুমুর, ভেরেণ্ডা, আলকুশী, ধুতরা, স্বর্ণলতা, মনসা, সজিনা, বাবলা, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, অর্জুন, রাধাচূড়া ও বিভিন্ন রকমের ঘাস। ফলের গাছের মধ্যে ছিল আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, আঁশফল, বনকূল, আতা, বিভিন্ন ধরণের লেবু ইত্যাদি। কোন কোন অরণ্যে মহুয়া, কেন্দু, ডোমশাল, পিয়াশাল, পিপুল, জিয়ল, তাল, খেজুর, শেওড়া, তেলাকুচা, ডাকাতি, বনবেগুন, বনওল, বনকচু, হলুদ প্রভৃতি গাছ দেখা যেত।

উপরোক্ত বনবৃত্তান্তর সাথে বনবাসী পশু পাখীদের ভাগ্যবিবর্তন ঘটেছে সমান্তরালভাবে। বনাঞ্চলে বনবিড়াল ও চিতাবেড়াল সহজেই চোখে পড়ে। বড় একটা চোখে পড়েনা শেয়াল ও খেঁকশেয়ালদের। সন্নিহিত জনপদের হাঁস-মুরগি ছিল এদের প্রিয় খাদ্য। গ্রামবাসীদের স্বাভাবিক বিরূপতা ও বনধ্বংসের কারণ, এই প্রজাতির বিনাশ ডেকে আনে। আগেকার বনাঞ্চলের ভাম, কটাশ, গন্ধকূল একই কারণে নগণ্য হয়ে পড়ে। বনশূয়োর আগে দেখা গেলেও, এখন অবলুপ্তির পথে। বনমধ্যেকার জলাশয়ে মাছখেকো বা বেজি ভোঁদর অনেকাংশে দেখা যেত। জনপদে ও বনমধ্যে নেউল এখনও দেখা যায়। অরণ্যে নেউলের সংখ্যাধিক্য সাপের বংশবিস্তারে বাধা হয়ে দাঁড়াত যেহেতু সাপ নেউলের প্রিয় খাদ্য। বাঁকুড়া-১ ব্লকের বনাঞ্চলে সজারু, খরগোসের সংখ্যাধিক্য লক্ষণীয়। পোড়ামৌলি-ধোবারগ্রাম বনাঞ্চলে এখনও বহুসংখ্যক সজারু-খরগোস দেখা দেয়। ভালুকগাঞ্জার প্রভৃতি এলাকার কিছু দুষ্কৃতির নির্বিচার সজারু-খরগোস নিধন এদের অস্তিত্বের সংকট ডেকে এনেছে। বাঁদর ও হনুমান বনাঞ্চলের বাসিন্দা হলেও, অরণ্যে খাদ্য অপ্রতুলতার কারণে প্রায়ই এরা জনপদে হানা দেয়। বন ও বনের বাইরে কাঠবিড়ালের অবাধ অস্তিত্ব থাকলেও, এরাও চোরাশিকার কবলিত। নেংটি ইঁদুর, ধেড়ে ইঁদুর, মাঠ ইঁদুরের সংখ্যা এখনও যথেষ্ট। কখনও কখনও এরা শষ্যের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাদুর ও চামচিকার সংখ্যা দিন দিন কমছে। তক্ষক, গিরগিটি, বিভিন্ন ফড়িং, ঝিঁঝি, প্রজাপতি, মথ, জোনাকি সহ বিভিন্ন কীটপতঙ্গ, জোঁক প্রভৃতি বনমধ্যে দেখা যায়। সাপের প্রজাতির মধ্যে আছে হেলে, ঢোঁড়া, কেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়া, ধেমনা, পুইনে প্রভৃতি। কিছু প্রজাতি লুপ্ত হলেও জলাশয়ে সিংগি, মাগুর, বোয়াল, রুই, কাৎলা, মৃগেল, কালবোস, পুঁটি, বাঁশপাতা, চিংড়ি, ল্যেটা,সোল, ট্যেংড়া, দাড়কা ইত্যাদি এখনও অনেক পরিমাণে দেখা দেয়। বনভূমিতে কচ্ছপ ছাড়াও, প্যাঙ্গোলিনের অস্তিত্ব আছে, যদিও প্যাঙ্গোলিন লুপ্তপ্রায়।

সঙ্কুচিত বনভূমির সাথে, কৃষি শষ্যে ব্যাপক হারে রাসায়ণিক সার ও কীটনাশকের প্রয়োগ পাখীদের বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিছু প্রজাতি লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় হলেও এই ব্লকের বনাঞ্চলে এখনও পানকৌড়ি, কোকিল, বৌ কথা কও, বিভিন্ন চিল, শকুন, পাপিয়া, ময়না, বক, চন্দনা, কাঠঠোকরা, কাক, চড়ুই, টিয়া, বিভিন্ন প্যাঁচা, ছাতার, বুলবুল, ক্যানরী, নীলকণ্ঠ, শামুকখোল, কাদাখোচা, টুনটুনি, নীলকণ্ঠ, বাবুই বিভিন্ন শালিখ, ফিংগা ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

আটের দশকে বনবাসী ও বনরক্ষীদের যৌথ বনরক্ষা সমিতি গঠন বন সংরক্ষণ ও পতিত বনভূমি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। কিছুক্ষেত্রে বনসন্নিহিত বসতির বনভূমি ধ্বংসের ভূমিকা, বনভূমি রক্ষার উপলব্ধিতে রূপান্তরিত হয়। বনবাসী ও বনসন্নিহিত মানুষজন বনভূমিকে আপন সম্পদ ভাবতে শুরু করায় বন সংরক্ষণে ও সম্প্রসারণের কাজ দ্রুততর হয়। এই অংশিদারিত্বকে সংহত করতে বিক্রিত বনসম্পদের এক চতুর্থাংশ বনরক্ষী গ্রাম পরিবারের মধ্যে বন্টিত হয়। বনদপ্তর সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়ন ও জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নেয়।

অতীত সময় থেকেই বন এলাকায় মানুষের জীবন-জীবিকা ও এলাকার অর্থনীতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হত বন ও বনজ সম্পদ দ্বারা। গ্রামীণ এলাকার জ্বালানীর অনেকটাই আসে এই বন থেকে। বনের ফল, শাক, পাতা অনেকাংশেই এইসব মানুষদের পুষ্টির সহায়ক ছিল। বন থেকে সংগৃহীত মাছ-মাংস এদের খাদ্যতালিকার আবশ্যিক অংশ ছিল। এইসব জনপদের প্রয়োজনীয় পশুখাদ্যের প্রায় সবটাই যোগান দেয় এই বনভূমি। বন থেকে সংগৃহীত মধু, ব্যাঙ-ছাতা, শালপাতা, লাক্ষা, নিম-মহুয়া-করঞ্জ বীজজাত তেল মানুষের চাহিদা পূরণ ও রোজগারের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেয়। জ্বালানী কাঠ, আসবাব কাঠ ও পশুখাদ্য গাছ ছাড়াও, অন্যান্য বনজ সম্পদ থেকে এই সন্নিহিত জনবসতির আয় বেশ কয়েক লক্ষ টাকা। বনৌষধি এই আয়ের একটি বড় উৎসমুখ। চিংড়া-বনচিংড়া বনভূমির অর্জুন গাছ থেকে তসরের চাষ আরেক আয়ের উৎস।

বাঁকুড়া-১ ব্লকের বনভূমি বন-প্রশাসনিক বিভাজনে বাঁকুড়া দক্ষিণ বনবিভাগের অন্তর্ভূক্ত। ওন্দারেঞ্জ, ছাত্না রেঞ্জ, লোকপুর রেঞ্জ, ইন্দপুর রেঞ্জে বিভক্ত এই মোট বনভূমি। ওন্দা রেঞ্জভূক্ত ওন্দাবীট, লোকপুর রেঞ্জের লোকপুর ও বাঁকুড়া বীট, ছাত্না রেঞ্জের ছাত্না বীট, ইন্দপুর রেঞ্জের ইন্দপুর ও চিংড়া বীট মোট বনভূমিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

লোকপুর রেঞ্জের প্রতিবেদনে দেখা যায় ২০০২ সালে জগদল্লা-চকজগদল্লায় ২৫ হেঃ বনসৃজন করা হয়েছে। ২০০৪-এ মাকড়কেন্দি-চকজগদল্লায় ২০ হেঃ, ২০০৫ সালে দধিমুখা-চকজগদল্লা-মাকড়কেন্দিতে ৭৫ হেঃ, ২০০৬ সালে চকজগদল্লা-জগদল্লায় ৪০ হেঃ, ২০০৭ সালে ৫০ হেঃ বনসৃজন করা হয়েছে। অন্যান্য রেঞ্জেও একইভাবে বনভূমি পুনরুদ্ধারের কাজ হয়েছে।

বনদপ্তর খতিয়ানভূক্ত সমস্ত বন এলাকায় বনসৃজিত হলেও, ব্লক এলাকার বনভূমি ১৪-১৫ শতাংশ দাঁড়াবে। তাই সরকারী জমি-খাস জমি ও ব্যক্তি জমিতে বনসৃজনের কর্মসূচী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনা সহ বিভিন্ন জলবিভাজিকা কর্মসূচীতে ব্যাপক বনসৃজনের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। মূলত তোড়া-বাইদ জমিতে এই বনসৃজন হাতে নেওয়া হয়েছে।

২০০৫-২০০৬ অর্থবর্ষে মূলত কালপাথর, আঁধারথোল, জগদল্লা-২ এবং আঁচুড়ি, কেঞ্জাকুড়া, জগদল্লা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু অংশে ব্যাপক বনসৃজন করা হয়। এই বর্ষে শিশু, অর্জুন, গামার, সোনাঝুরি রোপিত হয়েছিল ৩৫২৫৮৬, আমলকি গাছ ২৩৬০০, জাট্রোফা ৪৯০০, করঞ্জি ৫০০, আম ১০২০০, কাজুবাদাম ১৩৩০০, বাঁশ ২১০০, সর্বমোট ৪৫১২৮৬ টি বৃক্ষরোপন করা হয়। ২০০৬-০৭ অর্থবর্ষে শুধুমাত্র করঞ্জি গাছ বসান হচ্ছে ৩ লক্ষের মত। ২০০৫-০৬ আটবর্ষে প্রায় ৪০০ হেক্টর বনভূমি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। ২০০৬-০৭, ০৭-০৮ আরো ৬০০ হেক্টর সামাজিক বনসৃজনের লক্ষমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই বনসৃজনে আমলকি ইত্যাদি ঔষধি গাছের উপর যেমন জোর দেওয়া হয়েছে, তেমনই বায়োডিজেল উৎপাদনকারী ভেরেণ্ডা-করঞ্জ গাছ বসানোর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই বনসৃজনের সাথে সাথে জল ও মাটি সংরক্ষণেও গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে যেহেতু সামাজিক বন এবং

বনদপ্তরের বন উচ্চ টাঁড়-বাইদ এলাকায় অবস্থান করে, এই অঞ্চলে জলভরন নিশ্চিত করতে পারলে কানালী-সোল এলাকায় জলক্ষরণের মাধ্যমে দু-তিন বার ফসল ফলানো নিশ্চিত করা যাবে। তাছাড়া বনভূমিতে জলাভূমি সংস্কার, গালিপ্লাগিং, কন্টুর ট্রেঞ্চিং-বাইন্ডিং ও ভেজিটেটিভ হেজিং-এর মাধ্যমে ভূমিক্ষয় রোধ ও জলসংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

বিভিন্ন বনসৃজন-বনসংরক্ষণ এবং জল মাটি সংরক্ষণের কর্মসূচী রূপায়ণে বাঁকুড়া ব্লককে শষ্যশ্যামলা, অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এক ভূখণ্ডে পরিণত করা যাবে, আর ফিরিয়ে আনা যাবে হারানো বন ও তার জৈব বৈচিত্র। হয়ত আবার দেখা যাবে আকাশে শঙ্খচিল।

তথ্যসূত্র ঃ

১। বাঁকুড়া দক্ষিণ বনবিভাগ
২। সমষ্টি উন্নয়ণ করণ ঃ বাঁকুড়া-১
৩। বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার্স - ও'ম্যালী
৪। লোকপুর ফরেষ্ট রেঞ্জ ঃ বাঁকুড়া

গ্রামীণ উন্নয়নে সমবায় ও স্বয়ম্ভরগোষ্ঠী

সুবিত পাল

" যদি তুমি এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে আসতে পার যেখানে প্রত্যেকের ঋণ পাওয়ার অধিকার থাকবে ও যেখানে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা থাকবে - তাহলে আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিতে পারি যে দারিদ্র্য বেশিদিন থাকবে না।"— মুহাম্মদ ইউনুস।

বাঁকুড়া ১নং ব্লকের অধীনে সমবায়

শহর এলাকা বাদে গ্রামীণ এলাকার জনসংখ্যা, পুরুষ - ৪৯০৮৩, মহিলা - ৪৬৭৫৭, মোট - ৯৫৮৪০, পেশার দিক থেকে বেশীরভাগই কৃষিজীবি, কৃষকের শ্রেণীবিন্যাসে আমরা দেখতে পাই।

বর্গাদার	পাট্টাদার	ক্ষুদ্রকৃষক	প্রান্তিক কৃষক	মোট কৃষিতে যুক্ত
২৯১৯	৩০১৩	৩৩০০	৭৩৭২	১৬৬০৪

কৃষি বাদে বেশীরভাগই কৃষিশ্রমিকও ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে নিয়োজিত।

বাঁকুড়া ১নং ব্লকে ২০৫টি সমবায় সমিতির জন্ম হলেও গ্রামীণ এলাকায় প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমিতি, মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি, 'ল্যামস্' সমিতি ও তন্তুবায় সমিতিগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়ণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এছাড়াও আছে কর্মচারী ঋণদান সমিতি ও অন্যান্য সমবায় সমিতি।

বর্তমানে আমরা দেখতে পাই ব্লকে প্রতিষ্ঠানিক ঋণ হিসাবে কৃষিকার্য্যের জন্য আসে নিম্নরূপ ঃ-

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	উপকৃত কৃষক	টাকার পরিমাণ (লক্ষে)	মন্তব্য
১।	সমবায় সমিতি	১১	১১৪৭	৮৭.২২	মোট চাহিদার ৬%
২।	বাণিজ্যিক ও গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	৬	৪১৯	২৭.২১	

ব্লকের ৯৭০০ হেক্টর জমি কৃষিকার্য্যের জন্য প্রয়োজন প্রায় ১৭ কোটি টাকা। এছাড়াও প্রয়োজন কৃষির উন্নয়ন, উন্নত যন্ত্রপাতি, আচার অনুষ্ঠান, বাড়ীনির্মাণ ও ভোগ্যপণ্য প্রভৃতির জন্য বার্ষিক প্রায় আরও ৪৩ কোটি টাকা। এই ক্ষেত্রেও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের যোগান খুবই নগণ্য। এইসব ক্ষেত্রে বেশীরভাগই আসে কৃষকদের মধ্য থেকে বাকী মহাজনদের মাধ্যমে। এই ঘাটতি পূরণে সমবায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যদিও ১৫০টি মৌজার মধ্যে ৬৯টি মৌজায় কোন কার্য্যকরী সমিতি নাই। প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমিতির সদস্য সংখ্যা যেখানে বর্তমানে ৭৬৫৩ সেখানে কর্জ গ্রহণকারী সদস্যসংখ্যা ২৯৮৭। কৃষকদের স্বল্প সুদে (৭%) টাকার যোগান দেওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন কারণে তা পৌছানো যাচ্ছে না। এই দুর্বলতা না কাটালে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর নয়। কৃষি সমবায়গুলির হাল হকিকত এইরূপ, বেলিয়া (বন্ধ), কালিবেদিয়া (বন্ধ), গ্যাংতোড়া (বন্ধ), ফেঙ্গাবাসা, কলাবতী, আঁধারথোল, নতুনগ্রাম (চালু) মোলবোনা (চালু), কেঞ্জাকুড়া (বন্ধ), মনোহরপুর (বন্ধ), কাপিষ্টা (চালু), বাদুল্যাড়া (চালু), জগদল্লা (চালু), বাঁশী (চালু)

জামবনী (চালু), শুনুকপাহাড়ী (চালু), ভাগাবান্ধ (চালু)।

একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র কর্জ দাদন ও আদায় করেই তাদের কার্য্য সমাধা করে না। কৃষির উন্নয়ন, সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ, সমবায় শিক্ষা ও সচেতনতায় একটি সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এলাকায় অবস্থিত বাঁশী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর কর্মধারার মাধ্যমে আমরা এলাকার উন্নয়ণে সমবায়ের ভূমিকা উপলব্ধি করতে পারব যদিও এই বিষয়ে আত্মতুষ্টির অবকাশ নেই। সমগ্র এলাকাতে এইরূপ কর্মধারার প্রসার ঘটলে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব একথা অনস্বীকার্য্য। কর্মধারা ঃ-

মোট মৌজা	সদস্য সংখ্যা	ঋণী সদস্য	দাদনকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	আদায়	সঞ্চয়ী আমানত (টাকা)	সার ব্যবসা (টাকা)	ধান্য ..... (টাকা)	অন্যান্য ব্যবসা (টাকা)
৭	১০১৭	৪০৩	২৭.৮৫	৯৮%	৮৯.১০	১৩৬.২৮	৯৬.৩৮	২.৭০

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন	মোট সদস্যা	গোষ্ঠীর জমার পরিমাণ (টাকা)	গোষ্ঠীর দাদনের পরিমাণ (টাকা)	আদায়ের হার	সমিতির নীট লাভ (টাকা)
৪২	৩২৭	৯.১৩	১৪.৮৪	১০০%	৩.১৮

সমিতির ব্যবসার জন্য আছে ৩৫০ মেঃ টনের গুদাম, অফিসঘর। এছাড়াও আছে 'সমাজসদন' - কৃষি আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অবসর সময় বিনোদনের জন্য। সমিতি তার নীট লাভ থেকে প্রতি বৎসর কৃষি প্রতিযোগিতা, দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের আর্থিক সাহায্যদান, কৃষি আলোচনা চক্র, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, সমিতির সদস্যদের শৌচাগার নির্মাণের জন্য এককালীন ৫০০.০০ টাকা আর্থিক সাহায্যদান প্রভৃতি কাজ করে আসছে। এলাকায় গঠিত ফার্মাসক্লাব বিভিন্ন সময়ে কৃষি আলোচনাচক্র, উন্নত প্রথায় মৎস্যচাষ, পশুপালন, অকৃষি ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধির উপায় প্রভৃতি আলোচনা ও কার্য্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে। সরকারি সহযোগিতা পেলে সমিতি চাষের কাজে সেচ ব্যবস্থা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করতেও সক্ষম।

৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে অকার্য্যকরি সমিতিগুলিকে কার্যকরী করা এবং কার্য্যকরী সমিতিগুলির বাধাগুলিকে দূর করে আরও বেশী কার্য্যকরী করা গেলে এলাকার অর্থনৈতিক মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে এ কথা অনস্বীকার্য্য। প্রাথমিক কর্তব্য হিঁসাবে নিজস্ব অফিসঘর, গুদামঘর ও তৎপর পরিচালন কমিটি ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। এলাকায় অবস্থিত মোলবোনা, ফেঙ্গাবাসা, ভাগাবাঁধ ও জগদল্লা গোড়াবাড়ি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি সহ আরও দু-একটি সমিতি বর্তমানে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ও এলাকার উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যদিও মানুষের চাহিদা আরও অনেক বেশি।

স্বয়ম্ভরগোষ্ঠী, গোষ্ঠীগুলির কাজকর্ম ও ভবিষ্যৎ

ব্লকের ৪৬৭৫৭ জন মহিলার, প্রাপ্তবয়স্ক ৩১,২৮৩ জনকে গোষ্ঠীর আওতায় আনা গেলে মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব তা গোষ্ঠীগুলির কর্মধারা লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাই। বর্তমান অবস্থা ঃ-

প্রকল্প	জগদল্লা-১নং	জগদল্লা-২নং	কালপাথর	আঁচুড়ি	আন্দারথোল	কেঞ্জাকুড়া	মোট
SGSY	৩৫	৫৫	১৬৫	১৩১	১৩৭	২২৬	৭৪৯
Swamsidhya	২৩	১৫	১৫	১৯	১২	১৭	১০১
CARE SHG	৩১	৩৪	৫৪	২৫	৪৩	১৯	২০৬
NGO (Gandi Bichar)	—	৩৯	—	—	৯	—	৪৮
Co-operative	৭৬	৩৭	০	১৩	৫৫	২১	২০২
	১৬৫	১৮০	২৩৪	১৮৮	২৫৬	২৮৩	১৩০৬

গোষ্ঠী গঠনের ফলে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মানসিকতা, শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে কুসংস্কার, বদ অভ্যাস কমার প্রভাব দেখা যাচ্ছে। উল্লেখযোগ্যভাবে বিশাল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে না পারলেও মহাজনী প্রভাব কমছে তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিজেদের আয় বৃদ্ধির জন্য মহিলারা নিজেরা বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। ICDS প্রকল্পে চাল সরবরাহ, বৈদ্যুতিক রিডিং নেওয়া, পুকুর সংস্কার, মিড-ডে মিলের রান্না, প্রভৃতি কাজ দলগুলি সাফল্যের সাথে পরিচালনা করছেন। সমবায়ের মাধ্যমেই গঠিত দলগুলির (২০৬টি) জমা টাকার পরিমাণ প্রায় ২১ লক্ষ টাকা। কর্জদাদনের পরিমাণ প্রায় ৫২ লক্ষ টাকা। আদায়ের হার প্রায় ৯৮%। কর্জ পরিশোধ দেওয়ার মানসিকতা লক্ষ্য করার বিষয়। ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রাখার প্রয়াস শুরু হয়েছে তা পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রতি ব্লক স্তরে স্বনির্ভর দলের ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠিত হওয়ায় দলকে ঋণদান ও আর্থিক শৃঙ্খলা আরো সুদৃঢ় হয়েছে।

দলগুলির সদস্যারা মদের ভাটি ভাঙ্গা, জুয়া খেলা বন্ধ করা প্রয়োজনে সামাজিক অনুষ্ঠানেও নিজেরা পাহারা দেওয়ার কাজগুলিও করে চলেছে, আমাদের সকলের উচিত তাদের এইরূপ কর্মসূচীতে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা। ২০০৬ সালে গঠিত ব্লকের গোষ্ঠীগুলির ফেডারেশন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এছাড়া গ্রামপঞ্চায়েত স্তরে ২৩টি ক্লাস্টার গঠিত হয়েছে। ব্লকের উদ্যোগেই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলির উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য খোলা হয়েছে বিক্রয় কেন্দ্র। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলির তৈরী দ্রব্যাদি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এই বিষয়ে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের যথেষ্ট উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। ইতিমধ্যেই ইমামি বায়োটেক স্বনির্ভর দলে ভেরেণ্ডাবীজ, বনসন কর্তৃপক্ষ করঞ্জবীজ, তালডাংরা সমবায় কেঁচো সার ক্রয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার ও মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারলেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক উন্নতির অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী।

উন্নত বাজার ব্যবস্থা

শুনুকপাহাড়ি, ধলডাঙ্গা, কেঞ্জাকুড়া, পোয়াবাগান প্রভৃতি গঞ্জ এলাকায় স্থায়ী এবং আরও উন্নত বাজার স্থাপন করা গেলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষেরা যেমন উপকৃত হবেন অপর এলাকার উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়ের সুযোগ ঘটবে। সমবেত প্রচেষ্টায় ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে আগাতে পারলে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে। প্রয়োজন উন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ।

তথ্যসূত্র :

১। বি ডি সি সি ব্যাঙ্ক, বাঁকুড়া
২। সমষ্টি উন্নয়ণ করণ : বাঁকুড়া - ১
৩। এল ডি এম : বাঁকুড়া
৪। এ আর সি এস : বাঁকুড়া

(বাম দিক থেকে বসে) - গৌতম দত্ত, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক; লতা মন্ডল, সভাপতি, বাঁকুড়া ১ পঞ্চায়েত সমিতি; সুদীপ্ত পোড়েল, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক; মোঃ ইব্রাহিম, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ।